তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

স্বর্গীয় কৃষ্ণধন।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়,

এম, এ, বি, এল, প্রণীত।

সম্পাদক

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।

লোটাস লাইব্রেরী,

৮।০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩১৯ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

—*০*—

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

—:০:—

ভূমিকা।

—:*: —

সুহৃদ্বর কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন স্বর্গে। সাময়িক পত্রিকার পুরাতন সংখ্যার মধ্যে তাঁহার যে বহুমূল্য প্রবন্ধাবলি বিপর্যস্ত ভাবে লুকাইত ছিল তাঁহার পুত্রদিগের যত্নে এই গ্রন্থে তাহার একাংশ সংকলিত হইল। অপরাংশ 'তত্ত্ব-মীমাংসা' নামক গ্রন্থান্তরে শীঘ্রই সংকলিত হইবে।

অযোগ্য হইয়াও আমি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিতেছি। এই অকিঞ্চন কার্যো বন্ধুবরের অমর আত্মার তর্পণ হউক।

বাঙ্গালার ধর্ম্ম-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইলেও কৃষ্ণধন বাবুর সহিত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের তাদৃশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, অথচ কিশোর বয়স হইতে তিনি বঙ্গবাণীর সেবা করিয়াছেন।

কৃষ্ণধন বাবু বালীর প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশ সম্ভূত। তিনি অল্প বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া বৃত্তি লাভ করেন, পরে উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর জলপাণি পান। তার পর কিছুদিন হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার প্রেসীডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং

ঐ স্থান হইতে ইং ১৮৮০ সালে গণিতের এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৮২ সালে বি, এল পরীক্ষা দিয়া কিছু দিন ওকালতীর পর মুন্সেফী গ্রহণ করেন এবং কয়েক স্থানে দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ইং ১৯০৭ সালে সবজজ পদে উন্নীত হন। তখন তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই ইং ১৯০৮ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়। তখন তিনি দ্বারবঙ্গে সবজজরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। করাল প্লেগ এদেশের অনেক রত্ন অপহরণ করিয়াছে কিন্তু সেই সকল রত্নের মধ্যে কৃষ্ণধন বাবুই বোধ হয় অত্যুজ্জ্বল।

যতদূর জানিতে পারিয়াছি কৃষ্ণধন বাবুর প্রথম রচিত প্রবন্ধ ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, প্রবন্ধের নাম 'আমার মালা গাঁথা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম পরিচ্ছেদে উহা সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন কৃষ্ণধন বাবুর বয়ক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর. ইহার কিছুপূর্ব্বে তিনি বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ১২৮৪ সালে বাঙ্গালা দেশে বঙ্গদর্শনের পূর্ণ প্রভাব। বঙ্কিম বাবু 'আমার মালা গাঁথা' প্রবন্ধকে বঙ্গদর্শনে সাদরে স্থান দান করেন এবং নবীন লেখকের রচনার বহু প্রশংসা করিয়া বলেন যে ইনি কালে বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইবেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে।

১২৯২ সালে বঙ্কিম বাবু "প্রচার" প্রকাশ করিতে আরম্ভ

করেন। তখন বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মের বাতাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইংরাজী-নবীশ নাস্তিকতা ও যথেচ্ছাচার ছাড়িয়া ধর্ম্মের দিকে মন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং জন মিল ও অগষ্ট কোমতের শিষ্যত্ব ছাড়িয়া ব্যাস বশিষ্ঠের অন্বেষণ করিতেছেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্কিম বাবু 'প্রচার' প্রচারিত করিতে আরম্ভ করেন। আমরা তখন কালেজের ছাত্র, বি এ ক্লাসে পড়ি, জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করি, হিন্দুত্বের বড়াই করি কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিরাট বিশাল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য কথার প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারি না। এই অবস্থায় 'প্রচার' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রচারে কৃষ্ণধন বাবু নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। ঐ সময় তাঁহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্মের বিরাট বিশালভাব কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। কৃষ্ণধন বাবুর সহিত তখন ও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই কিন্তু তাহা না হইলেও ছাত্র জীবনের সেই ঋণ সহজে শুধিবার নহে। ঐ সময় কৃষ্ণধন বাবু হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু আচারের মর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়া ভারতীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধ এবং পূর্ণিমায় ১৩০০ সালে প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল।

প্রচারে কৃষ্ণধন বাবুর প্রবন্ধ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার লোভ হইত, কিন্তু প্রায় দশ বৎসর তাহার সুযোগ ঘটে নাই। পরে ১৩০২ বা ১৩০৩ সালে

তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন আমিও যৎ কিঞ্চিৎ বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কৃষ্ণধন বাবুর সেই সৌম্য শান্তমূর্ত্তি এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। তিনি বড়ই মিষ্টালাপী ছিলেন অথচ মিতভাষী। পরিচয়ে দেখিলাম সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক -জগতের সংঘর্ষের উপযোগী কঠোরতা তাঁহাতে নাই, নির্জ্জনে শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যই তিনি গঠিত।

পরে তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং আমরা উভয়েই থিওসফিষ্ট সভার অন্তরঙ্গ সভ্য বলিয়া পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হয়। অকালে কৃষ্ণধন বাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আমি এখনও সংসার তরঙ্গের অভিঘাত সহিতেছি।

১৩০৪ সালে আমরা থিওসফিক্যাল সোসাইটি হইতে পন্থা নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করি। কৃষ্ণধন বাবু পন্থার কর্ণধার ছিলেন, আমি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ বৎসর তাঁহার সহযোগী ছিলাম। পন্থার কৃষ্ণধন বাবু নিয়মিত ভাবে লিখিতেন এবং তাঁহার রচনা ধর্ম্মপিপাসুর বিশেষ আদরণীয় ছিল। ঐ সকল প্রবন্ধে কৃষ্ণধন বাবুর পরিণত শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও পরিপক্ক আস্তিক্য বুদ্ধি সম্যক্ প্রকাশিত হইত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে তাঁহার জীবন-রবি অপরাহ্ণের পূর্ব্বেই পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইল। বিধাতার কি উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে কৃষ্ণধন বাবুর বক্তব্য শেষ হয়

নাই . তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারে যে তত্ত্বরাজি সংগৃহীত হইয়াছিল তিনি তাহার অর্দ্ধেক ও বিলাইবার অবকাশ পান নাই।

কৃষ্ণধন বাবু নিষ্কাম সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি শুধু মুখস্থ নহেন, কার্য্যতঃ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতেন। যশোলিপ্সার জন্য নহে, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, অর্থ ববের জন্য নহে, কেবল বঙ্গবাণীর সেবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইংবাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে কিরূপে সেই সদ্ধর্ম্মের মহিমায় অণুপ্রাণিত করিবেন তদ্‌ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি ছিল। সেইজন্য অতি দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব সকলও তাঁহার ধ্যান দৃষ্টির নিকট পরিস্ফুট হইত এবং অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি তাহা পাঠককে বুঝাইতে পারিতেন। এ অন্তর্দৃষ্টি কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল নহে, তিনি শাস্ত্র শুধু অধ্যয়ন করিতেন না, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতেন। আমার মনে আছে, একবার আমায় বলিয়াছিলেন যে বিগত চারি বৎসর ধারয়া তিনি কেবল গীতা ও সাংখ্য সূত্র চিন্তা করিতেছিলেন। এরূপ ঐকান্তিকের কাছে বিদ্যা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। সেইজন্য দেখা যায় কৃষ্ণধন বাবুর রচনায় একটি আন্তরিকতা, একটি অমোঘতা ছিল যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

বড়ই আনন্দের বিষয়, তাঁহার মহার্ঘ প্রবন্ধাবলি সাময়িক

পত্রিকার অতল গর্ভে নিমজ্জিত না থাকিয়া, এতদিনে লোক লোচনের গোচর হইল। আমার আশা আছে এই গ্রন্থ সাধারণের আদৃত হইবে এবং বাঙ্গালি পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিযা বাঙ্গালা ধর্ম্ম-সাহিত্যের যথোচিত স্থানে কৃষ্ণধন বাবুকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

মুখবন্ধ।

——:*:——

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা।

আমরা এই শ্লোক হইতে দেখিতে পাই, যে ভগবান্ ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ও অসাধুগণকে বিনাশার্থে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে এই বলিতেছেন যে, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই আমি শব্দে তিনি তাঁহার নিজভাব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার এই 'আমি' কথা বড়ই বড় কথা, ঐটি ক্ষুদ্র ভাব নহে তাঁহার আমি' সর্ব্বরূপী 'আমি' বিশ্বব্যাপী কারণ তিনি বলিয়াছেন ঃ–

"সর্ব্বস্য চাহম হৃদি সন্নিবিষ্টো।" গীতা।

তবে আমরা তাঁহাকে সর্ব্বভূতেই দেখিতে পাই। যে স্থলেই মহত্ত্ব দৃষ্ট হয় সেই স্থলেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জীব যখন দেহ কোষাদি অতীত হইয়া আমার ক্ষুদ্র আমিত্বটি বা ব্যক্তিত্বটি (Personality) ভুলিয়া যায়, তখন সে সৎগুণে থাকিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র 'আমি' কে ভুলিয়া মহত্ত্বে মিলন করাই মহাত্মার লক্ষ্য।

মহাত্মাগণের 'আমি' সর্ব্বময় এই জ্ঞানই তাঁহাদের চিরসিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্বজীবেই সমভাব পরিলক্ষিত হয় ও নিজেদের সর্ব্বস্ব (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চভৌতিক স্থূল ইন্দ্রিয়াদি) শ্রীভগবদচরণে ক্ষুদ্র 'আমিত্বটি' সমর্পণ করিয়া জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে "নিয়তং কুরুকর্ম্ম ত্বং।" কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু—

"মা ফলেষু কদাচন।" গীতা।

কর্ম্মফলের প্রত্যাশা করিও না। একথা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সার কথা বুঝাইয়াছেন কারণ এরূপ কর্ম্মই জীবের পক্ষে মঙ্গল। এই রূপ সাত্বিক পুরুষ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, সেই কর্ম্মই নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা হয়, এইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তা নিজেকে কৃতকর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করেন না সমস্তই ভগবদচরণে সমর্পণ করেন তজ্জন্য কর্ম্মফলের দায়ী হন না।

মহাত্মগণ বুঝেন যে তাঁহারা জগতে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন মাত্র, তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্মফল প্রত্যাশী না হইয়া, অহংজ্ঞান দূরীভূত করিয়া নিজের সত্ত্বা ভুলিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, নিজের সত্ত্বা না ভুলিলে সর্ব্বস্ব লাভ হয় না। সর্ব্ব শব্দে বহু, এই বহুভাবে তাঁহার অস্তিত্ব, তবেই তিনি মহাত্মা। তাঁহার কর্ম্মগুলিও বহু, সর্ব্বজনপ্রিয় এবং হিতকর। এক কথায় মঙ্গলময়ের নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, জীবকে উন্নতির পন্থায় আনয়ন করে। যেরূপ শঙ্করাচার্য্য,

বুদ্ধদেব ইত্যাদি মহাত্মাগণ ইহসংসারে না থাকিলেও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব এই জগতেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও সদুপদেশ এখনও লোকের সম্মুখে পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। মহাপুরুষগণের তিরোভাব হইলেও আমরা তাঁহাদের সুদূর প্রান্ত হইতে দেখিতে পাইতেছি, যে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমাদের নিকট বিদ্যমান—তাঁহাদের কীর্ত্তি কলাপাদি সারোপদেশ গ্রন্থ সমূহ অমরভাবে আমাদের নিকট সহাস্যে উপদেশ দিতেছে।

এই সকল শাস্ত্রোপদেশ আমাদের মোহপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অসার মন বুদ্ধি গুলি পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়া মোহ বিদূরিত করিয়া দেয়, তখন জ্ঞান চক্ষে ক্ষুদ্রত্বটি মহত্বে পরিণত হয় তখন মোহান্ধকার কোথায় ঘুচিয়া যায়? এই মোহভাব ঘুচানই সারোপদেশ। যদি কেহ বলেন যে ক্ষণিক - কিন্তু এই ক্ষণিক হইলেও নিয়ত অভ্যাস দ্বারা ক্ষণিককে কর্ম্মফলানুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী কিম্বা চিরস্থায়ী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব এইরূপে আমরা মহাত্মাগণের শাস্ত্রোপদেশানুযায়ী নিষ্কামকর্ম্ম অভ্যাস করিয়া শ্রীগুরুচরণে কর্ম্ম ফল গুলি সমর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। ওঁ।

এইরূপে কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে আমার পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল, মহাশয়কে দেখিয়াছি। যিনি পন্থার সম্পাদক থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ সম্পাদকীয় উক্তিসকল ও প্রবন্ধ গুলির সর্ব্বকর্ম্মফল

শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেই ত্যাগী মহাত্মার প্রণীত কতকগুলি প্রবন্ধ বিবিধ মাসিক পত্রিকা যথা বঙ্গদর্শন, প্রচার, ভারতী, পূর্ণিমা প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীভগবৎ কৃপায় অদ্য এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থখানি গ্রন্থাকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলাম। সুপণ্ডিত শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃ সুহৃদ 'পন্থাব' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ব্রহ্মবিদ্যা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্তবাবু হীবেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, (বেদান্তরত্ন), এটর্ণি মহাশয় এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার ভারগ্রহণ করিয়া ও কার্য্যতঃ সুসম্পন্ন করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ের প্রতি বিশেষ অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য হীরেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে জানাইতেছি যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অধিকতর সফল হউক এবং তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা সুযোগ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করুন। বঙ্গের শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মাসিক প্রকাশিত উপনিষদ গ্রন্থাদির সম্পাদক এবং লোটস্ লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু অনিল চন্দ্র দত্ত ভাইজিউ এই গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে

বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন, অতএব তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আশা করি এই গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বোপকারী হইবে এবং আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

——— ঃ*ঃ ———

সবিনয় নিবেদন,

সর্ব্বজন বিদিত সুপ্রসিদ্ধ তত্বজ্ঞানী দার্শনিক লেখকের এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থখানি আমি প্রকাশ করিতেছি। সেই সর্ব্বজন প্রিয় ও হিতৈষী মহাত্মা পরম শ্রদ্ধাস্পদ আমাদের স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বাবু "আমাদের বড়ই সুপরিচিত।" তদীয় সুপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধ গুলি বঙ্গের বঙ্কিম যুগের বিবিধ মাসিক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া পরম বন্ধু সাহিত্যসেবী পন্থার প্রসিদ্ধ লেখক গ্রন্থকারস্য সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই গ্রন্থখানি সুসম্পাদন করিলেন। কৃতবিদ্য সুমতি চারুবাবু তদীয় পিতৃদেব মহাশয়ের প্রবন্ধ গুলি সংগ্রহ করিয়া সুরক্ষিত ভাবে একত্রে সজ্জিত পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে আনয়ন করতঃ সাধারণের বিশেষ উপকার করিলেন, বলা বাহুল্য তাঁহার অধিকতর সাহার্য্য না পাইলে আমরা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম না। তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই। আশা করি গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা গুলি "তত্ত্ব-মীমাংসা" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। অধিকন্তু সুপণ্ডিত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ, বি এল, (বেদান্ত-রত্ন) মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া

বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। অতএব তাহাকেও সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে এই অমূল্য-রত্ন গৃহে গৃহে রাখিয়া শান্তি সুখ উপভোগ করুন। তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

বিনয়াবনত :—

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।
কলিকাতা।

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।
লোটস লাইব্রেরী।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

প্রথম ভাগ।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

প্রথম ভাগ।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দুটি কথা।

প্রচারের কোন এক জন পাঠক ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে গুটিকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। চিন্তাশীল লোক ঈশ্বর তত্ব সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিবেন ততই নানারূপ দুরূহ প্রশ্ন সকল তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপাততঃ পাঠক মহাশয় যে দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিব।

১ম। এই জগৎ যদি জগদীশ্বরের দেহ হয় তবে ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য এত চেষ্টা কেন। মোক্ষ মোক্ষ বলিয়াই বা চীৎকার কেন? আমরা সকলেই ত তাঁহার শরীরে আছি।

উত্তর। ঈশ্বরের লীন হওয়া কথাটির অর্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া পড়ে।

যেমন একটি পত্র একটি বৃক্ষের সহিত অভিন্ন ভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে আমিও সেইরূপ সদাই ঈশ্বরের সংযুক্ত রহিয়াছি অথচ আমি মোক্ষ পদ পাই নাই ঈশ্বরের লীন হইতে পারি নাই, এই দুইটি কথায় আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়। এই দুইটি

কথার যদি একটি সত্য হয় তবে অন্যটি মিথ্যা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পূর্ণ জ্ঞানীগণ যাঁহারা অধ্যাত্মীক রহস্য ভেদ করিয়া মোক্ষ পদ পাইযাছেন তাঁহারা ঐ দুইটি কথাই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যেমন এক মাসের ছেলে, জানে না যে সে মনুষ্য, কিন্তু তথাপি সে যে মনুষ্য এবিষয়ে কোন সংশয় নাই সেইরূপ আমি ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সত্যটি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যিনি আপনাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বুঝিতে পারিযাছেন তাঁহাকেই মুক্ত বা ঈশ্বরের লীন পুরুষ বলা যায়। হিন্দু শাস্ত্রে এই জ্ঞানকে আত্ম জ্ঞান বলে। আমরা এক্ষণে মুখে বলিতে পারি যে আমরা সকলেই ঈশ্বরেব সহিত একান্ত সংযুক্ত কিন্তু যতক্ষণ এই সত্য অন্তরে ধারনা করিতে না পারিব তত দিন ঈশ্বরে লীন হইতে পাবিব না। ঈশ্বরও আমি যে অভিন্ন এই জ্ঞানের অভাব স্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার অত্যন্ত নাশ হওয়াকেই শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরে লীন হওয়া বলিয়া থাকেন। ঈশ্বর তত্ব বিষয়ক জ্ঞানের সহিত আমার আমি জ্ঞান একান্ত সংযুক্ত করিতে পারিলেই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

আমার স্থূলদেহ এই বিশ্বের স্থূল দেহের সহিত স্থূল প্রাকৃতিক শক্তি সূত্রে একান্ত সংযুক্ত, আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের সহিত আমার মন বিশ্বের মনের সহিত, সূক্ষ্মতর শক্তিসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। যে চৈতন্যের বশে বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে সেই চৈতন্যের বশেই আমি চেতন; যে যে পদার্থ লইয়া আমি গঠিত সে সকলই ঈশ্বরের, আমার কিছুই নহে, কেবল একটি জিনিস আমার আছে, সেইটি কেবল ঈশ্বরে সংযুক্ত নহে সেইটি আমার অহংকার। আমি জানি যে আমি আর

বিশ্ব এই দুইটি পৃথক জিনিস। এই জ্ঞানটিই অহংকার। যখন এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে না যখন আমার অহংজ্ঞান ঈশ্বরে সন্নিবেশ করিতে পারিব তখনই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির এইরূপ অর্থ বুঝিতে পারিলে, আমি ঈশ্বরে সংযুক্ত অথচ লীন নহি এ কথাটিতে আর গোলমাল ঠেকিবে না।

প্র। আমরা যদি সেই পরম পুরুষের অংশ তবে আর আমরা আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করি কেন? আমরা যাহা করিতেছি তাহাত পরমাত্মাই করিতেছেন।

উ। অহংকার। যে সকল কর্ম্ম আমি করিয়া থাকি, বাস্তবিক সেই সমুদয় কর্ম্ম আমার কৃত নহে। প্রকৃতির গুণের বশে সমস্ত কার্য্য হইতেছে কিন্তু সেই সকল কর্ম্মে আমার আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকাতেই আমি কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমি ভাত খাই ইহাও প্রকৃতির কার্য্য আমি ছেলেকে ভালবাসি ইহাও প্রকৃতির কার্য্য কিন্তু আমি এই সকল বিষয়ে আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করি—এই অভিমান টুকু আমার। এই অভিমান টুকুর জন্যই আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়।

প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

ভগবদ্গীতা।

যাঁহার এই অহংকার নষ্ট হইয়াছে তাঁহাকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় না সমগ্র বিশ্বের সহিত আমি অভিন্ন এই জ্ঞান না জন্মিলে অহংকার ধ্বংশ হয় না।

আমার অহংকার আমার নিজের। আমার অহংজ্ঞান সংকীর্ণ করা বা বিস্তীর্ণ করা আমার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে আমি আমার অহংজ্ঞান সমগ্র বিশ্বে বিস্তীর্ণ করিতে পারি। যিনি এইরূপে সমগ্র বিশ্বে আপনাকে এবং আপনাতে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পান তিনিই মুক্ত পুরুষ, তিনি ঈশ্বরে লীন পুরুষ, এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

ঈশ্বরোপাসনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সাকার ও নিরাকার)।

অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের উপাসনার কোন প্রয়োজন বিবেচনা করেন না। এই প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য লিখিতেছি না। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষের মতানুযায়ী উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনা পদ্ধতিকে প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে এবং কি উপাসনা-পদ্ধতি কোন্ স্থলে প্রশস্ত, তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা যাউক, বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে? আস্তিকগণ সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের মূল কারণ এবং সেই কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এই বিশ্বাস থাকিলেই

যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলা যায় তাহা নহে। কিম্বা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান অচিন্ত্য অব্যক্ত ইত্যাদি বলিতে পারিলেই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে তাহা নহে। সেক্সপীয়র একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের সহিত অন্য কাহারও কাব্যের তুলনা হয় না। ইহা জানিলেই কবি সেক্সপীয়র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তবে যিনি সেক্সপীয়রের কাব্য সমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহার রসগ্রাহী হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, কবিত্ব বিষয়ে সেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার তিনি যদি সেক্সপীয়রের বাসস্থান, চরিত্র আদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তবে চরিত্রাদি বিষয়ে সেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে বলা যায়। ঈশ্বর জগৎ-রচয়িতা বলিলেই যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিয়া লইলাম, তাহা নহে। সেই রচনা-কৌশল মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ভাবগ্রাহী হইতে পারি, তবে জগৎ-রচনা বিষয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিব। যেমন সেক্সপীয়র নাম্বা কবিকে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন ও রসগ্রহণ প্রয়োজন, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টি বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাবগ্রহণ প্রয়োজন। প্রলয় কর্ত্তাকে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এবং পালন কর্ত্তাকে বুঝিতে হইলে পালনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এবং যখন একমাত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা বলিয়া জানিতে চাহিব, তখন সৃষ্টি কর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান এবং সংহার কর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয়, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গুটিকত বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক সেই জগৎকারণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টাই

আমার মতে ঈশ্বরোপাসনা। যিনি এই অজ্ঞতায় অসন্তুষ্ট, জ্ঞান লালসা বৃত্তি বশতঃ তিনি সেই জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অন্বেষী হন এবং তিনিই আমার মতে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক। অর্থাৎ আগ্রহচিত্তে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে লালসা না থাকে, গির্জ্জায় গিয়া নিজের জন্য প্রার্থনা কর বা মন্দিরে বসিয়া কোন দেব মূর্ত্তি ভাবনা কর, তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন কেহ না বুঝেন যে, আগ্রহ চিত্তে জগতের কারণ অনুসন্ধান করাই ঈশ্বর উপাসনা। তাহা হইলে আজ কালকার পাশ্চাত্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিক গণকে ঈশ্বরোপাসক বলিতে হয়। আগ্রহ চিত্তে সেই এক জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অনুসন্ধান কে ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। অর্থাৎ জগতের আদি কারণ এক এবং অদ্বিতীয় ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। সমুদ্রের তলে কি আছে ইহা জানিবার জন্য সমুদ্র অন্বেষণ করা, মুক্তা অন্বেষণ করা নয়। সমুদ্র তলে মুক্তা আছে ইহা জানিয়া, সমুদ্র অন্বেষণ করাই মুক্তা অন্বেষণ।

এক্ষণে দেখা গেল যে, ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, এই জ্ঞান ও সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য জ্ঞান-লালসা এবং সেই জ্ঞান লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, সাধারণ জনগণ কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যে যে পদ্ধতিতে উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কাহাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি। সাকার উপাসনাকেই বা কোন্ সময়

ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি এবং নিরাকার উপাসনাকেই বা কখন ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি না ?

গাভী একটি সাকার পদার্থ। গাভীগণ দ্বারা আমরা এই সংসারে অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। সে উপকার ভুলিবার নয়। সেই জন্য যদি আমি একটী গাভীকে ভক্তি সহকারে পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

অগ্নির অসীম ক্ষমতা। অগ্নি না থাকিলে আমরা মনুষ্যত্ব পাইতাম না। আবার অগ্নি বড ভয়ের জিনিষ। অগ্নি সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধা ও ভয় বিমিশ্রিত হওয়ায়, যদি আমি অগ্নির পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

সূর্য্য এই সৌর জগতের সকল ঘটনার আদি। সূর্য্যের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে উহার মাহাত্ম্যে মন পূরিয়া যায়, এমন অবস্থায় যদি আমি সূর্য্যকে স্তব করি, তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা নহে।

ছেলেবেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি, প্রলয়ঙ্করী কালী দেবীর অসীম ক্ষমতা, ভক্তিভাবে তাঁর উপাসনা করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়। এই বিশ্বাসে যদি কালীমূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া কালীর উপাসনা করি, তবে তাহা কালীদেবীর উপাসনা বটে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা নহে।

কিন্তু যদি আমি ঐ গাভী, ঐ অগ্নি, ঐ সূর্য্যকে উপলক্ষ করিয়া জগৎ কারণ সেই আদি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করি, ঐ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশ্বরের যে মহিমা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়, ইহা বুঝিয়া, সেই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধায়ী হই, এবং সেই সেই মহিমা মাহাত্ম্যে ভাবগ্রাহী হইয়া ঐ অগ্নি

সূর্য্যাদিকেই ভক্তিভাবে প্রণাম করি, তবে আমি ঈশ্বরোপাসনা করিলাম বলিতে হইবে।

যদি কোন দেবতার উপর অশেষ শুভ ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস থাকে এবং সেই জন্য সেই দেব দেবীর পূজা করি, তবে তাহা ঈশ্বর উপাসনা নহে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধায়ী আমার যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে যে, শাস্ত্রকারগণ যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দেব দেবীর বিষয়ে চিন্তা করা ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের এক প্রকার উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষী আমার দেব দেবীর বিষয় চিন্তা করা উচিত। এইরূপ দেব দেবীর চিন্তা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের পথ বুঝিয়া যদি দেব দেবীর উপাসনা করি তবে ইহা ঈশ্বরোপাসনা।

এরূপ উপাসনায় কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করিতেছি না, কেবল সাকার পদার্থ বিষয় চিন্তার সাহায্যে অনাদি কারণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ উপাসনাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহা সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করা যে সাকার উপাসনা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সাকার ও নিরাকার)।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? এ সম্বন্ধে সকল আস্তিকই স্বীকার করেন যে তিনি নিরাকার। সুতরাং কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমার খর্ব্ব করা হয। শুধু তাহাই কেন, উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কালীরূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি, তবে যখন কালী-রূপ অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিযাছি এই বোধ হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা জ্ঞান আর থাকিবে না, সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা সেই খানেই শান্ত হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইযাছিলেন, সেই শাস্ত্রকারগণ যখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন, তখন আমি যদি ঈশ্বরকে কালী-রূপাত্মক জ্ঞান করিযা নিশ্চিন্ত থাকি, তবে আমি সত্য পথে যে বেশী অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এরূপ সাকার উপাসনায় যে কোন ফল নাই তাহা আমি বলি না। তবে এরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না ইহা নিশ্চিত।

যদি কেহ স্ফটিককে হীরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং হীরক লাভে, চারিদিক অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে তিনি স্ফটিক পাইযাই হীরক পাইয়াছি জ্ঞান করিবেন এবং উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই স্ফটিক তাঁহার অনেক উপকারে আসিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ হীরক লাভে বঞ্চিত রহিলেন। কেবল সাকারকে

কেন কোন সগুণ পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিব। ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি কেবল রূপের অতীত নহেন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদি গুণ এবং ভক্তি দয়া আদি গুণেরও অতীত। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলি না যে, আজকাল যাঁহারা নিরাকার উপাসক নামে খ্যাত, তাঁহারা সকলেই নিরাকারের উপাসনায় ঠিক পথে চলিতেছেন। ঈশ্বর নিরাকার দয়াময়, ইহা বিশ্বাস থাকাতে কোন কামনা সিদ্ধি জন্য সেই নিরাকারকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেই ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে কোন উপাসনাই ঈরোপাসনা নহে। ভক্তি বৃত্তির চর্চ্চায় মানসিক উপকার যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপাসক সেই উপকার পাইবেন। ফলে ইহার বেশী আর কিছুই হইবে না।

তবে যখন ইহা বুঝিব, নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ জন্য আমাদের ভক্তি আদি মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে কোন সাকার অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তি স্ফুরণের চেষ্টা করি, তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতিভেদে দুই প্রকার নামে বিভক্ত। যখন সেই ঈশ্বরকে নিরাকার জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান জন্য কোন সাকার চিন্তারূপ পথ অবলম্বন করা যায়, তখন তাহাকে সাকার উপাসনা বলে, এবং যখন কোন সাকার চিন্তা ব্যতিরেকে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়, তখন তাহাকে নিরাকার উপাসনা বলে। আমরা

এই প্রবন্ধে যে সাকার বা নিরাকার উপাসনার দোষ গুণ বিচার করিব, তাহা এই উপরিউক্ত অর্থে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে।

সাকার-উপাসনা-পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্র-বিহিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যত দিন আমরা মায়ার অধীন থাকিব, যত দিন ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তত দিন নির্গুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে সক্ষম নহি, কেননা ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না। সেই জন্য নির্গুণ ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন রূপ উপাসনা হইতে পারে না। আজকালকার নিরাকার উপাসকগণ যে সগুণ উপাসক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাকার উপাসক রূপের সাহায্যে ভক্তিভাব উদ্রেক করেন। নিরাকার উপাসক না হয় কতকগুলি স্তোত্র গান দ্বারা তাঁহাদের ভক্তি-ভাব উত্তেজিত করেন। রূপ ও শব্দ দুই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়। একটি দর্শনেন্দ্রিয়ের অপরটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের। প্রভেদ ত এই। তবে নিরাকার উপাসক দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপের সাহায্য লইয়া উপাসনা করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন ?

ইহার এক কারণ আছে। হিন্দুসমাজের আজ কালকার অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সাকার উপাসনার দ্বারা নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার পদ্ধতি প্রচলিত আবার সমাজের অবনতির সহিত সাধারণ জনের সাকার পদার্থকেই ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রার্থনীয় নহে। এই জন্য ধর্ম্ম সংস্কারগণকে মধ্যে মধ্যে ইহা উপদেশ দিতে হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য যদিও রূপাদি ধ্যান করিতে হয় কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে, ঈশ্বর নিরাকার। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান

করিয়া উপাসনা করিলে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। কিন্তু আমি যাহাকে সাকারোপাসনা বলিতেছি, তাহা যে নিন্দনীয় তাহা কেহ বলিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। সাকারকে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে না ইত্যাদি উপদেশের ফল আবার দাঁড়াইয়াছে যে, একেবারেই সাকার থাকাতেই অশ্রদ্ধা। উপাসনা কালে সাকার চিন্তা করা আর উপাসনা ভ্রষ্ট করা, অনেকের কাছে একই কথা দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক গোঁড়ামী সকল সময়ই খারাপ। গোঁড়ামী থাকিলে বিচার শক্তির দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। আজকালকার নিরাকার উপাসক গোঁড়ামী ছাড়িয়া যদি এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি কর্ণেন্দ্রিয় সাহায্যে ঈশ্বরের যে উপাসনা করেন, তাহা সাকার উপাসকের রূপ শব্দাদির সাহায্যে সেই নির্গুণ কারণের উপাসনা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়েরই উপাসনা স্থূল উপাসনা। উভয়েরই স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপাসনায় রত।

তবে যদি কেহ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে উপাসনা করেন, তিনি স্থূল উপাসক অপেক্ষা বেশী অগ্রগামী হইয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার করি।

আমার বিবেচনায় উপসনার পদ্ধতি স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ভেদে তিন নামে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্থূল, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত যিনি উপাসনা করিতে পারেন না, তিনি স্থূল উপাসক। স্থূল শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীরস্থ এবং কারণ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপাসনা সূক্ষ্ম উপাসনা। এবং যিনি কেবল মাত্র কারণ শরীর অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তাহারই উপাসনা অতি সূক্ষ্ম। আর যে উপাসক নিজের আত্মার সহিত উপাস্য আত্মার যোগ

করিয়া আছেন, তিনি মায়াপাশ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

উপাসনা পদ্ধতি আচার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণভেদে তিন প্রকার। আচার বিচার-শক্তি, প্রেম ইচ্ছা-শক্তি অন্তঃকরণের এই তিন প্রকার বৃত্তিভেদে জ্ঞান প্রধান, ভক্তি প্রধান এবং কর্ম্মপ্রধান এই তিন ভাবে বিভক্ত হইতে পারে।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাকার ও নিরাকার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আগ্রহচিত্তে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার চেষ্টার নামই ঈশ্বরোপাসনা। কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার অভিলাষে কোন ভ্রান্ত পথের পথিক হন, তবে তাঁহার উপাসনা কখনই প্রশংসনীয় নহে। যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য তন্ত্রাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিযা কপাল কুণ্ডলার কাপালিকের ন্যায় আচরণ অবলম্বনে উপাসনা করেন, তবে তিনি যে কতদূর ভ্রান্ত, এবং তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি যে কতদূর তাহা বোধ হয়, বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক হিন্দু সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ভুক্ত এমন অনেক আছেন, যাঁহাদের উপাসনা পদ্ধতি প্রসংসনীয দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণাজনক।

সুতরাং,এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়। কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, সকলই ধর্ম্মের অন্তস্তলে এক মাত্র সার কথা এই পাওয়া যায় যে, যাহাতে মানব চিত্তের পূর্ণ স্ফুরণ হয় এবং সেই স্ফুরণ জন্য পুরুষ নিত্যসুখ লাভ করিতে পারেন, তাহাই সেই নিত্য পদার্থ ঈশ্বরকে জানিবার এক মাত্র পথ। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্যক্ বিকাশ না হইলে\ সঙ্গীত মাহাত্ম্য বুঝা

যায় না। সেই রূপ চিত্তের সম্যক্ বিকাশ না হইলে সেই অনন্ত শক্তির যে সঙ্গীত লহরীতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়াছে, সেই সঙ্গীত মাহাত্ম্য কেহই বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এই জন্যই সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে যদি ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিতে চাও, তবে যাহাতে মানব-চিত্তের সম্যক্ বিকাশ হয়, সেই চেষ্টা কর এবং ঐ চেষ্টাকেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি।

কোন একজন ঋষি তাঁহার একজন ইংরেজ শিষ্যকে এই বলিয় উপদেশ দিযাছিলেন যে, "Live up to youı highest ideal of tiue manhood" অর্থাৎ তুমি যাহাতে যথার্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ কল্পনা করিতে পার, সেই আদর্শানুযায়ী কার্য্য কর এব আপনাকে সেই উন্নতাবস্থায় তুলিতে ক্রমাগত চেষ্টা কর। যিনি এই উপদেশ বাক্য মত কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনিই ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রশস্ত পথ অবলম্বন কবিয়াছেন।

চিত্রবিদ্যা শিখিতে গেলে প্রথমে কল্পনায় যাহা সুন্দর, চিত্রপটে সেই চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতে হয় , ক্রমে চিত্রবিদ্যায় যত নিপুণতা জন্মিতে থাকে, ততই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দররূপ কল্পনা করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং সেই ক্ষমতাবশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপ চিত্রপটে আঁকিতে চেষ্টা জন্মে। এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই যেমন যথার্থ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা হয়, চিত্তের স্ফুরণরূপ বিদ্যা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই বিদ্যায় শিক্ষানবীশ মনুষ্যের যতদূর উন্নতাবস্থা কল্পনা করিতে পারেন, ততদূর উন্নত হইবার চেষ্টা করুন। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে চিত্ত যখন কতক পরিমাণে মার্জ্জিত করিতে হইবে তখন অধিকতর উন্নত‌াবস্থা কল্পনা কবিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এখন

তিনি আপনাকে সেই অবস্থায় তুলিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা চিত্ত যতই ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের জ্যোতিঃ চিত্তে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিবে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। ক্রমে যখন চিত্তের পরিস্ফুরণাবস্থা জন্মিবে, তখনই যথার্থ ঈশ্বর কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমি এখন বৌদ্ধ হই আর তুমি এখন বৈষ্ণব হও, উন্নতাবস্থার চরম আদর্শ সম্বন্ধে এখন তোমাতে আমাতে প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যদি যথার্থ বৌদ্ধ হই, অর্থাৎ বুদ্ধ চরিত্রানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করি, আর তুমি যদি যথার্থ বৈষ্ণব হও, অর্থাৎ কৃষ্ণ-চরিত্রানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে থাক, তবে আমরা উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইব যে, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের আর বড় মতভেদ নাই। কেন না ঈশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনুষ্যের যে অবস্থা হয়, তাহাই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত আদর্শ। সেই আদর্শ এক বই দুই হইতে পারে না। তবে মানব-চিত্ত অজ্ঞান মলায় বিভিন্নরূপ হওয়াতেই সেই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মেই এইরূপ একটি না একটি আদর্শ ধরিয়া চিত্ত মার্জ্জন করিবার শিক্ষা দিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ স্বরূপ, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের যিশু, বৌদ্ধগণের বুদ্ধদেব এবং শৈবগণের পক্ষে শিব, এইরূপ মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। যদি কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ কৃষ্ণপদে তুলসী চন্দন দেওয়াকেই বিষ্ণু পূজা জ্ঞান করেন, কিন্তু কৃষ্ণের উন্নত চিত্তানুযায়ী নিজের চিত্ত গঠিত করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহার পূজায় কোনি ফল নাই। আর যে খ্রীষ্টিয়ান প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় গিয়া

গান করেন, কিন্তু যিশুর ন্যায় মহৎ হইবার চেষ্টা না করেন, তবে যিশু তাঁহাকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন জানি না।

যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, তাঁহাকেই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যাহাকে ভালবাসি না তাহার অনুকরণে মন যায় না। এই জন্যই সকল ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে, কোন একটি উন্নত আদর্শে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া সেই আদর্শ-সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করিবে। এইরূপ আদর্শ চিন্তাই সাধারনতঃ উপাসনা নামে খ্যাত।

সাকার-উপাসক হিন্দুগণের দেব দেবী এইরূপ এক একটি আদর্শ মাত্র। আর নিরাকার উপাসকের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বরও এইরূপ একটি আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর হিন্দুদের কাছে একটি দেবতা-স্বরূপ। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং সগুণ উপাস্য আদর্শকে ঈশ্বর না বলিয়া দেবতা বলাই সঙ্গত।

বাস্তবিক হিন্দুরা সাকার বা সগুণ দেব দেবীকে কখনই আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে চিন্ময় অদ্বিতীয় নিষ্কল এবং অশরীরী। তবে সেই

"চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিনঃ।
উপাসনানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা॥"

এখন দেখ, সাকার উপাসক হিন্দু পৌত্তলিক, কি তুমি নিরাকার উপাসক খ্রীষ্টিয়ান পৌত্তলিক। হিন্দুরা আদিকারণে কখন কোন গুণ পর্য্যন্ত আরোপ করিতে চান না, কিন্তু তুমি খ্রীষ্টিয়ান অব্যক্ত অনাদি সেই কারণে সামান্য মনুষ্যের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ আরোপ করিতে চাও। তুমি যখন ঈশ্বরে ঐরূপ দয়াদি গুণ আরোপ করিলে, তখন তুমি ঈশ্বরকে একটি সজীব পুত্তল স্বরূপ বলিলে না ত কি? যদি বল, সগুণ না ভাবিলে ত উপাসনা করা যায় না আমিও তাই বলি যে,

যাহা সগুণ নয়, তার বিষয় চিন্তা করা যায় না, আর সেই জন্যই হিন্দুরা দেব দেবীর কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং সকল সময়েই স্মরণ রাখেন যে, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার রূপ গুণাদি কেবল কল্পনা-কল্পিত মাত্র। যখন ঈশ্বরোপাসনার জন্য সকলকেই উন্নত অবস্থার একটি না একটি আদর্শ মনে মনে গড়িয়া সেই বিষয় চিন্তা করিতে হইল, তবে সেই আদর্শের রূপ কল্পনায় কোন উপকার আছে কি না?

উপাস্য দেবতার হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে, চোক আছে ইত্যাদি ভাবিতে পারিলেই উপাস্য দেবতার রূপ চিন্তা হয় না। যথার্থ রূপ কাহাকে বলে, দেখা যাউক।

কেবল মাত্র নাসা কর্ণাদির সমষ্টি লইয়াই মানুষের রূপ নহে। সমস্ত দেহ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হইতে যে এক ছটা নির্গত হয়, যে ছটা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোন বাক্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্তরে নানারূপ ভাবের উদ্রেক করে, তাহাই মানবের রূপ অথবা রূপের সার ভাগ। যখন মাতা তাহার শিশুর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তখন কি সে তাহার মুখ চোক কান একটি একটি করিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হয়? শিশুর সেই হাসি হাসি মধুমাখা সেইটি যাহার নাম রূপ, তাহাই দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মনুষ্যের অন্তরস্থ ভাব সমূহ প্রস্ফুটিত হইলেই তাহা বাহ্য শরীরে এক রকমে প্রকাশিত হয়। শান্ত পুরুষের শান্ত ভাব, মুখের শান্ত শ্রী দেখিলে বুঝা যায়। এই রূপ যাহাকে শ্রী বলে, তাহার নাম রূপ। যিনি যথার্থ উপাসক, তিনি ইষ্ট-দেবের রূপ ধ্যান কালে ইষ্ট-দেবের যে রূপ যে শ্রী তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে, সেই রূপ অন্তরে উদিত করিবার চেষ্টা করেন। এবং রূপ অন্তরে উদিত হইলে সুন্দর ভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অর্থে নারায়ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী শ্রী (লক্ষ্মী)

কল্পিত হইয়াছে। নহিলে, সত্য সত্য তাঁহার একটা গৃহিনী নাই।

এরূপ রূপ-চিন্তার ফল কি? জননী যদি গর্ভাবস্থায় কোন সুন্দর রূপ অনবরত চিন্তা করেন, তবে গর্ভস্থ শিশু অনেকটা সেই রূপের অনুযায়ী হয়। প্রকৃতির যে নিয়মে এক জনের চিন্তা হেতু তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে, সেই নিয়মের বলে যে স্বয়ং সেই রূপ অহরহঃ চিন্তা করে, তাহার নিজের স্বভাবের কি কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইষ্টদেবের চিত্তের উন্নত ভাব অনুকরনের চেষ্টাই উপাসনা। যে ভাব সুন্দর (যাহা সুন্দর, তাহাই উন্নত) সেই ভাব অন্তরে ক্রমাগত উদিত করিবার চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অবিরাম অভ্যাস দ্বারা মানব নিজে সেই সুন্দর ভাব বিশিষ্ট হইযা থাকে। চিন্তা দ্বারা যে এই রূপ ফল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। হয় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে কিম্বা কোন রূপ ধ্যান কিম্বা কোন গন্ধ স্পর্শাদির অনুভব দ্বারা সাধারণ সকল উপাসকই তাহাদের আন্তরিক ভাব উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আজ কাল যাঁহারা নিরাকার উপাসক বলিয়া খ্যাত তাঁহারা কেবল মাত্র কতকগুলি বাক্যার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ মনোমধ্যে আলোচনা দ্বারা অন্তরে সুন্দর ভাব উদিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হিন্দু উপাসক বাক্য, রূপ, সঙ্গীত, গন্ধ ইত্যাদি সকলেরই সাহায্য লইতে হানি বোধ করেন না।

উপাসনার আসল প্রয়োজন অন্তরে সুন্দর ভাব উদিত করা। কিন্তু কেবল মাত্র বাক্যের সাহায্যে পূর্ণরূপে সেই ভাব উদিত হওয়া সম্ভব নয়। নিজের মনে যে ভাব উদিত হইয়াছে, সকল সময় তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, আর যে ভাব উদিত

হয় নাই, বাক্য দ্বারা অন্তরে তাহা পূর্ণ রূপে উদিত করা অনেক সময় কত দূর অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু রূপের সাহায্য পূর্ণ সুন্দর ভাব অন্তরে উদিত করিতে পারা যায়।

সে ভাব কি কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায়? রূপে যে ভাব উদিত করিতে পারে, বা সঙ্গীতে যে ভাব উদিত করিতে পারে, বাক্য দ্বারা সেরূপ পূর্ণভাব কখন ও উদিত করিতে পারা সম্ভব নয়। অভিনীত নাটকে এবং কেবল পঠিত নাটকে যে তফাৎ, সাকার ও নিরাকার উপাসনায় সেই তফাৎ।

রূপচিন্তা দ্বারা সুন্দরের, অর্থাৎ উন্নত ভাব সম্পন্ন জনের ভাব সমূহ অন্তরে পূর্ণরূপ বিকাশিত করিতে পারা যায়, ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু রূপ চিন্তা কথাটা বড সোজা কথা নয়, এটা যেন সকলের স্মরণ থাকে। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাদের স্ফুরিত হয় নাই, সঙ্গীত দ্বারা তাহাদের আন্তরিক বৃত্তি স্ফুরিত হওয়া সম্ভব নয়, সেই রূপ যাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা যাঁহারা রূপ মাহাত্ম্য বুঝেন না, তাঁহারা রূপ চিন্তা দ্বারা ইষ্টদেবের উপাসনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা ব্যতীত আর গতি নাই। কিন্তু এরূপ নিরাকার উপাসক রূপোন্মত্ত সাকার উপাসক অপেক্ষা উন্নত না অবনত?

আর যিনি রূপ-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন, যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় কিছু না কিছু স্ফুরিত, তাঁহাকে ইষ্টদেবের রূপ-কল্পনা কারতে হইবে। আমি যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহা রূপেই হউক শব্দেই হউক বা গন্ধেই হউক বা আন্তরিক গুণ সমূহেই হউক, সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য রাখিতে আমার উপাস্য দেবকে গড়িব, ইহা নিশ্চয়। কেন না যাহা সুন্দর, তাহাই উন্নত। যদি কেহ আমায় নিষেধ করেন যে, তোমার

উপাস্য দেবের তুমি রূপ কল্পনা করিওনা, আর আমি যদি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্যগ্রাহী হই, তবে আমার মন আমাকে ভিতর হইতে বলিয়া দিবে যে, তুমি কাহারও কথা শুনিও না, তুমি যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখ, তাহা লইয়া তোমার সুন্দরকে গঠিত কর।

উন্নতাবস্থার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা যখন বলিব, তখন দেখাইব যে দর্শনও শ্রবণেন্দ্রিয় ভোঁতা করিয়া রাখা যথার্থ উন্নতাবস্থার লক্ষণ নহে। তবে এমন যদি কেহ থাকেন, যাঁহার দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফুরিত হইয়া অন্তরেন্দ্রিয়ে লয় পাইয়াছে, এরূপ জনের পক্ষে তাঁহার ইষ্টদেবের রূপ কল্পনা নিস্প্রয়োজনীয়। তিনিই সুক্ষ্ম উপাসক এবং তিনিই যথার্থ নিরাকার-উপাসক। এবং আজ কাল-কার যে নিরাকার উপাসনা ধর্ম্ম-মন্দিরে দেখিতে পাই, তাহা উক্তরূপ নিরাকার উপাসনার ভেঙান মাত্র।

আমি যে সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এত কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে আজ কাল অনেকেই হিন্দুদের সাকার উপাসনার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইষ্টদেবের রূপ চিন্তা করা একটা মহাপাপ স্থির করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-গুরু পাদরী মহাশয় গণের সংসর্গেই অনেকের ঐরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় ভুক্ত খ্রীষ্টীয়ানদের গির্জায় যিশুর ছবি পর্য্যন্ত রাখা নাকি নিষিদ্ধ। কিজানি যদি পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে, কি জানি যদি কেহ ভ্রম ক্রমে যিশুর পবিত্রমূর্ত্তি এক বার মনোমধ্যে ভাবিয়া ফেলে তবেই ত সর্ব্বনাশ। খ্রীষ্টীয়ানদের এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সাকার উপাসনা উঠাইয়া দিতে চান। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কুফল বই সুফল হওয়া ত সম্ভব দেখিনা। রূপ-ধ্যান হিন্দু উপাসনা-পদ্ধতির একটি প্রধান এবং সুন্দর অঙ্গ, তাহা উচ্ছেদে

ত কোন উপায় দেখিনা। তবে দেব দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা হেতু হিন্দু সমাজে যে পৌত্তলিকতা দোষ জন্মিয়াছে তাহা যদি নিরাকরণ করিতে চাও তবে দেব দেবীর মূর্ত্তি কল্পনায় যথার্থ উদ্দেশ্য কি, তাহা সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। তাহা না করিয়া যদি রূপ চিন্তা ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে উঠাইতে চাও, তবে তোমাদের চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। অল্পবুদ্ধি যুবকগণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে গিয়া অনেক সময় স্বভাব সুলভ-চপলতা বশতঃ কুপথগামী হইয়া থাকে, এই জন্য কি সমাজ হইতে সঙ্গীত-চর্চ্চা উঠাইতে চাও? আর উঠাইতে চাহিলেই কি তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে? আজ-কত-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে যে রূপ-ধ্যান-প্রথা চলিয়া আসিতেছে, আজ তুমি পাশ্চাত্য-গণের অনুকরণে দুদিনে কি তাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে? কখনই না। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে সেই জন্য এই কথা বলিতে চাই যে, সমাজে সাকার উপাসনা নিবন্ধন যে যে দোষ ঘটিয়াছে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা কর, সাকার কথাতেই একেবারে অশ্রদ্ধা নাই করিলে?

বাস্তবিক একটু বুঝিয়া দেখিলে হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি অপেক্ষা সুন্দর অনুরূপ উপাসনা পদ্ধতি দেখা যায় না। ব্রাহ্মণদের নিত্য কর্ম্ম মধ্য হইতে একটি ছোট খাট পূজা পদ্ধতি দেখাইয়া ইহা দেখাইতে চাই। দেখ, শিব উপাসক কি পদ্ধতিতে শিব পূজা করিতেছেন। প্রথমে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া দেহবিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিলেন। সরল ভাবে উপবেশন করিয়া "বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, সম্মুখে নমঃ শিবায় নমঃ" প্রথমে এই মন্ত্র মনে-মনে উচ্চারণ করিলেন। এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহার মনে কি

কি ভাবের উদয় হইল দেখা যাউক। ইষ্টদেবের মহিমা-সম্বন্ধে যাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন ভক্তি ভাবে সেই গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া উপাসক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। 'যেন আমার উপাসনার ফল অচিরে ফলে' একান্ত চিত্তে এই সিদ্ধি কামনা অন্তরে থাকায় উপাসক সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিলেন। এই দুইজনকে নমস্কারে উপাসক তাঁহার ভক্তি-বৃত্তি এবং ইচ্ছা-বৃত্তির প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখ, উপাসকের সিদ্ধিকামনা কেন? অন্য কোন কারণে নয়, উর্দ্ধস্থ সেই ব্রহ্ম এবং অধঃস্থ তাঁহার অনন্ত-শক্তি অনন্তের বিষয়ে জ্ঞান লাভ জন্যই এই কামনা। এই জন্য উপাসক ব্রহ্ম ও অনন্তকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবকে নমস্কার করতঃ তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদের প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতিই এইরূপ দেখা যায় যে, তাঁহাদের উপাসনা কেবল মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে যখন তাঁহার পূর্ণভাব অন্তরে উদিত হইবে, তখন উপাসক মানস-পূজা আরম্ভ করেন। মানস-পূজা অর্থাৎ "সোঽহং" সেই ইষ্টদেবই আমি, এই রূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে ইষ্টদেবের উন্নতভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। "সেই আমি" এই চিন্তা দ্বারা নিজের অহংজ্ঞান নিজের রূপে না রাখিয়া, নিজের ভাব সমূহে না রাখিয়া, ইষ্টদেবের রূপ ও মহিমায় সেই অহংজ্ঞান অর্পিত করিবার চেষ্টা করিতে হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় কি? এইরূপ মানস-পূজার পর বাহ্যজ্ঞান হইলে উপাসক পাদ্য, অর্ঘ্য, নৈবেদ্যাদি ইষ্টদেবে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বাহ্য পূজা করেন।

কল্পনা-কল্পিত রূপ মহিমাদি ধ্যান ও মানস-পূজাদি ব্যাপার সুন্দর হইলে ও চাল ছোলার নৈবেদ্য লইয়া ইষ্টদেবে উপহার দেওয়া

যে একটি কুসংস্কারের ফল, তাহার ত সন্দেহ নাই. অনেকে এইরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি যে, হিন্দুদের উপাসনার এই অংশ টুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হিন্দু-উপাসক নিজের অন্ন পানীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত ইষ্টদেবে, সমর্পণ না করিয়া গ্রহণ করেন না। হিন্দু-উপাসক যে অন্ন পানাদি গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহাদের নিজের আসক্তি পরিতৃপ্তির জন্য যেন না হয়, যেন সেই অন্ন পানাদি জনিত শক্তি কেবল দেব কার্য্যেই ব্যয় হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশই নৈবেদ্য প্রদানের যথার্থ অর্থ। যখনই আমি অন্নপানীয়াদি ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে যাইব, তখনই আমার স্মরণ হইবে, এই অন্নপানীয় দ্বারা আমি যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শান্তি করিব, তাহা যেন কেবল দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশেই করি। উপাসক এরূপ বাসনা অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে চান, এই জন্যই তাঁহার প্রাত্যহিক নৈবেদ্য নিবেদন। এখন দেখ, হিন্দুদের এই প্রথা কত দূর সুন্দর।

এইরূপে হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি যতই আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ততই সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বরং সমাজের অবনতির সহিত উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মলিনতা ঘুচাইতে সকলে চেষ্টা করুন। তবেই সমাজের যথার্থ উপকার হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।

মনুষ্য নিজে তাহার জ্ঞান ও বিচার শক্তি চালনা দ্বারা মনুষ্যত্বের যতদূর উন্নত অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, সেইরূপ উন্নত দশায় উঠিতে সতত চেষ্টা করিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিবে। সেই কল্পিত আদর্শ পুরুষের যেরূপ মুখশ্রী হইতে পারে, স্বরের যেরূপ মাধুর্য্য সম্ভব, আন্তরিক ভাব সমূহের বিকাশ যতদূর সুন্দর হইতে পারে, সেইরূপ মুখশ্রী, সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ আন্তরিক ভাব সমূহ অনবরত চিন্তা দ্বারা আপনাকে সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ মুখশ্রী ও সেই সেই সমস্ত সুন্দর ভাব-সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আপনাকে উন্নত অবস্থায় তুলিতে তুলিতে যখন নিজের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পরা প্রকৃতির সহিত একতানে লয় করিতে পারিবে, তখনই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের চিত্তের ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং পরমোন্নত পুরুষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যাহাকে যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিব, তাহা অপর একজনের কল্পনানুযায়ী না হইলে হইতে পারে, এইজন্য নিজের কল্পনানুযায়ী আদর্শ বর্ণনা দ্বারা কাণা হইয়া কাণাকে পথ দেখাইতে চাহি না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষগণ মনুষ্যের

যেরূপ অবস্থাকে যথার্থ উন্নত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থা কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

ঈশ্বরের যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ লোককেই যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন এবং আপনাতেই সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে। এরূপ জনের কাছে বর্ণ বিচার নাই— এরূপ জনের কাছে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, ধাতু মৃত্তিকা, দেব গন্ধর্ব্বাদি সম্বন্ধে প্রভেদ-জ্ঞান নাই—ইনিই যথার্থ অদ্বৈতবাদী। "একমেবাদ্বিতীয়ং" কথার অর্থ ইনিই বুঝিয়াছেন। ইনিই যথার্থ ব্রহ্মোপাসক।

'আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিবে' এই কথাটির ভিতর যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় ভাবেন না। সমস্ত বেদের, সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা ঐ কয়টি কথায় নিহিত রহিয়াছে। যোগই বল, যাগই বল, তপস্যাই বল, আর মনুষ্যত্বই বল, সবই ঐ কয়টি কথার ভিতর রহিয়াছে।

এই জগতে সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত। পরের জন্য কয়টা লোক ভাবে? পরের জন্য ভাবে না বলিয়াই জগতে সুখ এত কম। এই জন্যই সকল ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় যে, যেমন নিজের জন্য ব্যস্ত হও, সেইরূপ পরের জন্যও ব্যস্ত থাকিও। এই শিক্ষা অতি উচ্চতর নীতি-শিক্ষা সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে যাহা শিক্ষা দেয়, তাহা উচ্চতম শিক্ষা। নিজের জন্য যেমন ভাব, পরের জন্য তেমনি ভাবিও, এই নীতিতে নিজ ও পরে

প্রভেদ জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সেই প্রভেদ জ্ঞানটুকুও রাখিতে চায় না। হিন্দুদের উন্নত দশার আদর্শ-পুরুষের কাছে আমি ছাড়া অন্য কেহ থাকা সম্ভব নয়। কেন না এই উন্নত পুরুষ 'আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ' দেখিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শ পুরুষ পরের জন্য ভাবেন না নিজের জন্য ভাবেন, কিন্তু তাঁহার সেই নিজের জন্য ভাবনাতেই জগতের সর্ব্বভূতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়।

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং' কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিলেই দেখা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কতদূর উন্নতমনা ছিলেন। আমার আমি-জ্ঞান আমার আন্তরিক ভাব সমূহের সমষ্টি জ্ঞান। অর্থাৎ আমার দেহে আঘাত করিলে কষ্ট হয়, আমার ক্ষুধার সময় খাইতে না পাইলে কষ্ট হয়, স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিলে মন সন্তুষ্ট হয় ইত্যাদি আমার সমস্ত ভাবের সমষ্টি লইয়া আমি-জ্ঞান। কিন্তু এই ভাব সমূহ সাধারণ জনগণের পক্ষে বড়ই সংকীর্ণ, এই জন্য সাধারণের 'আমি-জ্ঞান'টিও বড় সংকীর্ণ। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদিতেই সাধারণতঃ এই আমি-জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু আদর্শ-পুরুষের কাছে আমাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, এই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণে যেমন আপনাদিগকে আমাদের দেহস্থ বিবেচনা করি, তিনিও সেইরূপ আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

নিজের অহংজ্ঞান যতই বিস্তীর্ণ করিবে, ততই মনুষ্য উন্নতদশা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমার অহংজ্ঞান কেবলমাত্র নিজের চক্ষু-কর্ণ-নাসাদি ইন্দ্রিয়গুলিতে না রাখিয়া অন্যভূতে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবার শিক্ষা কেবল হিন্দু-উপাসনা-প্রণালীতেই দেয়। হিন্দু উপাসক উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে "সোহং" সেই আমি, এই জ্ঞান

যাহাতে জন্মায়, তাহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন। আমার সহিত আমার হস্তপদাদি ও মনের সহিত একটি নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধটি আমি অনুভব করিতে পারি বলিয়াই আমার হস্তপদাদি ও মনে, আমার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে আমার সহিত সমস্ত বিশ্বের ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনুভবশক্তির বিকাশে মানব সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। অমনই মানবের অহংজ্ঞান সর্ব্বভূতে জন্মিবে। আমার সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহারই পর্য্যালোচনায় হিন্দু ঋষিগণ তাঁহাদের দীর্ঘজীবন যাপন করিতেন।

হিন্দু-ঋষিগণ যাহাকে যোগ বলিয়া গিয়াছেন, নিজের অহংজ্ঞানের সহিত এই জগতের যোগই ইহার অর্থ। যে ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলিতেছে, সেই সেই ঐশ্বরিক শক্তির ক্রিয়া মানব চেষ্টা করিলে আপনাতে দেখিতে পান। হিন্দু-ঋষিগণ এই জন্য মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আপনাতে অনুভূত উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তির যে সুর, তাহাকে জগতের হেতুভূত শক্তি সকলের সুরের সহিত একতানে মিলন করার নামই যোগ। আমার মনের সহিত জগতের মনের আমার বুদ্ধির সহিত জগতের বুদ্ধির এবং আমার আত্মার সহিত জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এইরূপ যোগযুক্তাত্মাই আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিতে সক্ষম।

অনেকে ভাবিবেন যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল কতকগুলা কথা সাজান মাত্র। জগতের মন, জগতের বুদ্ধি, এ সকল কথার অর্থই নাই। বাস্তবিকই যাঁহারা হিন্দু-দর্শনাদিতে বীতশ্রদ্ধ,

তাঁহারা ঐরূপ মনে করিবেন সন্দেহ নাই। বেদান্তে ব্যষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য এবং সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য, ব্যষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি ও সমষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি এই সকল কথার অর্থ যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোলিখিত জগতের মন, জগতের বুদ্ধি ইত্যাদি কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

কোলাহল-পূরিত রাজধানীতে কত লোক কত প্রকারের শব্দ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী কোন শৈলশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া রাজধানীর দিকে কর্ণপাত করিলে, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক একটি পৃথক পৃথক শুনা না গিয়া যে একটি মাত্র হো হো শব্দ শুনা যায়, সেই শব্দটি পূর্ব্বকথিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সমষ্টিভাব। কতকগুলি সুর একতানে মিলাইয়া বাজাইলে শ্রোতা যে একটি মাত্র সুর শুনিতে পায়, সেই সুরটি ঐ ভিন্ন ভিন্ন সুরগুলির সমষ্টি-সুর। এবং ঐ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সুরকে ব্যষ্টিসুর কহা যায়। সেইরূপ এই সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূতের চৈতন্য যিনি সমষ্টিভাবে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য কাহাকে বলে। এই সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্যই জগতের আত্মা। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভূতের মন, ভিন্ন ভিন্ন ভূতগতভাব সমুদয় যারা ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও উন্নতপুরুষ সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টিভাব অনুভব করিয়া জগতের মন কি তাহা বুঝিতে পারেন* এবং এই জগতের মনের সহিত নিজের মনের একতা সম্পাদন করিয়া যোগযুক্তাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই রূপ উন্নত পুরুষই কৃষ্ণোক্ত অদর্শ-পুরুষ।

সমষ্টি ভাব আর ব্যষ্টিভাব সম্বন্ধে আর ও গুটিকতক কথা বলা চাই। বেদান্ত মতে সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়ে

ব্যষ্টিভাবাপন্ন হওয়াতেই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথায় একম্ শব্দে যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই অসংখ্য সৃষ্টি হইয়াছে। এইটি বুঝিতে পারিলেই কোন্ পথে গেলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায়, তাহা বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহা হইলেই এই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ভূতগত ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান ভাব সমূহ যে এক মাত্র ভাবেরই পরিব্যঞ্জক, সেই সমষ্টি ভাবটি কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে।

মনে কর, আমার মনে কোন একটি সুন্দর পুরুষের রূপ সম্বন্ধে একটি ভাব আছে। আমি সেই সুন্দর পুরুষের ছবি এক খানি যখন আঁকিতে যাই, তখন প্রথমে মুখ, পরে হাত, পরে পা ইত্যাদি রূপে একটির পর একটি আঁকিয়া থাকি। চিত্রাঙ্কিত এই হাত পা মুখ ইত্যাদি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলেই আমার অন্তরস্থ একই মাত্র যে একটি ভাব, সেই ভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সেই আন্তরিক ভাবটি অন্তরে সমষ্টিভাবে ছিল, কিন্তু চিত্রপট হস্ত পদ পৃথক্ পৃথক্ সময়ে অঙ্কিত হইয়া ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলা যায়। এই জগৎ সম্বন্ধে ও সেইরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক খানি চিত্রপট স্বরূপ, ঈশ্বরের অন্তরে এক মাত্র একটি ভাব যাহা সদাই বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই ভাবটিই পরিদৃশ্যমান জগতে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এই একটি মাত্র ভাব ইহাই জগৎ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টি ভাব। এই সমষ্টি ভাবের সহিত যিনি নিজের আন্তরিক ভাব একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্মা। তিনিই মনুষ্যের উন্নতি দশার প্রকৃত আদর্শ।

বৃক্ষের শাখা পত্রাদি সমুহ বীজগত যেমন একই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াও পরস্পরের সহিত একই সম্বন্ধে

গাঁথা, সেইরূপ এই জগতস্থ মনুষ্য, ইতর জন্তু, উদ্ভিদ, ধাতু, পিতৃগণ ও দেবগণ ও সেইরূপ একই ঐশ্বরিক ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াও একই সম্বন্ধে গাঁথা আছে। সেই সম্বন্ধটি অন্তরে অনুভব করিতে পারিলেই মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিতে সক্ষম হন।

মুখে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত জীবই এক সূত্রে গাঁথা, কিন্তু মুখে বলা আর অন্তরে অনুভব করা এ দুইটি বড় পৃথক্। কথায় জানিলাম যে সমস্ত জীবই পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে গাঁথা যে একের সুখের উপর অন্যের সুখ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল জীবে দয়া প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র কথায় জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। অন্তরে যখন অনুভব করিতে পারিবে যে, সমস্ত বিশ্ব একই সূত্রে গাঁথা, যখন অন্তর হইতে অন্তরের মানুষ তোমাকে হিতের জন্য প্রেরণ করিবে, তখনই জানিও যে উন্নতির সোপানে তুমি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছ। এইরূপ অন্তরের প্রেরণায় যাঁহারা জগতের হিতে রত হন, তাঁহারা সুখ্যাতি মান বা লজ্জা কিছুরই উপর লক্ষ্য রাখেন না।

যদি ঈশ্বর কি জানিতে চাও, যদি উন্নত হইতে চাও তবে যিনি—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

এরূপ জনকে আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

শিক্ষক। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাই তাহা বিশেষ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল গল্প শুনার মত শুনিয়া গেলে আমার শ্রম সার্থক হইবে না। সেই জন্য যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শুন।

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনন্ত, অনাদি, সত্যস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া খ্যাত করেন। এবং ইহাও বলিয়া থাকেন যে এই ঈশ্বর আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ গুলির প্রয়োগ করা হয়, তাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই। প্রথমে নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন।

ছাত্র। যাঁহার কোন রূপ নাই তিনিই নিরাকার। এ ভিন্ন নিরাকার শব্দের কি অন্য কোন রূপ অর্থ আছে না কি ?

শি। রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই শব্দ একের অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে অনেক সময় অনেকে আকার কথাটির অর্থ সম্বন্ধে অনেক ভুল করিয়া থাকেন। দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন গুণ সকল আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। বল দেখি, দ্রব্যের আকার আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় ?

ছা। দ্রব্যের আকার আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়।

শি। যাহাকে দ্রব্যের বর্ণ গুণ কহে তাহাই আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বর্ণ গুণকে দ্রব্যের রূপ বলে এবং যাহা দ্রব্যের আকার তাহাকে ও সময়ে সময়ে রূপ বলা হয়। রূপ শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ থাকাতে অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর তাহার বুঝি কোন আকার নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বায়ুর আকার আছে। এক জন জন্মান্ধ, যে কখন ও কোন দ্রব্যের রূপ চক্ষে দেখে নাই, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। এই যে আমার পয়সাটি রহিয়াছে ইহার আকার গোল এবং ইহার বর্ণ লোহিত।

কোন দ্রব্যের আকার কি, এই কথাটিতে সেই দ্রব্য কিরূপ আয়তন বিশিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাই বুঝায়। কোন দ্রব্য আছে কিন্তু উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই ইহা আমরা অনুভবই করিতে পারি না। এবং ঐ দ্রব্য যেরূপ সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাকে দ্রব্যের আকার বলা যায়।

যদিও আমাদের দ্রব্য জ্ঞান ও তাহার আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান উক্ত দ্রব্যের গুণ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হওয়াতেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু উহা কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নহে। কিরূপে দ্রব্য ও তাহার আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের অন্তরে জন্মিয়া থাকে, তাহার বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। যে কারণেই হউক যখনই বুঝি যে, কোন একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে তখনই সেই দ্রব্য যে কোন না কোন স্থানে অবস্থিত এবং কোন না কোন পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া আছে, ইহা মনে হইবেই হইবে। স্থান ব্যাপকতা কথাটিতে যে অর্থ বুঝায় তাহা বস্তুর ধর্ম্ম। অর্থাৎ কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই

অথচ বস্তু আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। যে দ্রব্য যেরূপ সীমাবেষ্টিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর আকার।

এখন দেখ ঈশ্বর নিরাকার এই কথায় কি অর্থ বুঝায়। ঈশ্বর কথাটিতে কোন বস্তু বুঝায়, কি কোন গুণ বুঝায়? সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কথাটিতে সর্ব্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী, তখন ঈশ্বরের যে স্থান ব্যাপিকতা গুণ আছে, তাহা সকলেই শুনিবেন। এই পয়সাটি স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই জন্ম উহাকে সাকার বলি কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যাপিয়া আছেন অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলি, ইহার কারণ কি?

আমরা সচরাচর সাকার এই বলিতে কি অর্থ বুঝি। যে দ্রব্য কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহাকেই সাকার বলিয়া বুঝি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কি কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছেন? এই বিশ্ব যে অনন্ত ও অসীম। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই, এই জন্মই তিনি নিরাকার।

যদি বল কল্পনায় বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, তবে আমি বলি যে কল্পনায় একটি সীমা দিয়া একবার ভাব দেখি যে ঐ সীমার বাহিরে আর স্থান নাই। ইহা তুমি ভাবিতে পারিবে না। এই জন্মই বিশ্বের সীমা নাই, এই জন্মই ঈশ্বর নিরাকার। এখন বুঝিয়া দেখ যে বস্তু অসীম তাহাই নিরাকার। একমাত্র ঈশ্বরেরই কোন সীমা নাই, এই জন্ম ঈশ্বরই নিরাকার। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তাহার সীমা আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। এমন কোন সীমাবদ্ধ স্থান ভাবিতে পারি না যাহার বাহিরে আর স্থান নাই, সুতরাং ঈশ্বর যখন বিশ্বব্যাপী, তখন তাঁহার সীমা

আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, এই জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাকে নিরাকার বলে।

ছা। ঈশ্বর নিরাকার এই অর্থে আমি এই বুঝি যে, মন যেরূপ নিরাকার বস্তু ঈশ্বর সেই অর্থে নিবাকার।

শি। মনকে যদি কোন বস্তু বিশেষ বল তবে উহা অবশ্যই কোন না কোন স্থান ব্যাপিয়া থাকিবে। যখন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মনের কথা বল তখন একটি মন অবশ্যই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মনেরও আকাব আছে বলিতে হইবে। যদি তুমি মনের স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম অস্বীকার কর, তবে মনকে আর বস্তু বলিতে পার না। তাহা হইলে মনকে কোন না কোন স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণ মাত্র বলিতে হইবে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের কোন আকার স্বীকার করেন না এবং এই জন্যই তাঁহারা মনকে আমাদের দেহস্থিত বস্তু সমষ্টির গুণ মাত্র বলিযা থাকেন, কিন্তু আমাদের হিন্দুগণ দেহ ছাড়া মনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মন ভিন্ন ভিন্ন রূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। তুমি যে মনকে নিরাকার বস্তু বলিতেছ তাহার কারণ কি ?

ছা। মনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই সকল গুণ নাই, এই জন্যই মনকে নিরাকার বস্তু বলি।

শি। সচরাচর যে সকল স্থূল দ্রব্যকে আমরা সাকার জ্ঞান করি তাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গুণ অনুভব দ্বারাই তাহাদের আকার জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সেই জন্য আকার আছে বলিলেই তাহার রূপ রসাদি গুণের কোন না কোন গুণ আছে ইহা মনে হয়। কিন্তু

রূপ রসাদি যে সকল গুণ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন নামক বস্তুর সে সকল গুণ নাই সুতরাং তাহার আকার কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যে সকল সাকার পদার্থের ঐ সকল স্থূল গুণ নাই,আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদের আকার নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। মানব স্থূল ইন্দ্রিয়ে অভিমানী না থাকিলে তাহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম সাকার বস্তুর আকার নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন। যখন তুমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রা যাও এবং স্বপ্ন দেখ তখন তুমি যে নানারূপ আকার দেখিতে পাও সে কাহার আকার? তোমার নিজের মন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে যে আকার ধারণ করিয়া থাকে সেই সেই আকার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মে।

এখন বুঝিয়া দেখ যে, মনকে কোন বস্তু বিষয়ের গুণ বলিয়া কোন বস্তু বলিলে উহার আকার আছে বলিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ সাকার বস্তু বলিলে যেরূপ স্থূল সাকার বস্তু মনে হয়, মন সেরূপ সাকার নহে। স্থূল বস্তু সকল স্থূল জাতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। যাঁহারা স্থূল বস্তু ভিন্ন অন্য কোনরূপ সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহারা মন যে এই স্থূল দেহ ছাড়া অন্য কোন বস্তু ইহাও বলিতে পারেন না।

এক্ষণে দেখ মনকে যে অর্থে নিরাকার বল, ঈশ্বরকে সে অর্থে নিরাকার বলিতে পার না মনকে বস্তু বলিলে মনকে কোন সীমাবদ্ধ বস্তু বলিতে হইবে। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই এই জন্যই তিনি নিরাকার।

নিরাকার শব্দের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে ঈশ্বর নির্গুণ, এই শব্দে কি অর্থ বুঝা যায় বল দেখি।

ছা। ঈশ্বর নিগুর্ণ এই কথাটির অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। যাঁহা হইতে এই জগতের সমস্ত পদার্থের গুণ জন্মিযাছে, তাঁহাকে কি কি করিযা নিগুর্ণ বলিতে পারি।

শি। যেমন সূর্য্য কিরণের বর্ণ, শ্বেত পীতাদি বর্ণ সকলের সমষ্টি বর্ণ, সেইরূপ এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে সেই সমুদয় গুণের সমষ্টি গুণ যে একটি অসীম গুণ, তাহাই ঈশ্বরের বিশ্বরূপ কথাটির অর্থ বুঝাইব তখন সমষ্টি গুণ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইযা দিব। ঈশ্বরের এই অসীম গুণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিযেরই বিষয় হইতে পারে না। কেননা যে গুণ সীমাবদ্ধ তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে কিন্তু যে গুণ কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না।

ছা। সীমাবদ্ধ স্থান কথাটির অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু সীমাবদ্ধ গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

শি। সীমা কথাটির অর্থ কি। এই সোনার বর্ত্তুলটি একটি সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিযা আছে, যখন এই কথা বলা যায়, তখন সীমা শব্দে কি অর্থ বুঝায়। এই বর্ত্তুলটি একটি স্থান ব্যাপিয়া আছে এবং সেই স্থানটি ছাড়া অন্য স্থান আছে। এই দুইটি স্থান যাহা দ্বারা পৃথক্ ভাবাপন্ন হইযাছে তাহাই এই বর্ত্তুলটির সীমা। সেইরূপ যখন লোহিত বর্ণ, এই গুণ সম্বন্ধে ভাবি, তখন এই বর্ণটি লোহিত বর্ণ নয় এমন বর্ণও আছে,ইহা বুঝিযা থাকি। যাহা লোহিত এবং যাহা লোহিত নয় এই উভয়ের প্রভেদ বিচার করিয়াই লোহিত বর্ণটি কি তাহা বুঝিতে পারি। যখনই একটি গুণকে অন্য গুণ হইতে পৃথক ভাবিব অমনই বলিব যে, সেই গুণটির একটি সীমা আছে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল গুণের জ্ঞান জন্মে সে সকলেরই সীমা আছে।

ইন্দ্রিয় গুলি একটি হইতে আর একটির প্রভেদ দেখাইয়া দেয় বলিয়াই গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। আমাদের গুণ সম্বন্ধে যত জ্ঞান সকলই আপেক্ষিক অর্থাৎ একটি গুণের জ্ঞান অন্য গুণের উপর অপেক্ষা করে। ইংরাজিতে ইহাকে Relativity of Knowledge বলে। গুণ জ্ঞান আপেক্ষিক; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণ মাত্রেরই সীমা আছে। যদি দুঃখ কাহাকে বলে না জানিতাম তবে সুখ কাহাকে বলে বুঝিতাম না। যেখানে সুখের শেষ, সেইখান হইতে দুঃখের সীমা আরম্ভ। যেখানে অজ্ঞানের শেষ সেইখান হইতে জ্ঞানের সীমা আরম্ভ। কিন্তু ঈশ্বরের যে গুণ আছে বলিয়াছি, তাহার সীমা নাই। সুতরাং তাহা কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা যাঁহাকে সগুণ বলিয়া বুঝি ঈশ্বর তাহা নহেন। ঈশ্বর নির্গুণ।

ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই, এই কথাটির অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, বারান্তরে সে চেষ্টা করিব।

শি। সে দিন তোমাকে বলিয়াছি যে ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই—এই জন্যই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বর অসীম গুণ বিশিষ্ট। এই জন্যই তিনি নির্গুণ, এ কথাটি অনেকের কাছে কেমন নূতন কথা ঠেকিবে। তাহার কারণ এই—অসীম কথাটিতে সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ বুঝা যায় যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী—যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই তাহাকেই অসীম বলা যায়। কিন্তু আমরা যে অসীম কথাটি ব্যবহার করিয়াছি, তাহার অর্থ এই, যে যাহার কোন বিশেষ সীমা নাই। যে গুণের এমন কোন সীমা নাই, যাহা দ্বারা তাহাকে অন্য কোন গুণ হইতে বিশেষ রূপে ভাবা যায়, তাহাই অসীম গুণ। ঈশ্বর নির্বিশেষ, এই জন্য তিনি নির্গুণ। যদি বলি যে তুমি

বড় সুন্দর—তবে এই বুঝায় যে, যে গুণ থাকিলে তুমি কুৎসিৎ হইতে বা মাঝামাঝি রকমের শ্রী বিশিষ্ট হইতে, সেই সেই গুণ তোমাতে নাই। তোমার সৌন্দর্য্য যে গুণ তাহার সীমা রহিযাছে, কিন্তু এই জগতে যত গুণ আছে, সকলেই ঈশ্বরের একমাত্র গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণটি তাঁহাতে আছে এবং তাহারই বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁহাতে নাই, একথা বলা যায না। এই বিশ্বে যত স্থান (Space) আছে, তত স্থান তিনি ব্যাপিযা আছেন, এই জন্য তিনি নিরাকার এবং এই জগতের যত গুণ আছে, সমস্তই তাঁহার এক অনীর্ব্বচনীয় গুণের অন্তর্গত, এই জন্য তাঁহার গুণের সীমা নাই। এই জন্য তাঁহার গুণ আমাদের ইন্দ্রিযের বিষযীভূত হইতে পারে না এবং এই জন্যই তিনি নির্গুণ।

একটি উপমা দিয়া নির্গুণ কথাটি বুঝাইতে চাই। আজ কাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে যদি এক খণ্ড রেশম বস্ত্র দ্বারা একটি কাঁচের খণ্ডকে ঘর্ষণ করা যায, তবে ঐ কাচ ও রেশম বস্ত্রে তাডিত শক্তির গুণ দেখা যায। কিন্তু ঐ কাচের তাডিত শক্তি এবং ঐ রেশমের তাডিত শক্তি ভিন্ন প্রকার। বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ একটির নাম পজিটিভ্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং অন্যটির নাম নেগেটিভ্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি বলেন। কিন্তু তাডিত শক্তি এই দুই ভাগ হইবার পূর্ব্বে কাচে বা রেশমের বস্ত্র পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল,তাহাকে তাঁহারা নিউট্রাল ইলেক্‌ট্রিসিটি বলেন। যেমন এক নিউট্রাল ইলেক্‌ট্রিসিটি দুই ভাগে ভাগ হইযা পজিটিভ ও নেগেটিভ্‌ দুই প্রকার তাড়িত শক্তি রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের এক নির্গুণ ভাব হইতেই জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সগুণ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে যে চেতন গুণ বা জড় গুণ দেখিতে পাই, তাহা

ঈশ্বরের অন্তর্গত একমাত্র গুণের ব্যষ্টি ভাব। ঈশ্বর চেতনও নহেন, জড়ও নহেন, হিন্দুগণ তাঁহার সেই নিগুর্ণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ নাম দিয়া থাকেন। চেতন গুণ কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু এই অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ তাহা আমরা অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম।

হিন্দুগণ একস্থলে ঈশ্বরকে নিগুর্ণ, আবার অন্য স্থলে তাঁহাকে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় এইরূপ বলিয়াছেন দেখিযা অনেকে উক্ত দুই বিশেষণকে বিরুদ্ধভাব বিশিষ্ট বুঝিযা থাকেন, কিন্তু একটু ভাবিযা দেখিলে ঐ দুইটি বিশেষণই যে একার্থবোধক তাহা বুঝা যায়।

ছা। আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে যাহাকে আমাদের মন বলা যায় তাহা সাকার বস্তু, কিন্তু এ কথাটির অর্থ আমি ভাল করে বুঝিতে পারি নাই।

শি। আমাদের মন যে সাকার কি নিরাকাব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা পুনরায বলি শুন। মন এই শব্দটিতে যদি কোন বস্তু বুঝ তবেই সাকাব বস্তু, আর যদি মন কথাটিতে কোন বস্তু বিশেষের গুণ বুঝ তবে সেই গুণের ত আব কোন আকাব থাকিবে না। কিন্তু সেই গুণ অবশ্য সাকার বস্তুর গুণ হইবে। হিন্দু ঋষিগণ মনুষ্য শরীরকে পাঁচটি কোষের সমষ্টিতে নির্ম্মিত, এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমাদের স্থূল দেহ যেরূপ স্থূল দ্রব্যে গঠিত, তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য গঠিত আর চারিটি কোষ উহারই মধ্যে আছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে একটির নাম মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষ সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু। ইহাকেই কখন কখন মন বলা যায়, আবার কখন কখন এই কোষের গুণকে মন বলা হয়। সুতরাং হিন্দুদের মতে মন কোন সাকার বস্তু বা সাকার বস্তুর গুণ বিশেষ।

ছা। ইংরাজি মনোবিজ্ঞান সকল পাঠ করিয়া mind আর matter এই দুইএর মধ্যে matter সাকার, mind নিরাকার. আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা আমি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না।

শি। যাহাকে আমরা স্থূল জড় বস্তু বলি, ইংরাজী matter শব্দে তাহাই বুঝায়। Mind কিন্তু স্থূল জড় বস্তু নহে, সুতরাং mind আর matter যে ভিন্নরূপ বস্তু তাহার সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দ্রব্যের আকার উপলব্ধি করিতে পারি না এবং মন স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তু নহে সুতরাং মনের আকার কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আকার কথার যাহা যথার্থ অর্থ, তাহা বুঝিলে তোমার মনে আর গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ যে তোমার মন তোমার দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, অথচ উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই। এরূপ ধারণা তুমি কখনই করিতে পারিবে না। মন সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিবে, তাহার ভাব যদি কোন রূপ ধারণা করিতে না পার, তবে এরূপ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগের ফল নাই।

আমার মতে এই জগতে সমস্তই সাকার, কেবল একমাত্র ঈশ্বরই নিরাকার।

ছা। যাহাকে ইংরাজীতে spirit বলে এবং হিন্দু শাস্ত্রে আত্মা বলে, তাহা সাকার কি নিরাকার? মনকে বস্তু বলিলে মনকে যে জন্য সাকার বলিতে হয়, আত্মাকেও তাহা হইলে সেই কারণে সাকার বলিতে হয়।

শি। যাঁহাকে আত্মা বলা যায় তাহা অবশ্যই দেশ ব্যাপী। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ আকার নাই কেন না তোমার আত্মা ও আমার

আত্মা একই পদার্থ। এই আত্মাই ঈশ্বর এবং ইহাই একমাত্র নিরাকার পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকা থাকিলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ, সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু আছে দেখিতেছ, এক জগদাধার আত্মা সেই সকলেরই আধার। হিন্দুদের এই মত জানিবে। আত্মা কথাটির অর্থ যে যাহা না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না তাহাই আমার আত্মা। হিন্দুগণ বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন যে আদি কারণ ঈশ্বর আমাতে না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না, এই জন্যই ঈশ্বরই আত্মা জানিবে। যাঁহারা মনে করেন যে এই স্থূল দেহ না থাকিলে আর আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, তাঁহাদের পক্ষে এই স্থূল দেহই আত্মা। কিন্তু ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন এই স্থূল দেহের অভাবে ও আমার অস্তিত্ব থাকে, সুতরাং স্থূল দেহ আত্মা নহে। এমনকি সূক্ষ্ম শরীর না থাকিলেও আমার অস্তিত্ব থাকে, সেই জন্য সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা নহেন। এইরূপ, আমি কে এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরই আমি। সেই জন্য ঈশ্বরকে যে অর্থে নিরাকার বলা হয়, আত্মাকেও সেই অর্থে নিরাকার বলা হয়। ক্রমে ক্রমে এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি।

শিক্ষক। এক্ষণে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ এই কথাটির অর্থ কি বলি শুন।

ছাত্র। আপনি ঈশ্বরকে নিরাকার বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাকে যাহাকে ইংরাজীতে Spirit বলে তাহাকে বস্তু বলা কি ঠিক সঙ্গত হয়?

শি। দেখ ইংরাজীতে Matter আর Spirit এই দুই কথায় তোমার মনে যে অর্থ ধারণা হইয়াছে তাহার মধ্যে matter শব্দের অর্থ আর বস্তু শব্দের অর্থ তোমার মনে একইরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইংরাজীতে matter বলিলেই জড় পদার্থ বিশেষ, এইরূপ জ্ঞান হয়, আর spirit অর্থে যাহা জড় নহে তাহাকেই spirit বলিয়া বুঝায় কিন্তু আমরা যে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিতেছি তাহার অর্থ এই যে যাহার বাস আছে, তাহাই বস্তু, ইংরাজীতে যাহাকে existence বলে, সেই existence যাহার আছে তাহারই নাম বস্তু। কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় যখনই যে কথাটি প্রয়োগ করিবে তাহার ঠিক অর্থটি কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে ভিন্ন ভিন্ন কথার ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ পরিষ্কার রূপে না বুঝিবার দরুণ অনেক সময় বিচারে ভুল হইয়া পড়ে।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতই উন্নত দশা প্রাপ্ত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, এই জগত যে এক মাত্র বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এইটি প্রমাণ করিবার পথে তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন

এই এক মাত্র বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির ক্রিয়া হইতেই এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যগণ ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সকলের মধ্যে আবার এরূপ সম্বন্ধ আছে যে এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকার শক্তি রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শক্তি সকলের এই সম্বন্ধকে তাঁহারা correlation of-energy বলিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ এই বিশ্বের আকার সম্বন্ধে যাহা বুঝেন তাহাও ঐরূপ। তাঁহারা ও বলেন যে এই জগত কেবল মাত্র বস্তু দ্বারা গঠিত। যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির ক্রিয়া এই জগতে দেখিতে পাই সকলেই এক মাত্র শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থা মাত্র। এবং সেই একমাত্র বস্তু, সেই এক মাত্র শক্তির বশে যে গুণ বিশিষ্ট হন তাহাই ঈশ্বরের গুণ। এই বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। এই জন্যই তাঁহাকে বিশ্বরূপ কহা যায়।

ছাত্র। জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের যেরূপ ধারণা আছে হিন্দুদের ধারণা ও কি সেই রূপ ছিল?

শি। ঠিক সেরূপ নহে, কিন্তু প্রভেদ আছে। এই বিশ্বের সমষ্টি শক্তি যে এক এবং উহাই যে সেই আদি কারণের অনন্ত শক্তি ইহা উভয়েই বলিয়া থাকেন বটে কিন্তু ঐ সমষ্টি শক্তি যে কিরূপ শক্তি সে বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির তালিকায় তেজ, তাড়িত, আলোক, ইত্যাদি স্থূল শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির উল্লেখ নাই, সেই জন্য তাহাদের সমষ্টি শক্তি তেজ তাড়িতের ন্যায় কোন রূপ শক্তি হইবে, তাঁহাদের ধারণা এই, কিন্তু হিন্দুদের শক্তির তালিকার ভিতর ঐ সকল স্থূল শক্তির সহিত

ইচ্ছা শক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি, অনুভব শক্তি ইত্যাদি চেতন শক্তি সকল ও ধরা হইয়া থাকে। হিন্দুগণের মতে এই সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তিরই প্রাধান্য জগতে এত অধিক যে সমষ্টি করিতে গেলে সমষ্টি-ফল স্থূল জাতীয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, হিন্দুদের মতে এই সমষ্টি শক্তি চেতনজাতীয়, জড়-জাতীয় নহে, এবং এই শক্তিকে তাঁহারা বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শক্তি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে চেতন শক্তি বলিয়া বুঝি, বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি সেরূপ নহে একথাটি যেন স্মরণ থাকে।

সমষ্টি শক্তি কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝ। যাহা দ্বারা দ্রব্যের অবস্থান্তর জন্মে তাহার নাম শক্তি। তেজ (heat) এক প্রকার শক্তি কেন না উহা শীতল দ্রব্যকে উষ্ণ অবস্থায় লইয়া যায়। এই এক তেজ শক্তি বরফকে জলের আকারে, জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ জলীয় বস্তুতে একটি নির্দ্ধারিত পরিমাণ তেজ থাকিলে উহা কঠিন বরফের আকারে থাকে। ঐ বরফে নিহিত শক্তিকে কঠিন শক্তি বলিতে পার। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ তেজ থাকিলে ঐ জলীয় বস্তু তরলাকার ধারণ করে তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে তরল শক্তি নাম দাও, আরও অধিক পরিমাণ তেজ থাকিলে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি নাম দিতে পার। যেমন তেজ নামক একই শক্তি অবস্থাভেদে কঠিন শক্তি, তরল শক্তি এবং বাষ্পীয় শক্তি নাম পাইল, সেইরূপ এই জগতে একই প্রকারের আধারে প্রযুক্ত শক্তি অবস্থাভেদে দেবশক্তি জড়শক্তি চেতনশক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি পরিমাণের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।

এইবারে মনে কর, খানিক বরফ, খানিক জল এবং খানিক বাষ্প একত্রে মিশাইলাম, ঐ তিনটি পদার্থে যে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টি শক্তি ঐ তিনটি পদার্থে যে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টি শক্তি ঐ তিনটি দ্রব্যস্থ জলীয় বস্তুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিল। এই তিনের মিশ্রণে মিশ্রিত দ্রব্য যদি বাষ্পাকার ধারণ করে তবে ঐ সমষ্টিশক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি বলিতে পার, যদি তরলাকার ধারণ করে তবে উহাকে তরলশক্তি বলিতে পার। সেইরূপ এই বিশ্ব যখন একাকার ধারণ করিবে, যখন বিভিন্নতা আর থাকিবে না, তখন এই বিশ্বের যে অবস্থা বিশ্বের সমষ্টি শক্তির তাহাই সংজ্ঞা হইবে। এই বিশ্বের শক্তিতত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা বিনা কেহই বলিতে পারেন না যে, এই সমষ্টিশক্তি চেতন কি জড় কি অন্যরূপ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শক্তিতত্ব সম্বন্ধে অতি অল্পদূর অগ্রসর হইযাছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি এই সমষ্টি শক্তিকে জড় শক্তি বলে তবে আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুঋষিগণ যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বনে বিশ্বের সহিত আপনাদিগকে একভাবাপন্ন করিয়াছিলেন তাঁহারা যেরূপ বলেন তাহা কতদূর সত্য তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মতে এই বিশ্ব জড় নহে, ইহা চেতনও নহে, ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যময়।

যদি সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধীয় ভাব সমূহ অন্তরে একেবারে যুগপৎ ভাবিতে পার তবেই ঈশ্বর কি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। এই বিশ্বই ঈশ্বর এই জন্যই তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয। এই বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ পদার্থে চিত্রিত দেখিতেছ কিন্তু ইহাকে অখণ্ড এক বস্তু জানিও। এই এক বস্তুই ঈশ্বর। একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ বড় গভীর। সেই একমেবাদ্বিতীযং বস্তু কি তাহা অন্তরে ধারণা করিতে চেষ্টা কর

এবং এই চেষ্টাই ঈশ্বরোপাসনা। একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ যাঁহারা এরূপ বুঝেন যে জগতে দেবদেবী নাই তাঁহারা উহার অর্থ কিছুই বুঝেন নাই। হিন্দুগণ ঐ বাক্যটি মহাবাক্য বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে নিরাকার নিগুর্ণ ও বিশ্বরূপ এই তিনটি কথার যেরূপ অর্থ বলিয়াছি তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যদি আমার মতের সহিত কোন বিষয়ে অনৈক্য হও তবে তাহা আমাকে বলিবে।

ছা। আপনি নিরাকার ও নিগুর্ণ কথায় যেরূপ অর্থ বুঝাইয়াছেন তাহাতে আমার বোধ হয় যে যাহা সগুণ তাহাই সাকার।

শি। আমিও ইহাই বুঝি যে যাহার গুণ আছে তাহার আকারও আছে। কেন না, যাহাতে কোন সীমাবদ্ধ গুণ আছে তাহা যে অসীম স্থানব্যাপী ইহা সম্ভব নয়। এই জন্য যাহার গুণ সীমাবদ্ধ তাহার আকারও সীমাবদ্ধ বুঝি। ঈশ্বরকে যদি সগুণ অথচ নিরাকার বলি তবে এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না।

ছা। ঈশ্বর বিশ্বরূপ নিরাকার ও নিগুর্ণ। তাঁহার আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহার উপাসনা কিরূপ সম্ভবে ?

শি। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোচর এই কথা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন তবে আমি বলি যে তিনি নিরাকার কথার অর্থ বুঝেন নাই। নিরাকার ও নিগুর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই ভাবা যায় না বলিয়া সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দেয়। বেদান্ত শাস্ত্রে

উপাসনা সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে "সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপারানি উপাসনানি।"

সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে ততই সেই আত্মার উজ্জ্বল আভা অন্তরে উদিত হইবে। তখন মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরের স্বস্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ছা। সগুণ ঈশ্বর কথাটির অর্থ কি।

শি। ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই ঈশ্বরে লীন হইয়াছেন। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইযাছেন তাঁহার আর পরিবর্ত্তন নাই।

এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য দশার চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যরূপ আধারে সমগ্র বিশ্ব যাঁহাতে একেবারে প্রতিবিম্বিত হইযা আছে তিনিই সগুণ ঈশ্বর। যে নিয়ম শৃঙ্খলাবশে এই বিশ্ব চালিতেছে সেই নিয়ম শৃঙ্খল যাঁহার কার্য্যশৃঙ্খলে দেখা যায় তিনিই সগুণ ঈশ্বর। তিনি মনুষ্য অথচ ঈশ্বর এই জন্য তিনি সগুণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয়, যিনি মনুষ্য আকার ধারণ করিযাও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাঁহার আমি জ্ঞান এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তিযাছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করেন সেই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ Man God বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করেন সেই Man God কথাটি, আর সগুণ ঈশ্বর কথাটি, আমি একই অর্থবোধক জ্ঞান করি। যদি ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লালসা জন্মিযা থাকে তবে এইরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরামে চিন্তা কর। নিজের আমি জ্ঞান এইরূপ মুক্তাত্মার গুণে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমেই দেখিবে চিত্ত নির্ম্মল

হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন তোমাকে ক্রমে ক্রমে পথ দেখাইয়া দিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র যতই আলোচনা করিবে ততই দেখিবে যে এইরূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান পিপাসুর চিন্তার একমাত্র অবলম্বনীয় অমূল্য ধন। এই চিন্তার বশে উক্ত উপাসকের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ক্রমেই আত্মজ্ঞান জন্মিবে। তিনি ক্রমেই বুঝিতে পারিবেন ঈশ্বরের স্বরূপ কি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরেব স্বরূপ কি ?

ছা। আপনি ঈশ্বরেব স্বরূপ কি ইহা বুঝাইবার জন্য যে মনো বিজ্ঞানেব কথাটিতে প্রবেশ করিযাছেন তাহার প্রয়োজন বড বুঝিতে পাবিতেছিনা এবং সেই কচকচিব মধ্যে প্রবেশ করা বড ডুরুহ বোধ হইতেছে।

শি। দেখ, মনোবিজ্ঞানেব কচকচিতে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বব কি এবং হিন্দুধর্ম্মই বা কি তাহা সবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রেব অভ্যন্তবে প্রবেশ না করিলে হিন্দুধর্ম্মেব শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিবে না। সেই জন্য ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর কথাটিতে কি অর্থ বুঝায তাহা তোমাকে কতক বুঝাইবার চেষ্টা করিযাছি। খ্রীষ্টিযানদের God আর আমাদের ঈশ্বর এই দুইটি কথার একই রূপ নহে। খ্রীষ্টিয়ানরা গির্জ্জায গিযা যেরূপ প্রার্থনা করাকে ঈশ্বরোপাসনা বলেন হিন্দুমতে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবেচনায় জগতের আদি কারণ ঈশ্বর একজন মহান্ ব্যক্তির ন্যায়, জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে অবস্থিতি করিযা জগতের কাজ কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেছেন। কে কখন কি কার্য্য করিতেছে তাহা সদাই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে জগৎ কারণ ঈশ্বর এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে বাস করেন না। এই জগতই হিন্দুদের মতে অনন্ত অনাদি এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যময়। হিন্দুদের মতে

ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সমষ্টিভাব সদাই এক। এই একই ঈশ্বর ইনি নিগুর্ণ, নিরাকার এবং সচ্চিদানন্দ। এই এক-মেবাদ্বিতীয়ং পুরুষের মহিমা হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে, সেই নিয়মের বশেই মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতেছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর এই জগৎ রূপ রাজ্যের কাজ কর্ম্ম লইয়া সদাই ব্যস্ত, হিন্দুদের ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন কূটস্থপুরুষ। এই কূটস্থ পুরুষের বিশ্বরাজ্য অনন্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ফলে চলিতেছে, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিবে না, সুতরাং ঈশ্বর যে এই জগতের জমীদারী লইয়া সদাই ব্যস্ত আছেন ইহা হিন্দুরা কল্পনাতেও জানিতে পারেন না। যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে এ নিয়মের লঙ্ঘন কখনই হইবে না, তবে পূণ্যবান্‌কে পূণ্যের ফল আর পাপীকে পাপের ফল দিবার জন্য ঈশ্বর কেন সদাই ব্যস্ত থাকিবেন তাহা হিন্দুরা বুঝিতে পারেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যের কর্ম্মই শুভাশুভ ফল-প্রদাতা এবং এই তাঁহার সগুণ শক্তিই হিন্দুদিগের দেব দেবী। একথা তোমাকে পরে বুঝাইব। এক্ষণে দেখ, ঈশ্বর কথাটিতে খ্রীষ্টিয়ানরা যেরূপ অর্থ বুঝেন আর হিন্দুরা যেরূপ অর্থ বুঝেন উভয়ে কত প্রভেদ এই প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলেই মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের কচকচির মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব যদি বুঝা যাইত তবে কপিলদেব কষ্টে সাংখ্যশাস্ত্র বা ব্যাসদেব বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অনর্থক আমাদের মাথা ঘুরাইবার বল প্রস্তুত করিয়া যাইতেন না।

বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই তোমাকে ক্রমে ক্রমে বলিতে ইচ্ছা করি।

বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নিগুর্ণ পুরুষ আর যোগ শাস্ত্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা গন্তব্য পদার্থই এই জগতের আদি কারণ। সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্যসুখ, নির্ব্বাণ সুখ পাওয়া যায় না। দেবদেবীর উপাসনায় কোন কোন শুভফল পাওয়া যায় ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত নিত্যসুখ পাওয়া যায় না। সেই জন্যই দেব দেবীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার কাছে অধম উপাসনা। খ্রীষ্টীয়ানগণ ঐহিক বা পারত্রিক সুখ কামনায় যেরূপ প্রার্থনা করাকে ব্রহ্মোপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনা বলেন, সেইরূপ সকাম উপাসনা দ্বারা, উপাসকের কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম ফলপ্রদ শক্তি অর্থাৎ কোন কর্ম্মাত্মক দেব দেবীর সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওরূপ সকাম উপাসনায় মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার কখনও সম্ভবে না। সেই জন্যই উঁহাদের সকাম উপাসনা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মজ্ঞের কাছে দেব দেবীর উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদের সকাম কর্ম্মকাণ্ড দেব দেবীর উপাসনা, কেননা বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা কামনা-সিদ্ধি-দাতা কর্ম্মাত্মক শক্তির সাহায্য লাভ হয়। ঐ সকল কর্ম্মাত্মক শক্তিই দেব দেবী, ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জন্যই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী দেব দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে—

> যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
> বেদবাদরতাঃ পার্থ। নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
> কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাং
> ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
> ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তযাপহৃতচেতসাং।
> ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হয় এবং সেই ভোগৈশ্বর্য্য লাভে মুগ্ধ জনের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। এবং সেই জন্য তাহারা সমাধি সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে। এই জন্যই ব্রহ্ম উপাসকের পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা। একাগ্রচিত্তে যে যেরূপ কামনা করে তাহা একাগ্রতা নিবন্ধন সে সেই কামনানুযায়ী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্য কামনা থাকিলে ভোগৈশ্বর্য্য-ফল-প্রদা শক্তি অর্থাৎ দেব দেবীর সাহায্য পাইবে, আর যদি নিষ্কাম হও অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কামনা না থাকে তবে নির্গুণ নিরাকার শক্তি ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইবে। সকাম কর্ম্মই দেব দেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা জানিও। নিরাকার ঈশ্বরোপাসক নামে খ্যাত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের সকাম উপাসনা বাস্তবিক সগুণ ও সাকার দেব দেবীর উপাসনা।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে ঈশ্বর নিরকার নির্গুণ ও বিশ্বরূপ এই কয়টি কথার যে অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে আজকাল অনেকে প্রকৃত পক্ষে দেব দেবী উপাসনা করিয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। যাহা আমাদের স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত তাহারই নাম যদি নিরাকার হয় তবে দেব দেবী ও নিরাকার। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহা অনন্ত তাহাই কেবল নিরাকার। অনন্ত শক্তির আধার পদার্থই নিরাকার আর শান্ত শক্তির আধার পদার্থই সাকার। দেব দেবীগণ শান্তশক্তি বিশিষ্ট এই জন্য তাঁহাদের উপাসনায় তাঁহাদের সাহায্যে অনন্ত সুখ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়, এই জন্যই নিরাকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তির আধার সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তির

উপাসনা ব্যতীত অনন্ত মুক্তি সুখ কেহ কখন পাইতে সমর্থ হন না। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা তোমায় বলি শুন। যিনি মুক্তি কামনায় একাগ্রচিত্ত, শমদমাদি গুণে অলঙ্কৃত,এবং কোন বিষয় সুখ কামনা রহিত তিনি যে শক্তির সাহায্যে অনন্ত আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। এই অনন্ত জগৎ এই ব্রহ্মশক্তির আধার এবং এই অনন্ত ব্রহ্মশক্তি বিশিষ্ট অনন্ত জগৎই ঈশ্বর। যিনি এই ঐশ্বিক শক্তি অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি আপনাকে অনন্ত সত্বাবিশিষ্ট পূর্ণজ্ঞানী এবং সদানন্দস্বরূপ বুঝিয়াছেন এই জন্যই ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ছা। আপনি বলিয়াছেন যে কর্ম্মাত্মক শক্তির নামই দেব দেবী, এ কথাটির অর্থ কি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

শি। প্রথমে কর্ম্ম কথাটিতে হিন্দুশাস্ত্রে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন। যাহা করা যায় তাহারই নাম কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িলাম ইহা একটি কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িবার ইচ্ছা করিলাম কিন্তু হাত নাড়িলাম না ইহাও একটি কর্ম্ম। আমার হাত নাড়া কর্ম্মটি স্থূল জাতীয় এবং হাত নাড়িবার ইচ্ছা করা কর্ম্মটি সূক্ষ্মজাতীয়। যখন হাত নাড়িলাম, যে শক্তির ব্যয় হইল তখন সেই স্থূলজাতীয় শক্তির ক্রিয়া স্থূল জগতে প্রকটিত হয় অর্থাৎ সেই শক্তি তাড়িৎ বা তেজ বা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া থাকে। আর যখন কেবল মাত্র হাত নাড়িবার ইচ্ছা করিলাম তখন কি আমি কোন শক্তির ব্যয় করিলাম না? হিন্দুদের মতে দৈহিক অঙ্গচালনাদি কর্ম্ম দ্বারা যেমন শক্তির ব্যয় করা হয়, মানসিক কর্ম্ম সকলেও সেইরূপ শক্তির ব্যয় হইয়া থাকে। এই শক্তি স্থূল জগতে তাড়িত তেজ প্রভৃতি রূপে তখনই

পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকটিত হয় না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মজগতে সূক্ষ্মাকারে উহা প্রকাশ পায়।

যেমন একটি বীজ ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি নিবন্ধন ক্ষেত্রস্থ সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে উহা ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফলশায়ী হয়, আমাদের মানসিক চিন্তা কল্পনা বা ইচ্ছা প্রসূত শক্তিও সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতের ক্ষেত্রে বীজরূপে নিহত হয়। ঐ বীজ যে জাতীয় সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে ক্রমে ফল উৎপাদন করে। সূক্ষ্ম জাতীয় যেরূপ শক্তির সাহায্যে মানসিক কর্ম্ম সকল হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেব শক্তি। এবং এই মানসিক কর্ম্মকেই সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্ম বলা যায়। চিত্তের একাগ্রতা হইতে যে কর্ম্মরূপ বীজ উৎপন্ন হয় সেই বীজ বেশী তেজস্বী হয় এবং উহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সূক্ষ্ম জাতীয় যে প্রাকৃতিক শক্তির বশে মানস ব্যাপাররূপ বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেবশক্তি ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কোন শক্তি জগতে আছে কিনা সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ ভঞ্জন জন্য হিন্দু ঋষিগণের দোহাই না দিয়া আমি তোমাকে পাশ্চাত্যগণের মেসমেরিজম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদিগের ইচ্ছা শক্তিতে আমরা যেমন আপনাদেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারি সেইরূপ একজনকে মেসমেরাইজ করিয়া আমার ইচ্ছার বশে তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করা যায়। ইহাতে এই প্রমাণ করা যায় যে আমার ইচ্ছাপ্রসূত সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া তাহার ফলে অপরের স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাইতে সক্ষম হইল। সুতরাং আমার বাহিরে অবশ্যই এমন ক্ষেত্র আছে বলিতে হইবে

যাহাতে আমার ইচ্ছাজনিত শক্তি প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে তাহার ফলে অপরের অঙ্গ সঞ্চালিত করিল। যে ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাশক্তি উহা অন্য জনের অঙ্গচালনক্ষম শক্তিতে পরিণত হইতে পারে তাহাকে পাশ্চাত্যগণের কথায় Animal magnetic fluid বলা যায়। এই রূপ সূক্ষ্ম পদার্থে ব্যাপ্ত ক্ষেত্রই হিন্দুদের মতে দেবশক্তির আধার। এবং এইরূপ ক্ষেত্রাভ্যন্তরস্থ যে শক্তির বশে মনুষ্যের কোন মানসিক কর্ম্মরূপ বীজ হইতে ক্রমে কর্ম্মফল জন্মে তাহাই দেবশক্তি অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মফল প্রদাতা তাহারাই দেবতা।

যেমন স্থূল জগতে তেজ, তাড়িত আদি নানারূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে সেইরূপ সূক্ষ্মজগতেও দেবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই জন্যই হিন্দুদের দেব দেবী সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এই জন্যই কোন একটি দেব সসীম শক্তিবিশিষ্ট ও সাকার। এই জন্যই কোন দেব দেবীর সাহায্যে অনন্তকাল স্থায়ী শুভফল পাওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই স্বর্গ-সুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ দেবদেবীর সাহায্যে পাওয়া যায় তাহাও অনিত্য এবং মুমুক্ষুর বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই বেদের সকাম কর্ম্ম-কাণ্ড মুমুক্ষুর কাছে অধম উপাসনা।

সকাম মানসব্যাপার আর কোন না কোন দেব দেবীর উপাসনা একই কথা। সকাম মানসব্যাপারে রত মনুষ্য অজ্ঞাতসারে দেব-শক্তির অর্চ্চনা করিতেছে। এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া নিত্যসুখদাতা নিত্য পদার্থের অর্চনা করিতে ভুলিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন কোন না কোন দেব দেবীর অর্চনায় আসক্ত হইয়া মানুষে নিত্যসুখ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই হিন্দুধর্ম্মের সার কথা। তবে যে হিন্দুধর্ম্মে দেব দেবীর উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সুস্পষ্ট

বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যাহা দেব দেবীর উপাসনা তাহা একেবারে নিস্প্রয়োজনীয় নহে, ফল-কামনা রহিত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা জীবের বন্ধের কারণ হয় না। অর্থাৎ উহা আপাত পক্ষে দেব দেবীর অর্চনা হইলেও কামনা শূন্যতা নিবন্ধন উহা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা।

যখন একজন মনুষ্য অন্যলোকের উপাসনা করে তখন তাহার উদ্দেশ্য সেই উপাস্য লোকের নিকট হইতে কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া। সেইরূপ কোন দেবশক্তি সাহায্য লাভের জন্য যাহা করা যায় তাহার নাম দেব উপাসনা, আর সেই একমেবাদ্বিতীয়ং অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তি যাহা এই সমগ্র জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির সমষ্টি-শক্তি সেই শক্তির সাহায্য পাইবার প্রয়াসকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। যিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফল কামনা করিয় ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি হাজার কেন ভক্তিভাবেই ডাকুন না ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য তিনি পাইবেন না। তাঁহার প্রার্থনার ফল ফলিবে না। একথা আমি বলি না, কেন না একান্ত একাগ্রতার সহিত সেই ফললাভের কামনা থাকায় ভক্তিবৃত্তির উদ্রেকের সহিত যে মানস ব্যাপার রূপ কর্ম্ম তিনি সৃজন করিলেন, সেই জাতীয় কর্ম্মের ফল প্রদানক্ষম দেবশক্তির সাহায্য তিনি পাইবেন। এরূপ সকাম উপাসক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ডাকিয়া দেব শক্তির সাহায্যে কোন ফল পাইলে সহজেই এরূপ ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, যিনি মনে করেন তিনি বুঝি ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পাইয়াছেন। এইরূপে অনেক স্থলে আমাদের স্থূল চক্ষুর অগোচর কোন দৈব শক্তিকেই ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়ায় মানুষ যে অজ্ঞানে পতিত হয় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড় দুরূহ হইয়া উঠে। এইরূপ উপাসক দ্বারা ঈশ্বরের

মাহাত্ম্যের যত খর্ব্ব করা হয় সাকার দেবদেবীর উপাসক দ্বারা তাহা হয় না। রাজসাক্ষাৎ করিতে গিয়া দ্বারবান্‌ দ্বারা কোনরূপ অনুগৃহীত হইয়া দ্বারবান্‌কেই রাজা জ্ঞান করা যে বড় ভ্রম ইহা তোমাকে আর বেশী বলিতে হইবে না।

সকাম উপাসক কেন ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পায় না তাহার কারণ কি বলি শুন। যদি দুইটি বেহালা একসুরে বাঁধিয়া রাখে, তার একটি বাজাইলে অন্যটি বাজিয়া উঠে, একতানে না বাঁধিলে অমনটি ঘটে না। লোহা চুম্বকের কাছে থাকিয়া চৌম্বুক গুণ বিশিষ্ট হয় তাই চুম্বুকের ও লৌহের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। তোমার মানসিক শক্তির সুর যে প্রকারের হইবে তুমি সেই প্রকারের দেব-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদি তোমার আন্তরিক ভাব সকাম হয় তবে তুমি কামরূপী দেবশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির সাহায্য পাইবে না। আর যদি নিষ্কাম হও যদি মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ আমার মোক্ষ হউক এই দৃঢ় ইচ্ছা অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে অনন্ত শক্তি মোক্ষ-দেবতা তাহারই সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্ব-ব্যাপী, সদানন্দ। যখন নিজেকে ঐরূপ সুরে বাঁধিবার ইচ্ছা অন্তরে উদিত করিতে পারিবে, যখন নিরাকারোস্মি, নির্ব্বাকারোস্মি, নির্গুণোস্মি, সদানন্দোস্মি ইহা বুঝিবার চেষ্টা হইবে, যখন নিজের অহংজ্ঞানের সুরের সহিত বিশ্বের আত্মার সুর মিলাইবার একান্ত বাসনা জন্মিবে, তখনই তুমি ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির সাহায্য লাভের অধিকারী হইবে। ঈশ্বর নিষ্কাম সুতরাং তুমিও নিষ্কাম না হইলে ঐশ্বরিক সুর বাজিবে না। ঈশ্বরের নাম করিয়া সকাম উপাসনা শুনিলে আমার বড় কষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা করিব আর বলিব ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি ইহা

অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে ? খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্ম যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা এই খানেই দেখিতে পাইবে। হিন্দুধর্ম্ম মতে সকাম উপাসনা অধম উপাসনা, তথাপি যদি কোন হিন্দু কোন সকাম উপাসনা করেন তাহা দেব দেবীর সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। ঐশ্বরিক শক্তির ভাব আর কামদায়িনী শক্তির ভাব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাঁহারা কখনও ভুলেন না। হিন্দুগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিত্য-ফল মোক্ষসুখ ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। অনিত্য দেব দেবীগণ মনুষ্যকে অনিত্য সুখ প্রদান করিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখে, অতএব সতত সাবধান থাকিও অনিত্য দেব দেবীগণ যে সুখ দিতে সক্ষম তাহাতে মুগ্ধ হইয়া নিত্য সুখের পথে অগ্রসর হইতে ভুলিও না।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা এইবারে অল্পকথায় বলি শুন। মানবাত্মার সুর যাহার সুরের সহিত মিলাইতে পারিলে মানব নিত্য সুখ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন তিনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন এবং আপনাতে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, ইহা কৃষ্ণোক্তি। অর্থাৎ সমগ্র জগতের সমষ্টি-শক্তির যে সুর, ঈশ্বরে যুক্তাত্মা পুরুষও সেই সুরে বাঁধা। সেই জন্য এই সমগ্র জগতকে অখণ্ড এবং একমেবদ্বিতীয়ং ভাবিয়া ইহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও।

ছা। আপনি আজ যাহা বলিলেন তাহা কি কি বিষয়ে বলিলেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখি। ১ম। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। ২য়। খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরকে যেরূপ শুভাশুভ ফল প্রদাতা মহান্ ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান করেন, বেদান্ত সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর সেরূপ নহেন। ৩য়। সগুণ দেব

দেবীই ঐহিক বা পারত্রিক ফল বিধাতা। ৪র্থ। সকাম উপাসনা দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য কোন ক্রমে পাওয়া যায় না, সকাম উপাসনা কামনানুযায়ী দেব-দেবীর নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছে, ঈশ্বরের ধারেও যাইতে পারেনা, সেই জন্য সকাম উপাসকের পক্ষে কোন বিশেষ দেব বা দেবীর উপাসনা বরং ভাল কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি মনে জানিয়া কোন সকাম উপাসনায় অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িতে হয়। ৫ম। শম-দমাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া, মোক্ষ কামনায় ঐহিক বা পারত্রিক শুভফলে বীতরাগ হইয়া, যে নিষ্কাম উপাসনা তাহাই নিরাকারের উপাসনা। ৬ষ্ঠ। নিষ্কাম হইয়া, কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কোন দেব-দেবীর অর্চ্চনা, যদি মোক্ষলাভার্থে অর্থাৎ ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য করা যায় তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা। ৭ম। ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে সাকার দেব-দেবী বিষয়ক চিন্তা ঈশ্বরোপাসনা, কিন্তু ফল কামনা করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের স্তোত্রপাঠ প্রকৃত পক্ষে দেব-দেবীর উপাসনা। ৮ম। মুমুক্ষু সাধক যে শক্তির সাহায্যে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন তাহাই ঐশ্বরিক শক্তি। ইহাই জগতের সমষ্টি-শক্তি এবং জগদাধারে প্রযুক্ত সেই সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বর। ৯ম। মনুষ্যের মানসিক ব্যাপার সম্ভূত কর্ম্ম সকল যেরূপ শক্তির অধীনে পরে ফলপ্রদ হয় সেই, সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিই দেবশক্তি। ১০ম। সকাম উপাসনা মাত্রেই দেব-দেবীর উপাসনা, আর নিষ্কাম উপাসনাই মোক্ষদায়িনী ঈশ্বরোপাসনা।

আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তাহা এই যে আপনি দেব-দেবীকে কর্ম্মাত্মক কর্ম্মফলপ্রদ সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। তাড়িত তেজ ম্যাগনেটিজম্ ইত্যাদির ন্যায় ঐ সূক্ষ্মজাতীয়

শক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেই জন্য প্রত্যেকের গুণ সীমাবদ্ধ, সেই জন্যই সগুণ ও সেইজন্যই সাকার। আপনি সাকার কথার যেরূপ অর্থ বলিযাছেন সে অর্থে উহাবা সাকার বটে, কিন্তু মনে করুন এই কালীদেবীব যেরূপ রূপ চিত্রিত হয ওরূপ রূপ কি কাহারও আছে ?

শি। তুমি স্বপ্নে নানারূপ আকার দেখিযা থাক। কিন্তু বল দেখি তোমার দৃষ্ট আকারের কারণ কি? স্বপ্নাবস্থায স্থূল শবীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্যের কমিযা যায সেই সময় মানুষের নিজের মানষিক অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে যেমন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তেমনি নানারূপ আকার দেখিতেছি এই জ্ঞান হয। মন বড চঞ্চল এইজন্য ঐ সকল আবার ক্ষণস্থায়ী। যদি কোন বাহিবের শক্তিবলে মনের অবস্থার খানিকক্ষণ একইরূপ থাকে তবে ততক্ষণ ধরিযা ঐ আকার সম্মুখে রহিযাছে বোধ হইবে। যে শক্তি স্থূলদেহস্থ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মনের অবস্থান্তর করিতে পারে তাহাবই নাম সূক্ষ্ম-জাতীয় শক্তি। হিন্দুসাধক সকল দেব-দেবীর চিন্তায তন্ময় হইযা এক প্রকার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায়, (Trance state) থাকিতেন। এই অবস্থায তাহাদেব আভ্যন্তরিক জ্ঞান বেশ আছে কিন্তু স্থূল শবীব বা স্থূলজাতীব জ্ঞান থাকিত না। মেসমেরাইজ করিলে লোকে যেমন অন্তরে জাগ্রত এবং বাহিবে নিদ্রিত অবস্থাব থাকে এ সেইরূপ অবস্থা। এই অবস্থাব সাধকেব মন তাঁহার কামনা ও কর্ম্ম অনুযায়ী সূক্ষ্মশক্তির সহিত একতানে অবাস্থিত করে। এবং তাঁহার মনের অবস্থানুযায়ী রূপ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হয। ইহাই কোন দেব-দেবীব রূপ। এ সব কথা আর একদিন বুঝাইব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাকার নিরাকার উপাসনা।

ছাত্র। মহাশয় আপনি পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে সাধারণ জনের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত।

শিক্ষক। সাকার উপাসনা অর্থে যদি দেব-দেবীর উপাসনা বুঝ তবে আমি সাকার উপাসনার বিরোধী কিন্তু সাকারের আরাধনার সাহায্যে যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহাকে যদি সাকার উপাসনা বল তবে আমি তাহারই পক্ষপাতী। ঈশ্বরতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাকার উপাসনা দেব-দেবীর অর্থে উপাসনা বুঝিতেন। ঈশ্বরতত্বজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই দেব-দেবীর উপাসনার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, দেব-দেবীর উপাসনা ঈশ্বর পদ লাভে ব্যাঘাত স্বরূপ। আজকাল যে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া ঝগড়া দেখিতেছ, ঈশ্বরতত্বজ্ঞ মহাত্মাদের ঐরূপ উক্তিই ঝগড়ার মূল। তাঁহারা কি অর্থে সাকার উপাসনা নিন্দনীয় বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঠিক না বুঝিতে পারাই এই ঝগড়ার গোড়া। যখন সমাজ সেই ঈশ্বর তত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবে তখন ঝগড়া মিটিয়া যাইবে।

ঈশ্বর তত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের উপদেশ এই যে, সাকার অর্থাৎ দেব দেবীর উপাসনা কখন করিও না কেন না উহা দ্বারা শান্তি সুখ মিলে না, দেব দেবীর উপাসনার দ্বারা দেব দেবীর চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে হয়,

তবে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার জন্ত স্থল বিশেষে দেব দেবীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

ছা। আপনি এ কি গোলমেলে কথা কহিলেন ইহার মর্ম্ম ত বুঝিতে পারিলাম না। 'দেব দেবীর উপাসনা' আর 'দেব দেবীর আরাধনা' এই দুইটি কথার কি অর্থ যোজনা করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শি। উপাসনার প্রধান অঙ্গ উপাস্ত পদার্থে ভক্তি, উপাস্ত পদার্থের সহিত সম্পূর্ণ রূপে এক হইয়া যাইবার চেষ্টার নাম উপাসনা। উপাস্য পদার্থে ভক্তিস্থাপন পূর্ব্বক আপনাহারা হইবার চেষ্টার নাম উপাসনা। আর আরাধনা কথাটির অর্থ সন্তুষ্ট করা। আরাধনার আপনাহারা হইতে হয়না। উপাস্য দেব যে দিকে লইয়া যাইবেন আমি সেই দিকে চলিব এইরূপ ভাব সংস্থাপনের চেষ্টার নাম উপাসনা, কিন্তু আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্ম্মে দেব দেবীকে নিযুক্ত করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার নাম দেব দেবীর আরাধনা। ঈশ্বরোপাসক, দেব দেবীর চক্রে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাহারা হইতে চান না। এক ঈশ্বর ভিন্ন, আর কাহার ও জন্য আপনাহারা হইও না, ইহাই ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ, ঈশ্বরান্বেষী জনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহানির্ব্বান তন্ত্রের শেষভাগ এই—

কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা—

নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থী ব্রহ্মোপাসক প্রযোজন অনুসারে কালীর আরাধনায় কোন হানি দেখেন না, কিন্তু কালীতে তিনি আপনাহারা হইতে চান না, কালীকে নিজের বশে আনিতে চান। দেব দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাদের অধীন হওয়ার নাম দেব দেবীর উপাসনা আর নিজের গুণের সৌন্দর্য্যে দেব দেবীকে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের বশে আনার নাম দেব দেবীর আরাধনা। তাহা

বুঝিলে দেব দেবীর উপাসনা কি কুফল তাহা বুঝিতে পারিবে। হিন্দুধর্ম্ম রহস্য বড় গভীর সুতরাং ধর্ম্ম রহস্য সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মিছা গণ্ডগোল করা কাহারও উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মানুসারে দেব দেবীর উপাসনা নিন্দনীয়, কিন্তু স্থল বিশেষে দেব দেবীর আরাধনা প্রয়োজনীয়। হিন্দু ধর্ম্মের এই রহস্য টুকু সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানিতে না।

দেব আরাধনা ক্রিয়ার নাম যজ্ঞ। বেদের কর্ম্মকাণ্ড দেব দেবীর আরাধনা। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছেন। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোস্তিষ্টকাধুক্ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হিবো দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥

দেবতাদিগকে যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে তাহারা দাসের ন্যায় ইষ্ট ভোগ্য সকল দান করিয়া থাকে। সুতরাং দেবতাদিগকে যিনি যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট না করেন তিনি চোর।*

---

* দেব দেবী অর্থে আমি এই বুঝি যে, কর্ম্ম ফলপ্রদ শক্তির নামই দেব দেবী। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ একজন বলিয়াছেন—Every thought of man upon being envolved passes in the inner world and there coalescing with an elimental becomes an active entity এই active entityরাই দেব দেবী। শক্তি দুই

ছা। মহাশয়, ঈশ্বরোপাসকের কাছে বেদের কর্ম্ম কাণ্ড প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় সে কথা এখন ছাড়িয়া দিয়া সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনা লইয়া বিবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহাই প্রথমে শুনিতে চাই।

শি। আমি যাহা বলিতেছি তাহা ঐ বিবাদ সম্বন্ধেই বলিতেছি। ঐ বিবাদের গোড়াটা কোথায় সেটাত আগে খুঁজিয়া দেখা চাই। বেদের কর্ম্ম কাণ্ড আর উপনিষৎ ভাগ লইয়া যে বিবাদ সেই বিবাদই, এই বিবাদের গোড়া। কেহ বলেন কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা (বৌদ্ধমত) ঈশ্বর

প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, দৃষ্ট শক্তি এবং অদৃষ্ট শক্তি। অদৃষ্ট শক্তিই দেব শক্তি।

এই খানে আর একটি কথা উঠিতে পারে, দেবতা বলিতে ভাল শক্তিকেই বুঝায় কিনা? দেবতা কথায় ভাল শক্তিকে বুঝায় কি মন্দ শক্তিকে বুঝায় সে বিষয়ে আমি এই বলি, যে দেবতারা বাস্তবিক ভাল মন্দ কিছুই নহে। মানুষের চিন্তার রূপ অনুসারে দেবতাদের ভাল বা মন্দ বলা যায়, যেমন এক তাড়িৎ শক্তি কখন বা ভাল কাজের জন্য কখনও বা মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কালী শক্তি ঠগীদেরও দেবতা, এবং তান্ত্রিক মুমুক্ষু যোগীদেরও, আর Forces in the astral light অর্থাৎ সূক্ষ্ম জাতীয় শক্তি মাত্রেরই সাধারণ নাম দেব, সেই জন্য দেব ও অসুর কথার অর্থ—হিন্দু ও পারসীকদের মধ্যে উল্টা হইয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম শক্তি সকল নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে অসুর পিশাচ প্রভৃতিও দেব নামে অনেক স্থলে অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পিশাচের আরাধনা করেন পিশাচেরা তাঁহাদের কাছেই দেবতা। আসল কথা আরাধ্য অদৃষ্ট শক্তির নাম

পাওয়া যায় না সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই কেহ বলেন (পূর্ব্ব মীমাংসক) কর্ম্মকাণ্ড ব্যতীত ঈশ্বর পাওয়া যায় না, এই দুই দলের বিবাদ হইতেই সাকার বাদী ও নিরাকার বাদীর মধ্যে বিবাদ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা গীতা শাস্ত্রে এই উভয় মতের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা যাঁহাদের সম্পর্কে আসিতে হয়, তাঁহারা দেব দেবী তাঁহারা সাকার, এবং জ্ঞান কাণ্ড দ্বারা যাঁহার সম্পর্কে আসা যায় তিনিই ঈশ্বর তিনিই নিরাকার। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা বলেন যে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সাকারের আরাধনা প্রয়োজনীয় হইলেও সাকারের উপাসক হইও না। দেব দেবীরা শ্রদ্ধার পাত্র হইলেও ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই ভক্তির পাত্র নহেন। প্রথমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া নিরাকার বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সম্পর্কে আসিয়া সেই ঈশ্বর ভক্তি স্থাপন করাই ঈশ্বরোপাসকের কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও সম্পর্কে আসিয়া আপনাহারা হইলে মুক্তি পাওযা যায না।

দেব বলা যায়। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা আরাধ্য, হিন্দুরা তাঁহাদের দেবতা বলেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মপ্রদ শক্তি সকল যাহারা বেদাদি অনুসারে আরাধ্য নহে তাহারাই অসুর। দেবতা কথার আর একটি অর্থ আছে এই অর্থে তাঁহারা কেবল স্থল বিশেষে আরাধ্য নহেন তাঁহারা উপাস্য। গুরু শক্তির নাম দেবতা। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত করেন তাহাই শিষ্যের ইষ্টদেবতা। কর্ম্ম-ফলপ্রদ সাধারণ শক্তি হইতে এইরূপ দেবতার প্রভেদ এই যে, যে ইহারা গুরুর ক্ষমতাধীন, কিন্তু অন্য শক্তি সেরূপ নহে।

লেখক।

ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই যেন উপাস্য না হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইয়া তবে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কহিয়াছেন।

তন্ন তন্ন করিয়া ঈশ্বরালোচনা করিতে হয়। ইহা কি ঈশ্বর? না ইহা নহে, এইরূপ করিয়া আলোচনা করিয়া তবে ঈশ্বর কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। সাধক স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু দেখিতেছেন তাহাদের মধ্যে কি কেহ ঈশ্বর? না, স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকল সাকার কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং যতক্ষণ এই সকল সাকার পদার্থের সম্পর্ক থাকিবে ততক্ষণ সাধক যেন আপনাহারা হন না। পরে সাধক ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন সরাইয়া লইয়া যখন মনোময় জগতে পঁহুছিয়া জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উঠিবেন তখন যে সকল পদার্থের সহিত সম্পর্কে আসেন তাহাদের মধ্যে কেহ কি ঈশ্বর এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধক দেখিতে পাইবে যে তখনও তিনি সাকারের সম্পর্কে রহিয়াছেন, সুতরাং সে অবস্থায় তিনি যেন আপনা-হারা না হন। এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থার পর সাধক যখন জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিবেন তখন তিনি সাকার অর্থাৎ সগুণ পদার্থের সম্পর্কে আর থাকিবেন না। এইরূপ জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক যাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকেন, তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলে সেই ঈশ্বর সংস্থাপন রক্ষার নাম ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরোপাসনা কথাটি বড় সহজ কথা নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোময় জগতীয় সূক্ষ্ম শক্তির আধার পদার্থ সকলের নামই দেব দেবী। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে এই সকল দেব দেবীর সূক্ষ্ম শক্তির সম্পর্কে আসিয়া সাধক সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। যিনি সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে শিখেন নাই

তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ কখনই অন্তরে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। কেন না ঈশ্বর কি তাহা জানিতে হইলে ঈশ্বর কি নহেন তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরোপাসক ঈশ্বর তত্ত্ব অনুসন্ধান জন্য যখন বাহ্য জগৎ হইতে আপনাকে সরাইয়া লইবেন, তখন তাঁহার ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ আরম্ভ হইবে। এই অবস্থায় তিনি যেন অপনাহারা না হন। এই অবস্থায় তাঁহাকে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রবুদ্ধ রাখিতে হইবে। সূক্ষ্ম জগতীয় সাকার পদার্থ সকল তাঁহার উপাস্য নহে ইহা জানিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকল হইতে ও অপনাকে সরাইয়া লইতে হইবে। এবং এই অবস্থাতে ও প্রবুদ্ধ থাকিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিযা সেই ঈশ্বরই তাঁহাব উপাস্য এইটি জানিযা তখন তিনি আপনাহাবা হইতে চেষ্টা করিলেই ঈশ্বরোপাসকের ঈশ্বর উপাসনা সিদ্ধ হয়।

সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিযা দেব দেবীব সাক্ষাৎ লাভ করিযা তন্ন অর্থাৎ উহারা আমার উপাস্য নহে এইরূপ বিচার দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ ছাডাইয়া কারণ জগতে উঠিতে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিযাই পাছে তিনি সেই অবস্থাতেই আপনাহারা হইয়া নিত্য পদার্থ লাভে বঞ্চিত হন, সেই জন্য ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে প্রধান সাকার পদার্থ অবলম্বন করিযা আপনাহাবা হইও না, কেন না ঈশ্বর নিরাকার।

এক্ষণে দেখ সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে শিখা অর্থাৎ জাগ্রত সপ্নাবস্থায় থাকিয়া বিচার শক্তি প্রবুদ্ধ রাখিতে শিক্ষা ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান। এই অবস্থায় যে সকল পদার্থের সম্পর্কে আসিতে হয় তাহারাই সাকার দেব দেবী। সুতরাং দেব দেবীতে অপনাহারা যদি ও সাধকের পক্ষে হানিজনক কিন্তু দেব দেবীর সাক্ষাৎ লাভ

করিতে যাওয়া অর্থাৎ আমাদের অন্তর নিহিত সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগ্রত করা, এবং তাঁহাদের সম্পর্ক জনিত সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া তন্ন অলোচনা দ্বারা আরও উচ্চে অরোহণ চেষ্টা করাই ঈশ্বরোপাসনার সোপান। সাকারের আরাধনা ব্যতীত নিরাকারের উপাসনা হয় না।

দেখ ঈশ্বরের যে আকার নাই তিনি যে নিরাকার, একথাটা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্ম বেক্তাদের এত কি দরকার পড়িয়াছিল ইহা একবার ভাবিয়া দেখি। ঈশ্বরকে কে কখনও দেখিতে পায় না সুতরাং উহা যে সাকার নহে তাহাত একটা মোটা কথা পড়িয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর সাকার নহেন একথাটির অর্থ যদি এইরূপই হয় যে তিনি আমাদের চক্ষুআদি বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর ইহার যদি অন্য কোনরূপ অর্থ না থাকে তবে ঈশ্বর নিরাকার এ জ্ঞান প্রচারের জন্য ধর্ম্মবেত্তাদের বেশী মাথা ঘুরাইবার দরকার ছিল না। ঈশ্বর সাকার নহেন ইহার আসল অর্থ এই যে মনোময় জগতের সূক্ষ্মশক্তির আধার দেব দেবীগণকে অনেকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিতেন কিন্তু সেই দেব দেবীগণ সাকার, ঈশ্বর তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন পদার্থ এইটি বুঝাইবার জন্যই ঈশ্বর নিরাকার এই কথাটি প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমি তোমাকে যে কথাগুলি বলিলাম তাহার কারণ এই যে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির আধার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সাকার দেব দেবীগণের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলে এবং ঈশ্বর সূক্ষ্মেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহেন অর্থাৎ সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকল হইতে আপনাকে সরাইয়া না লইলে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথাটি ঠিক বুঝিতে পারিলেই আজকাল সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া যত গোলমাল দেখিতেছ সব মিটিয়া যায়।

সাকার উপাসনা অর্থে দেব দেবীর উপাসনা, এই বুঝিয়া কিরূপে দেব দেবীর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয় তাহা যিনি ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন।

আজকাল সাকার পূজা অর্থে প্রতিমা পূজা। প্রতিমাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিলে যে মহাদোষ সে বিষয়ে বেশী বলিবার দরকার নাই। কিন্তু প্রতিমাকে যে ঈশ্বর জ্ঞান করে এরূপ লোক ত দেখি না। প্রতিমাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে মানুষ তাকে কি বিসর্জ্জন দিতে পারে?

ছা। দেব দেবীত তেত্রীশকোটী, এখন ঈশ্বর উপাসনার জন্য কাহার আরাধনা প্রযোজন। সকলেরই আরাধনা করিতে হইবে নাকি?

শি। দেব দেবীর চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্যই দেব দেবীর আরাধনা করিতে হয়, অর্থাৎ আমাদের অন্তর-নিহিত সূক্ষ্ম শক্তির উদ্রেক করিয়া তাহা হইতেই আবার যে শক্তির নিকৃষ্টতা ধারণ হয় তাহা যে ঈশ্বর নহে—ইহা বুঝিতে পারা যায়। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেব দেবী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগ্রত করা যায়। কে কিরূপ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ দেব দেবীর আরাধনা দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিবেন তাহা যদি জানিতে চাও তবে ভগবদ্গীতা বুঝিতে চেষ্টা কর।

তবে প্রতিমাদি মূর্ত্তি সমক্ষে রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা পদ্ধতি কেন যে প্রচলিত আছে তাহা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পরিবে।

দেখ যদি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসক হইতে তোমার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে তবে তোমাকে গুটিকত উপদেশ দিই শুন।

কোন প্রকার বিশেষ পূজা পদ্ধতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনা-

হাবা হইও না, ঈশ্বর এই কথাটিতে ভক্তি রাখিযা অগ্রসর হইতে শিখ।

ঈশ্বর কোথায় আছেন এই কথাটির উত্তরে একজন ঈশ্বর ভক্ত বলিযা ছিলেন যে "ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন"।* কথাটি বড় সুন্দর। ঈশ্বর কোথায় আছেন? ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন, ঈশ্বর গির্জ্জায় নাই, তীর্থে নাই, কোন বিশেষ পূজা পদ্ধতিতে নাই, বিশেষ ধর্ম্মে নাই, কোন বিশেষ কর্ম্মে নাই, তিনি পিতার ভালবাসায় নাই, তিনি স্ত্রীব প্রেমে নাই, তিনি নামে আছেন। শ্রদ্ধার পাত্রে শ্রদ্ধা রাখিও,কিন্তু এই নামটিতে কেবল ভক্তি রাখিও। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া কাঁদিতে শিখিলেই নামে ভক্তি জন্মিয়াছে, এরূপ বুঝিও না। নামে ভক্তির প্রথম ফল কি তাহা বলি শুন। যখন দেখিবে যে নামে ভক্তি থাকা নিবন্ধন তত্ব অলোচনা সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মিয়াছে তখন জানিবে যে ঈশ্বর নামে তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইযাছে।

কাহার ও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলে অন্তরে যে ভাব জন্মে, যে ভাব নিবন্ধন সেই মাহাত্ম্য বিশিষ্ট পদার্থকে ছাড়িতে চাই না, তাহারই নাম ভক্তি। ঈশ্বরোপাসককে ক্রমে ক্রমে সব ছাড়িতে হইবে সুতবাং কোন অনিত্য পদার্থের মাহাত্ম্যে দর্শনেন্দ্রিয মুগ্ধ হয, সঙ্গীত সৌন্দর্য্যে কর্ণ মুগ্ধ হয, ক'বিতার সৌন্দর্য্যে কল্পনাত্মক মন মুগ্ধ হয়, আর নামের মাহাত্ম্যে বুদ্ধি মুগ্ধ হয়। যখন দেখিবে যে তোমার বুদ্ধি বৃত্তির অলোচনা জন্য তোমার অন্য কিছুই ভাল লাগে না, কেবল ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধীয় তত্ব সকল আলোচনা করিতেই তোমার বুদ্ধি বৃত্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তখন তুমি ঈশ্বরের নামে ভক্তি কিরূপ তাহার

*ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চটোপাধ্যায়ের নিকট "নামে ভক্তি" কথাটি প্রথম শিখিয়াছিলাম।

আভাস পাইবে, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য তুমি কিছুই বুঝ নাই এই জ্ঞানটি প্রথম জন্মান চাই, তাহার পর সেই মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য অন্তর যখন লালায়িত হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র বা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র যেখানে ঈশ্বরের নাম পাইবে, সেই সেই শাস্ত্রের ভাব লইয়া আলোচনা করিবার জন্য যখন আগ্রহতা জন্মিবে তখন ঈশ্বর ভক্তি কিরূপ তাহার আভাস পাইবে। ঈশ্বর মাহাত্ম্য কি গভীর, তখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, যে সকল মহাত্মারা ঈশ্বর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গকামনায় প্রাণ মন যখন উতলা হইবে তখন তুমি ঈশ্বর নামে ভক্তি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছ বুঝিও আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া অহঙ্কার যেন কখনও যেন না জন্মে। যে দিন তোমার ঐ অহঙ্কার জন্মিবে সে দিন তোমার উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে।

আজকাল সাকার ও নিরাকার উপাসনা, যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে সেই অর্থে তুমি সাকার উপাসকই হও, আর নিরাকার উপাসকই হও, মনে ইহা স্থির জানিও যে কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিতে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। সুতরাং কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনার উন্নতি পথে আপনি কণ্টক দিও না। ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। যোগী পতঞ্জল বলেন, প্রণবস্তস্য বাচকঃ। এই প্রণব আলোচনা দ্বারা সমস্ত বৃত্তি সকলকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে শিখ। মিছে ঝগড়া ঝাটিতে মাতিয়া নিজের কার্য্য হারাইও না।

হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পিতৃতত্ত্ব এবং দেবতা তত্ত্ব আদি আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে বিশেষ বিশেষ উপাসনা বা আরাধনা পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেবতাদের সম্পর্কে আসা যায়। সুতরাং

যাঁহারা আপনাদের উপাসনা পদ্ধতি লইযাই আড়ম্বর করিযা থাকেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাদের উপাসক হইযা পড়িযাছেন বলিতে হয। কিরূপ পূজাপদ্ধতি দ্বারা কিরূপ সূক্ষ্ম শক্তির সম্পর্কে আসা যায় হিন্দু শাস্ত্র সকলে তাহার বিশেষ আলোচনা করা আছে। এ সম্বন্ধে গোটাকত মোটামুটি বলি শুন। দেবাদি পূজার মূল সূত্র এই যে "না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" 'দেব ভাবাপন্ন না হইলে দেব পূজার অধিকারী হয না।' যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিবে সেইরূপ ভাবানুযাযী দেবতাদের সম্পর্কে আসিতে পারিবে। সূক্ষ্ম শক্তির আধার সকল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। পিতৃলোক, দেবলোক, ঋষিলোক। শ্রদ্ধা দ্বারা পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিতে হয, কর্ম্ম অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির চালনা দ্বারা দেবলোকের সম্পর্কে আসা যায় এবং জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা ঋষিলোকের সম্পর্কে উপনীত হওযা যায়। যে পূজা প্রেম প্রধান তাহা পিতৃ লোকের পূজা, যে পূজায় ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য তাহা দেব পূজা এবং যে পূজার জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য তাহা ঋষি পূজা। আর যে পূজার উদ্দেশ্য পিতৃ ঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ করা তাহাই ঈশ্বরোপাসনা। নিষ্কাম প্রেম চর্চ্চা দ্বারা পিতৃঋণ শোধ দিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ এবং আত্মজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা ঋষি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে পূজায় পিতৃ চক্র, দেব চক্র এবং ঋষি চক্র হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা। দেব ভাবাপন্ন জন দেব পূজার অধিকারী এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন জনই ঈশ্বরোপাসনা করিতে জানেন। ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা যদি জানিতে চাও তবে ঈশ্বর ভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবের চরিত্রে চিত্ত সংযম করিতে শিখ।

আমি তোমায় ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে দু কথায় কি বুঝাইব?

সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে তবে ঈশ্বর উপাসনা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবে।

ছা। আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন—ঈশ্বর স্থূল পদার্থে নাই, ঈশ্বর কোন পূজা পদ্ধতিতে নাই, এই সকল কথা আমার মনে লাগিতেছে না; কেন না সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই কথা আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। সামান্য স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন প্রহ্লাদ ইহা বুঝিয়াছিলেন।

শি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সকলের অর্থ বুঝা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন অর্থাৎ তিনি স্থূল পদার্থেও আছেন সূক্ষ্ম পদার্থেও আছেন এ কথাও ঠিক এবং তিনি স্থূল পদার্থেও নাই এবং সূক্ষ্ম পদার্থেও নাই একথাও ঠিক। তুমি আমি সাধারণ লোকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে যে ভাবে দেখি, স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থকে সে ভাবে দেখিলে ঈশ্বর তাহাতে নাই—কিন্তু যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধীয় ভেদ জ্ঞান নাই তিনিই সকল পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান, আর কিছুই দেখিতে পান না।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। যে এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম ঈশ্বর। কিন্তু যাহা জগতের এক দেশ ব্যাপী তাহা ঈশ্বর নহে। এই সম্মুখস্থিত স্থূল পদার্থটি তোমার সমক্ষে রহিয়াছে—এই পদার্থ-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান এই যে ইহা জগতের এক দেশ ব্যাপী সুতরাং তোমার কাছে ঐ স্থূল পদার্থটিতে ঈশ্বর নাই। কিন্তু আত্ম-জ্ঞানী পুরুষের একখানি পুস্তক দেখিলে ও অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, একটি সুন্দর পুরুষ দেখিলেও অন্তরে সেই ভাব উদয় হয়, কিছুতেই অন্তরের ভাবের পরিবর্তন হয় না। সেই জন্যই তিনি সকল পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান। দেখ কেবল কথা লইয়া কথনও তর্ক

করিও না। কথার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিযা চেষ্টা করিবে। সে দিন একজন প্রতিমা পূজার পক্ষ সমর্থন জন্য এইরূপ তর্ক করিতে-ছিলেন। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, ঈশ্বর নদীতে আছেন, পর্ব্বতে আছেন, কাষ্ঠে আছেন এবং সেই প্রতিমাতেও আছেন। সুতরাং প্রতিমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে বাধা কি? কিন্তু এ তর্কের গোড়ায় গলদ কোথায় দেখ। প্রতিমাতে যে ঈশ্বর আছেন, সে কি তুমি আমি বুঝিতে পারি। প্রতিমা দেখিলে মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা প্রতিমা সম্বন্ধীয় ভাব; তাহাকেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বলিলে ঘোরতর ভ্রম হইল। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাতে অন্তরে যে সচ্চিদানন্দ ভাব উপস্থিত হয়, প্রতিমা দর্শনেও যিনি সেই ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই বলিতে পারেন ঈশ্বর এই প্রতিমাতেও আছেন।

তোমার আমার ন্যায় লোককে এখন বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ কোন বিশেষ একদেশ ব্যাপী নহেন। যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যাহাদের এখন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝ) সম্পর্কে আসিযা সকল সময়েই সেই এক সচ্চিদানন্দ ভাব বই অন্য কোন ভাব অন্তরে আসিবে না, তখনই তুমি গাছেও ঈশ্বর দেখিতেপাইবে এবং মানুষেও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে।

দেব ভাবাপন্ন না হইলে পূজা দেবলোকে পৌঁছায় না," সেইরূপ নিজে ঈশ্বর ভাবাপন্ন না হইলে ঈশ্বর পূজা হয় না। সচ্চিদানন্দ ভাব ঈশ্বর ভাব। ঈশ্বরোপাসনা শিখিতে গেলে অন্তরে এই ভাব আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহার অন্তরে এই ভাব উপস্থিত হয় নাই অথচ নিজের উপাসনা পদ্ধতির গোঁড়ামী করিয়া থাকেন তিনি তাঁহার সেই ছোট খাট উপাসনা পদ্ধতির শিষ্টতায মুগ্ধ হইয়া

আপনাহারা হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরে নাই, সেই উপাসনা পদ্ধতিতে তাঁহার ভক্তি দাঁড়াইয়াছে। অতএব সতত সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে শিখিবে। অন্তরে এইরূপ গোঁড়ামী জন্মাইয়া দেওয়া দুষ্ট দেবতার কার্য্য। দেবতারা ঈশ্বর উপাসকের সাধনার পথে কেবল বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টাকরে ইহা হিন্দুরা বেশ বুঝিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে দেবতাদের এইরূপ দুষ্টামি বেশ বর্ণনা করা আছে। সাবাধান দেবতাদের চক্রে পড়িয়া আপনাহারা হইও না।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মন যত দিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের থাকিবে, তত-দিন পূজা পদ্ধতি কখনই এক রকম হইবার সম্ভাবনা নয়। যিনি যে রকম ভাল বুঝেন, তিনি সেই রকমে উপাসনা করুন, মিছে ঝগড়া কর্ত্তব্য নহে। এই সব ঝগড়া দেখিয়া আমার অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ের গল্পটি মনে পড়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলেই কানা অথচ আপনার গোঁ ধরিয়া ঝগড়াটি না করিলে চলে না। আগে ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর তাহার পর না হয় ঝগড়া করিও। যে পদ্ধতি অবলম্বনে মনে সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা পদ্ধতি। আজ-কালকার সমাজে যে সাকার উপাসনা দেখিতে পাই কেবল মাত্র সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনেই কেহ কি সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাইয়াছেন? আজ-কালকার নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই কি সেই সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাওয়া যায়? তাহা যদি হইত তবে ভারতে আজ মুক্ত পুরুষের ছড়াছড়ি যাইত। 'তবে কেন মিছে সামান্য পূজা পদ্ধতি লইয়া গোলমাল করা ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঘরে অন্ন নাই কিন্তু কি রূপে অন্ন খাইতে হইবে হাতে কিম্বা কাঁটা চামচে—এই লইয়া দুই ভাইয়ে ঝগড়া করাটা কি ভাল দেখায়? আগে অন্নের চেষ্টা কর; আগে

ঈশ্বর কি দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তাহাই বুঝিবার চেষ্টা কর। বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞান চর্চ্চা কর তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

ছা। আপনার কথা বার্ত্তায় যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে আপনি জ্ঞান মার্গেরই বেশী পক্ষপাতী।

শি। আমি ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যাহা বুঝি তাহা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। প্রথম নামে ভক্তি চাই, সেই ভক্তির ফলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অন্তরে বুঝিবার জন্য আগ্রহতা জন্মান চাই; জ্ঞান এবং কর্ম্মের সাহায্যে বিশ্বরূপ, নিরাকার ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণা করিতে পারিলে তখন সেই ঈশ্বরের স্বরূপে ভক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক আমি কে ইহা বুঝিবার জন্য বিজ্ঞান চর্চ্চা চাই, তাহার পর আমার অহং জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান যোগ করিতে পারাই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরে ভক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইবার একটি হইতেই অপরটি জন্মিয়া থাকে। কর্ম্মমার্গ অবলম্বনে জ্ঞানের চর্চ্চা, জ্ঞানের সাহায্যে ভক্তির চর্চ্চা, ভক্তির সাহায্যে আবার কর্ম্মের চর্চ্চা এইরূপ করিলে প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা সাধারণ লোকে প্রেম ও ভক্তি কথার যে অর্থ বুঝি, ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থতে যদি তুমি বুঝ, তবে তুমি ঠিক বুঝ নাই। ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থতে আমি যাহা বুঝি, তাহা তোমাকে আর এক দিন বুঝাইব।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরোপাসনা।

ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সমস্ত কথা আর একবার বলি শুন।

১ম। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা।

২য়। মুখে অনেকেই অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিতে জানেন না। মুখের কথায় বোঝা আর অন্তরে অনুভব শক্তিদ্বারা বোঝা, এই উভয়ে অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিবার নামই ঈশ্বরোপাসনা।

৩য়। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সাধারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সেই অজ্ঞতা দূর না হইলে মনুষ্য প্রকৃত পক্ষে সুখী হইতে পারে না, এই বিশ্বাসটি অন্তরে দৃঢ়ভূত হইলে আমাদের মনে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার জন্য একটি পিপাসা উপস্থিত হয়। এই জ্ঞান-পিপাসা ঈশ্বরোপাসনার প্রথম অংশ।

৪র্থ। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে পথ অবলম্বনে সেই অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া যায় সেই পথ অবলম্বনেই ঈশ্বরোপাসনা।

৫ম। যেমন অপরিষ্কার দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়িতে পায় না, সেইরূপ সমল চিত্তে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না। চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল না হইলে ঈশ্বর কি তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়

না। সেই জন্য যে পথ অবলম্বনে চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল হয় সেই পথ অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

৬ষ্ঠ। যদি চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন জন্য কেহ কোন দেব দেবী রূপ সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্য অবলম্বন প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তবে সেই দেব দেবীর আরাধনাকেও ঈশ্বরোপাসনা বলিতে হইবে।

৭ম। চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে গেলে মনুষ্যের উন্নত দশার চরম আদর্শ স্বরূপ কোন পুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা, সেই আদর্শকে সদাই অন্তরের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া সেই আদর্শানুযায়ী উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত।

৮ম। আমাদের মন বড অস্থির। কোন আদর্শ চরিত্র মনো-মধ্যে সদা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা চাই। উন্নত পুরুষের সহিত মনের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য দৃঢ়া ভক্তির প্রয়োজন। এই জন্য ভক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

৯। অনেকে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল ঈশ্বর কথাটির উপর ভক্তি স্থাপন করিয়া সেই ভক্তি বৃত্তির চালনা করাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক তাঁহার কর্ম্মানুযায়ী কোন দেব শক্তির সাহায্য পাইলেই সেই দেব শক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া দুস্তর ভ্রমে পতিত হইয়া পড়েন। সুতরাং যাহাতে এইরূপ ভ্রমে পড়িতে না হয়, সেই জন্য ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা উচিত।

১০। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। জগতে যত প্রকার শক্তির

ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত শক্তিই কি স্থূল কি সূক্ষ্ম সকলেই—সেই এক শক্তির বিকার মাত্র। সমগ্র জগতের সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি। এই শক্তিকে হিন্দুশাস্ত্রে বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন।

১১। যিনি আত্মশক্তি এই সমষ্টি শক্তির সহিত একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বর কি তাহা বুঝিয়াছেন। এই সমগ্র জগৎকে তিনি অখণ্ড ও অদ্বিতীয় বলিয়া বুঝিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের সমষ্টিভাব হইতে তিনি আপনাকে পৃথক বলিয়া আর বুঝেন না। এইরূপ তিনি।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

তিনিই উন্নত দশায় চরম আদর্শ পুরুষ এবং তিনিই ঈশ্বর।

১২। এই সমগ্র জগতের সমষ্টি ভাবই ঈশ্বর, এইটি স্পষ্ট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল বিশেষণ শব্দগুলির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৩। মনুষ্যের কর্ম্মের ফলদাতা শক্তির নাম দেব দেবী। দেব দেবীগণ অনিত্য সুখের প্রলোভনে মানুষকে দক্ষ করিয়া রাখে এবং সেই জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া আছে। দেব দেবীগণের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যত দিন সামান্য অনিত্য সুখের কামনা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল থাকিবে ততদিন তিনি নিত্যসুখদাতা ঈশ্বর যে কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। সেই জন্য যিনি প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা করিতে চান তাঁহাকে প্রথমতঃ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। যে পাদরি মহাশয় সপ্তাহের সমস্ত ঘণ্টাই অনিত্য ধন মানের সুখ কামনায় মুগ্ধ হইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন

এবং এক ঘণ্টা গির্জ্জায় গিয়া চোক বুজিয়া নিরাকার ঈশ্বর ভাবিতেছেন, তিনি ঈশ্বর কি তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সকাম কর্ম্মই দেব দেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা।

১৪। উপাসনার পথে চলিতে চলিতে শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও মুমুক্ষুত্ব এই ছয়টি গুণ যখন ক্রমে ক্রমে উপাসনার অন্তরে বিকশিত হইবে, তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পথে চলিতেছেন বুঝিতে হইবে। এবং যে উপাসনা দ্বারা অন্তরে এই সকল গুণের ক্রমবিকাশ না হয় তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে। ঈশ্বরপাসনা সম্বন্ধে আজ যাহা সংক্ষেপে বলিলাম এবং পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের সার কথা। তুমি এইবারে বেদান্ত সম্বন্ধে বেদান্ত সার গ্রন্থখানি এবং ভগবদ্গীতা খানি পাঠ করিও তাহা হইলেই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর কি গভীর মনোহর ভাব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর প্রীতি।

শিক্ষক। দেখ, ঈশ্বর প্রীতি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ প্রীতি কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি সেই ভালবাসার সুর সকল স্থলেই এক রকম নহে। পুত্র পিতাকে যে ভাবে ভাল বাসে, স্ত্রী স্বামীকে যে ভাবে ভালবাসে, ভাই ভগিনিকে যে ভাবে ভালবাসে এই সকল ভালবাসাব মধ্যে পবস্পব প্রভেদ আছে ইহা সকলেই বুঝিতে পাবেন। আবাব পাবিবারিক প্রেমের সহিত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ তুলনা কবিযা দেখ একটী প্রভেদ দেখিতে পাইবে। ভালবাসার সুর যখন সকল স্থলেই এক রকমের নয় তখন ঈশ্বর প্রেমের সুব কিরূপ তাহা প্রথমে সকলেবই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ভালবাসার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই সত্যটি বুঝিতে পারিবে। ভালবাসার যেরূপ সুরে আমার নিজের হৃদয় তন্ত্রী বাঁধা আছে আর একজনের হৃদয় তন্ত্রী যদি সেইরূপ সুরে বাঁধা থাকে তবেই পরস্পরে পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র বলে দেবভাপন্ন না হইলে দেবতা পূজা দ্বারা দেবতার সহিত মিলন সম্ভবে না। (না দেবো দেবমর্চ্চযেৎ—বশিষ্ঠ) অসুর ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে অসুরগণ আকৃষ্ট হন, পিশাচ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে পিশাচের সম্বন্ধেই থাকিতে হয়। যিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতে চান তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইতে হইবে ঈশ্বর প্রীতির সুরে আত্মাকে

বাঁধিতে হইবে তবেই ঈশ্বরের সহিত প্রীতি সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারিবেন।

আমরা সাধারণ লোকে ভালবাসার যে সকল সুরের সহিত পরিচিত ঈশ্বর প্রীতির সুর তাহাদের অপেক্ষা যে কত বেশী গভীর তাহা তুমি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ অন্তরে যে সুরের অনুরাগ প্রবল,ঈশ্বর উপাসনা করিতে গেলে সে সুর বদলাইতে হইবে। সচরাচর অন্তরে যে অনুরাগ বৃত্তি প্রকাশ পায় তাহাই প্রখর করিতে পারিলেই তাহার সুর বদলায় না। ঐশ্বরিক ভাব কি তাহা বুঝিয়া সেই রকম ভাবে হৃদয় যন্ত্র বাঁধিতে হইবে তবেই নিরাকার ঈশ্বরের সম্বন্ধে আসিতে পারিবে।

মনুষ্য এই সংসার চক্রে পড়িয়া পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ এই সকল সঙ্কীর্ণতার অনুরাগে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরানু-রাগের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি অন্য সকল তুচ্ছ প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন জানিও। সর্ব্বত্র সমদর্শীতা এই ভালবাসা আস্বাদনের ফল। আমার পুত্রকে আমার পিতাকে আমার মাতাকে অন্য লোকের অপেক্ষা বেশী ভালবাসি এ জ্ঞান যত দিন থাকিবে ততদিন আমার জানা উচিত যে আমি ঈশ্বর প্রীতির আস্বাদন পাই নাই। আমার দেশকে আমার ধর্ম্মকে অন্য দেশ অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা, আমার পূজা পদ্ধতিকে অন্যের পূজা পদ্ধতি অপেক্ষা যতদিন বেশী ভাল বাসিব ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি অন্তরে জন্মায় নাই ইহা নিশ্চয় জানিও। আবার ইহাও জানিও যে যতদিন আমার স্ত্রী পুত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষা ঈশ্বরকে বেশী ভাল বাসি মনে করিব ততদিন আমার সমত্ব জ্ঞান জন্মায় নাই ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই।

ঈশ্বর প্রাপ্তি যে বড় সুগভীর ইহা স্মরণ রাখিও। বাস্তবিক ঈশ্বর

প্রীতি অতি বিরল পদার্থ। অনেক কষ্টে অনেক যত্নে মনের স্বাভাবিক প্রেমভাবের সুর ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া তবে ঈশ্বর ভক্তি ভাব অন্তরে উদিত করিতে হয়। ঈশ্বর প্রীতি যে কি পদার্থ তাহা শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের ন্যায় লোকেই বুঝিতে পারেন, তুমি আমি তাহার কি বুঝিব বল।

যদি প্রীতি মার্গ অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাও তবে প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইতে শিখ। প্রেমের প্রখরতা জন্মিলেই সঙ্কীর্ণতা ঘুচে না এটি যেন বেশ স্মরণ থাকে। প্রেম প্রধান উপাসনায় যদি প্রেমের সঙ্কীর্ণতা যেমন তেমনি থাকে, যাহাদের ভালবাসি তাহাদের প্রতি ভালবাসাটাই প্রখর হইতে থাকে তবে উপাসনার কোন ফল ফলে নাই জানিও। প্রত্যহ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিও তোমার ভালবাসা-ভাব উন্নত হইতেছে কি না। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নিজের ভালবাসা বৃত্তি সঙ্কীর্ণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর, যিনি ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা করিতে চান না তিনি উন্নত হইতে সক্ষম হন না। নিজের ভক্তি বৃত্তি একটু তীক্ষ্ণ দেখিয়াই যিনি আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া বুঝিয়া লন তিনি নিজের উন্নতির পথে কাঁটা দেন।

মনুষ্যের অন্তরের ভাব স্বপ্নাবস্থায় যেমন প্রকাশ পায় জাগ্রতবস্থায় সামাজিক নিয়মের বশে থাকা নিবন্ধন সেরূপ প্রকাশ পায় না। সুতরাং আপনাকে পরীক্ষা করিবার সময় নিজের স্বপ্নাবস্থার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবে। যে পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে প্রেম বৃত্তির সঙ্কীর্ণতা ঘুচে না তাহা কখনই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

বেদান্ত শাস্ত্রে মনুষ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মনুষ্য, অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই কয়েকটি পদার্থের সমষ্টি।

মনুষ্যকে তাঁহারা যেমন এই পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন সেইরূপ মনুষ্যের অনুরাগ বৃত্তিও পাঁচ ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন স্থূল শরীরানুরাগ, প্রাণানুরাগ, মনের অনুরাগ, বুদ্ধিব অনুরাগ, আনন্দানুরাগ বা ঈশ্বরানুরাগ। এখন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাল বাসা সম্বন্ধীয় ভাগগুলি কিরূপ তাহা মোটামুটি বুঝাই শুন।

পাতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের সূত্রে অনুরাগ কথাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "সুখানুশয়ী রাগঃ।" অর্থাৎ যাহা পাইলে আমাদের সুখ হয় আমরা তাহাকেই ভাল বাসিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই সুখ খুজিয়া বেড়ান এবং যিনি যে জাতীয় সুখ খুঁজিতে সদাই ব্যস্ত তাঁহার অনুরাগ বৃত্তিকেও সেই জাতীয় অনুবাগ বলা যাইতে পারে।

যিনি স্থূল শরীরের সুখে মুগ্ধ, তাঁহার ভালবাসা স্থূল জাতীয়। যিনি গায়েব জোব বাড়াইবার জন্যই ব্যস্ত, দিন রাত গাযের জোরের ন্যায় আহারের তদ্বির করিতেছেন, ব্যায়াম কবিতেছেন, আব কোনও বিষযে লক্ষ্য নাই তাঁহাব ভালবাসা স্থূল শরীবের ভালবাসা।

প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এবং হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া প্রাণময় কোষ।

ছা। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু কি কি?

শি। বেদান্ত মতে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যাযান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল, অপানের স্থান পায়ুদেশ, সমানের স্থান নাভি দেশ, উদানের স্থান কণ্ঠ এবং ব্যায়ানের স্থান সর্ব্বশরীর ব্যাপী। প্রাণ পূর্ব্ব-গমন শীল, অপানের গতি অধোদিকে, উদানের উর্দ্ধদিকে, সমান বায়ুর দ্বারা সমীকবণ হয় এবং ব্যাযান বায়ু সর্ব্বদেহে গমনক্ষম।

ছা। প্রাণ বায়ু প্রভৃতি কথা গুলিতে কি ভাব ঠিক বুঝায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শি। বাতি ইতি বায়ুঃ। যাহা বহে তাহার নাম বায়ু, আজ কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ animal electricity ও nerve aura কথায় যেরূপ পদার্থ বুঝেন আমাদের শরীরস্থ বায়ু কথায় অনেকটা সেই রকম অর্থ বুঝায়। শরীরস্থ বায়ুর গতি এই কথাটি আর ইংরাজী nerve current এই কথাটির অর্থ একইরূপ। যেরূপ স্নায়বীয় ক্রিয়া হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য হইতেছে তাহা প্রাণ বায়ুর কার্য্য। যেরূপ স্নায়বীয় ক্রিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভুক্ত পদার্থ সকল রক্তে পরিণত হয় তাহা সমান বায়ুর কার্য্য। যে জন্য শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে তাহা ব্যায়ান বায়ুর কার্য্য এবং বাক্য উচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্যের চেষ্টা উদান বায়ু হইতে জন্মে। হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা বলেন যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু একই পদার্থ তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্মে চেষ্টা জন্মায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে এবং এই এক পদার্থ সাধারণতঃ প্রাণ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাণ পদার্থটি কোন জাতীয় তাহা যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের কথানুযায়ী না বুঝাইলে বুঝিতে না পার তবে আমি সেই রকমে প্রাণ কথার অর্থটি বুঝাই শুন।

লোহা একটি স্থূল জড় পদার্থ, কিন্তু সেই লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিলে উহা লোহা হইতে ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। রিসনব্যাক নামে একজন পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে চুম্বকে এমন এক প্রকার নূতন রকমের পদার্থ আছে যাহা লোহায় নাই। এই নূতন পদার্থটি বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। যাহাদের অনুভূতি শক্তি (sensitiveness) একটু সূক্ষ্ম তাঁহারা চুম্বকের দুই প্রান্ত হইতে দীপশিখার ন্যায় একটি

আলোক বহির্গত হইতে দেখিতে পান; যদি ফুঁ দেওয়া যায় তবে দীপশিখার ন্যায় এই আলোক শিখাও চঞ্চল হইতে থাকে। এইরূপ আলোক উদ্ভিদ শরীর হইতে এবং জীব শরীর উদ্ভিদ বহির্গত হইয়া থাকে। রিসনব্যাক্ এই উজ্জ্বল পদার্থের অড এই নাম দিয়াছেন। আজ কালকার সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির গবেষণায় এই অড্ নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের প্রাণ পদার্থ আর রিসনব্যাকের অড পদার্থ বোধ হয় একই। রিসনব্যাক বলেন যে এই অড্ পদার্থই উদ্ভিদ ও জীবের জীবনী শক্তির কারণ এবং আমাদের প্রাণ কথাতেও ঐ অর্থ বুঝায়। কোন কোন লোক এই পদার্থকে স্নায়বীয় আভা (nerve aura) নাম দেন!

হস্ত,পদ, পায়ু উপস্থ ও বাগেন্দ্রিয় ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা প্রাণ হইতেই জন্মে। যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে এই প্রাণ পদার্থের আধিক্য উপস্থিত হয় সেই ইন্দ্রিয় তখন উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা জন্মে। এবং সেই ইন্দ্রিয় সঞ্চালিত হইলে, উক্ত প্রাণ পদার্থ কখন বা স্থূলাকারে পরিণত হইয়া কখন বা সূক্ষ্মাকারেই, কর্ম্মেন্দ্রিয় পথ দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে কর্ম্ম দ্বারা যে সুখ লাভ হয় তাহাই প্রাণময় কোষের সুখ (pleasures of organic sensations)। উচ্চহাস্য, অনর্থক বাক্যব্যয়, মাদক দ্রব্য সেবনে প্রাণের উত্তেজনা, ইত্যাদি হইতে যে সুখ লাভ হয় তাহা প্রাণময় কোষের সুখের উদাহরণ। যিনি এই জাতীয় সুখান্বেষণেই রত তাঁহার অনুরাগ প্রাণের অনুরাগ।

এইবারে মনোময় কোষের স্ফুরণে কিরূপ সুখেচ্ছা জন্মে তাহা বলি শুন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই লইয়া মনোময় কোষ।

দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমাদের সংকল্প ও বিকল্প যাহা হইতে জন্মে তাহার নাম মন। কি করিব কি না করিব এই বিষয়ে একটা মতলব ঠিক করার নাম সংকল্প, বিকল্প কথার অর্থ পাতঞ্জলি বলেন যে "শব্দার্থ জ্ঞানানু-পাতো বস্তুশূন্য বিকল্প" অর্থাৎ বস্তু নাই অথচ শব্দের অর্থ জ্ঞানানুসারে চিত্তের যে অবস্থা জন্মে তাহার নাম বিকল্প। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে আমরা যাহাকে কল্পনা বলি (imagination) দর্শনশাস্ত্রে তাহাকেই বিকল্প বলে।

মনোময় কোষের স্ফুরণে যে সুখেচ্ছা জন্মে তাহা তিন প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয় সুখ, সংকল্প সুখ এবং বিকল্প বা কল্পনার সুখ। রূপ রসাদি বিষয় হইতে যে সুখ জন্মে তাহার নাম ইন্দ্রিয় সুখ, সংকল্পানুযায়ী কার্য্য সমাধা করিতে পারিলে যে সুখ তাহার নাম সংকল্প সুখ, আর মনে মনে একটি সৌন্দর্য্য গড়ার যে সুখ তাহা কল্পনার সুখ। যে অনুরাগ যে জাতীয় সুখানুগামী তাহাকে সেই জাতীয় অনুরাগ বলিতে পারি। ছেলেটি দেখিতে ভাল বলিয়া তাহাকে যে ভাল বাসি তাহা ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা, কিন্তু একটি ছেলেকে আমি এই ধরণে শিক্ষা দিতে চাই, এই রকমে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাই—এইরূপ সংকল্প প্রথমে স্থির করিয়া যদি ছেলেটিকে মনের মতন করিতে পারি তবে তাহার উপর যে ভালবাসা জন্মে তাহা সংকল্পাত্মক ভালবাসা আর কবির কল্পনাত্মক অনুরাগ বলিতে পারি। মনোময় কোষের স্ফুরণের পর বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণ হইয়া থাকে, বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া বিজ্ঞানময় কোষ অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির স্ফুরণে নিশ্চয় কি, সত্য কি এই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়, একটী জ্ঞানলালসা জন্মে, তখন অন্য

কোন প্রকার নিম্ন দরের সুখে বড় আস্থা থাকে না, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করিবার জন্য উৎসুক থাকে না, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান করাই বুদ্ধির কাজ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখাইযা দেয় এবং বুদ্ধি দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে একতা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই, এবং এইরূপে ব্যাপৃত হওযার নামই বিজ্ঞান চর্চ্চা, বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণে বিজ্ঞান চর্চ্চাতেই সুখ এবং যাহা এই বিজ্ঞান চর্চ্চার অনুকূল আমরা তখন তাহাদেরই ভাল বাসিয়া থাকি। এই বিজ্ঞানময় কোষের অনুরাগও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণের পর আনন্দময় কোষের বিকাশ হইযা থাকে, তখন চিত্তের যে অবস্থা জন্মে তাহা সদানন্দ অবস্থা, এই আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলে।

বুদ্ধি ও আত্মা লইয়া আনন্দময় কোষ। যে সূত্রে স্থূলদেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি একত্রে গাঁথা আছে, যে শক্তি নিবন্ধন উহাদের মধ্যে পরস্পর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়া রহিয়াছে তাহারই নাম আত্মা। মনুষ্যের আনন্দময়কোষের স্ফুরণে বুদ্ধি আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানে উৎসুক হয়। আমি কি, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, আমার অন্তরের সহিত বহির্জগতের কি সম্বন্ধ—এই সকল বিষয়ের নিশ্চিত সত্য জানিবার জন্য আগ্রহতা জন্মে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইলে অন্য সমস্ত পিপাসা দূরে চলিয়া যায়, সজ্জনেতে সমান অনুরাগ উপস্থিত হয়। তাঁহার সহিত চেতন অচেতন পদার্থ সকলের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ক জ্ঞান যেখানে পান সেই খানেই তাঁহার অনুরাগ জন্মে অন্য কোনরূপ অনুরাগে তিনি মুগ্ধ হন না,

এইরূপ জ্ঞান চর্চা করিতে করিতে ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সহিত সকল পদার্থেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং সকল পদার্থ হইতেই তিনি তাঁহার আনন্দদায়ক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবারক অমৃত সকল পদার্থেই দেখিতে পান, যদি কেহ তাঁহার শত্রুতাচরণ করে তবে শত্রুর মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া সেখান হইতেও জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তাঁহার অভিলাষিত সুখ প্রদানে সর্ব্বভূতই অনুকূলাচরণ করে সেই জন্য সকল পদার্থকেই তিনি সমান ভাল বাসেন। তাঁহার ভালবাসার ইতর বিশেষ থাকে না এইরূপ সমদর্শীতাকেই ঈশ্বরানুরাগ বলা যায়। এইরূপ আনন্দময় কোষের স্ফুরণ জনিত আনন্দ নাকি অনির্ব্বচনীয়।

পবিত্রতাময় শান্তিসুখময় এই আনন্দ যে কিরূপ তাহার আস্বাদন পাইবার জন্য যত্ন করি এস, এই আনন্দের নাম শুনিয়া মন মাঝে মাঝে উহার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু চঞ্চল মন অন্য অনুরাগে আবার ফিরিয়া আসে, এস দুজনে মিলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি, আমি যদি হতাস হইয়া ফিরিতে চাই তবে তুমি আমাকে উৎসাহ দিবে আর তুমি যখন হতাশ হইবে আমি তোমাকে সাহায্য করিব। যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন তাহার কণামাত্র পাইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। এই আনন্দময় কোষের শান্তিময় ভাব যতদূর কল্পনা করিতে পারা যায়, ঈশ্বর কথাটির সহিত সেই ভাব সংশ্লিষ্ট করিতে শিখ, যখন সঙ্কীর্ণ অনুরাগের প্রাধান্য অন্তরে জন্মিবে তখন ঈশ্বর বা ঈশ্বর কে ইহা ভাবিতে ভাবিতে যেন বিষয়ানুরাগ দূরে চলিয়া যায়, আর পবিত্র সমদর্শীতা ভাব বুদ্ধির ভাব অন্তরে উদয় হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর মন্ত্র সাধনা।

ছা। আপনি অনুরাগ বুদ্ধিকে যে কয় প্রকার ভাগ করিলেন তাহা আমি বড ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না।

শি। ভালবাসার দুটি অঙ্গ একটি বিরহ ও অন্যটি মিলন, বিরহের ভিতরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, মিলনে সেই চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়। প্রীতিতত্ব আলোচনা করিবার জন্য নিজের ভিতরের চাঞ্চল্য কথন কিরূপ-মিলনে শান্তিভাব পায় তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবে।

যখন দেখিবে যে শরীরে কোন রোগ নাই অথচ অন্তর চঞ্চল হইতেছে এবং কোন না কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনানায সেই চাঞ্চল্য নিবারিত হইল তখন উহাকে প্রাণময কোষের চাঞ্চল্য বুঝিবে। কিন্তু যখন তাহাতেও চাঞ্চল্য থামে না কিন্তু রূপ দর্শন বা সঙ্গীতাদিতে ব্যাপৃত থাকায সে চাঞ্চল্য মিটিযা যায তখন উহাকে ইন্দ্রিযের চাঞ্চল্য বলিযা বুঝিতে হইবে, যখন তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা মিটে না, নিজের সংকল্পানুযাযী অপর কাহাকেও চালাইতে ইচ্ছা জন্মে—এবং তাহা না করিতে পারিলে বিরক্তি জন্মে—তখন মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যখন দাস দাসী পুত্র কলত্র বন্ধু সকলেই তোমার সংকল্পানুযায়ী চলিতেছে অথচ নিজের কল্পনায নিজে আর তৃপ্ত হইতেছে না।—একটা জ্ঞান পিপাসা ভিতরে উদয় হইযাছে, কাহার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে পার, সেই অন্বেষণে ব্যস্ত হইযাছ তখন বুদ্ধির অনুরাগ উদয হইতেছে বুঝিতে হইবে। শেষে সেই অনুরাগ উৎকর্ষতা পাইলে ঈশ্বর প্রীতি জন্মে। বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিলে কিরূপ চাঞ্চল্যকে বুদ্ধির চাঞ্চল্য বলে তাহা বুঝা যায।

ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকের ভালবাসার চক্র হইতে উপরের চক্রে উঠিতে হয, যিনি মাঝের কোন চক্রে বদ্ধ হইযা ঘুরিতে থাকেন তিনি ঈশ্বর প্রীতির আস্বাদ পাইতে সক্ষম হইবেন না। যদি ঈশ্বর

প্রীতি কি তাহা শিখিতে চাও তবে প্রেমের যখন যে চক্রে পতিত হইবে তাহাতে আসক্ত হইও না, নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। কিরূপে সেই চক্র হইতে উদ্ধার হইতে পার সতত তাহারই অন্বেষণ কর. সমত্বভাব ভিন্ন অন্য সকল প্রকার প্রেমে বৈরাগ্যই ঈশ্বর প্রীতির লক্ষণ। ঈশ্বর প্রীতি ভিন্ন আর সকল প্রকার প্রীতিই সাকার, সমত্ব ভাব ভিন্ন অন্য প্রেম চাঞ্চল্য উদ্দীপিত করিয়া যে উপাসনা করা যায় তাহা নিরাকার ঈশ্বরের কাছে পঁহুছায় না।

ছা। প্রীতি আবার সাকার নিরাকার কি ?

শি। যাহার রকমভেদ আছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে, আর যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। আ=সম্যক ক্রিয়তে অভিব্যঞ্জতে অনেন ইতি আকার। যাহা দ্বারা একটি পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায় তাহাই আকার। যেখানে পৃথকত্ব আছে তাহারই আকার আছে। ইংরাজী ফরম (Form) কথাটির আর আকার কথাটির অর্থ একই রূপ। এক জনের উপর তোমার যে আকারের ভালবাসা, আর একজনের উপর সে আকারের ভালবাসা নাই, এইরূপ কথা যখন প্রয়োগ করি তখন এই অর্থ বুঝি যে তোমার ভালবাসার রকম ভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির রকম ভেদ নাই, ঈশ্বর প্রীতি একাকার, যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। দেখ বুদ্ধির কাজ বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান কর। প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন আকার সকল আলোচনা করিয়া তাহাদের ভিতর যিনি একাকার দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বর প্রীতি কিরূপ বুঝিতে পারেন।

এই সকল বুঝিয়া ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হইতে শিখ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ছাত্র। আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ঐ দুইটি কথার অর্থ কি একই রকম?

শিক্ষক। আজ কাল ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুই কথাতে অনেকে একইরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এই দুটি কথায় বড় প্রভেদ আছে, এবং এই প্রভেদটি সকলের জানা আবশ্যক। এই প্রভেদটি বুঝিলে সাংখ্যকার কপিলদেবকে আর কেহ নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বেদান্তশাস্ত্রের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথাটির 'একং' কথাটি যে অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং আনন্দ স্বরূপ যে পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নিত্য পদার্থ নাই তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পদার্থটি কি ইহাই অন্বেষণ করা সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জগতে নিত্য পদার্থ এক ব্যতীত আর দুই নাই ইহাই বেদান্তের মত এবং নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম। সাংখ্যকার যাঁহাকে পুরুষ বলেন তিনিই ব্রহ্ম। ইনি নির্গুণ, সত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন কিন্তু ইহাঁর আভা প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সকলের মতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, আর প্রকৃতি অনিত্য পদার্থ, কেন না কালের বশে প্রকৃতির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের কখনও কোন পরিণাম নাই। আমি তোমাকে

বিশ্বের সমষ্টি শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিযাছি সেই সমষ্টি শক্তিই ব্রহ্ম। এইবারে ঈশ্বর কথাটিতে দার্শনিকগণ কি অর্থ করেন তাহা বলি শুন। যোগী পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের নামই সেশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র, তিনি ঈশ্বর কথাটির এইরূপ অর্থ করেন।

ক্লেশ কর্ম্মবিপাকশযৈবপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

স পূর্ব্বষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ॥

প্রণবস্তস্য বাচকঃ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয কর্ত্তৃক যিনি পরামৃষ্ট হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

তিনি জগতের আদিগুরু, কাল কর্ত্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব মন্ত্র সেই ঈশ্বরেব বাচক।

এক্ষণে দেখ পাতঞ্জলির ঈশ্বর কথায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝায় না। যিনি অজ্ঞান জীবগণের গুরু স্বরূপ, যিনি জীবেব মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন সেই জগৎ গুরুব নাম ঈশ্বব। হিন্দুদর্শনকারগণ বলেন যে অজ্ঞান হইতেই জীবের সৃষ্টি হয এবং এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয, যাঁহার আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর হয সেই সূর্য্যস্বরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

সাংখ্যকার কপিলদেবের সাংখ্যক শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে, কিন্তু কেন যে তাঁহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পাতঞ্জলি ঈশ্বর কথার যেরূপ অর্থ করিযাছেন, সাংখ্যকার ও ঈশ্বর কথার সেইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলেন যে সকল পুরুষ অজ্ঞানমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে ভিন্ন পুরুষ ছিলেন কিন্তু মুক্ত হইযা যাঁহারা একাত্মা

হইযাছেন, (তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাকে বলাই যুক্তি-যুক্ত হয়) ঈশ্বর নাম দেওয়া যায়। ইনি মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত সুতরাং ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয় কর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট, সুতরাং পাতঞ্জলি যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন কপিলদেব ঈশ্বর কথাতে সেই অর্থই বুঝিতেন তথাপি তাঁহার শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য কেন বলা হইয়াছে তাহা বলি শুন।

পাতঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন-প্রণালী দেখাইযা দিযাছেন ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একটি অঙ্গ। কিন্তু কপিলদেব এই কথা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য প্রযোজনীয় নহে। কপিলদেব বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ-গণের আভা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য মোক্ষের পথ কি তাহা বুঝিতে পারে, চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলে ঈশ্বরের আভা তাহাতে পতিত হইবেই হইবে, সুতরাং যে কোন উপাযে হউক চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই মুক্তির পথ দেখিতে পাওয়া যায ; ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত যে অন্য উপায়ে চিত্ত নির্ম্মল হয না একথা তিনি বলেন না, যোগী পাতঞ্জলি ও তাহা বলেন না বটে, তবে পাতঞ্জলির সাধন প্রণালীতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ প্রণবার্থ চিন্তা এবং প্রণব জপ একটি প্রধান অঙ্গ কপিলের মতানুযাযী ঈশ্বর প্রণিধানের বেশী দরকার নাই। এই জন্যই কপিলের শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত পক্ষে আসল কথায় সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিযাছেন।

ঈশ্বর অর্থে জগৎ গুরু, আদি গুরু। যখন দেখিবে যে মোক্ষ লাভের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে তখন জানিও যে তোমার চিত্তে ঈশ্বরের আভা পড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে সাধক শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধান এই ষট্‌গুণে ভূষিত হইলে তবে তাঁহার মুমুক্ষুত্ব জন্মে। যাঁহার এই মুমুক্ষুত্ব জন্মে নাই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী নহেন।

যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় তাহার নাম যোগ। এই যোগ আবার প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক অব্যক্তের উপাসনা এবং অন্যটি ঈশ্বরোপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনারই প্রশংসা গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে। অধিকারী ভেদে একপ্রকার উপাসনা অন্য প্রকার উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির বাপ্যতে॥

যাঁহারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা অব্যক্তাসক্ত চেতা হইলে অধিকতর কষ্ট পান, যাহা ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভিমানীগণের চিত্ত প্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনা দ্বারা তাহারা দুঃখই পাইয়া থাকে। দেখ আমরা এইরূপ দেহাভিমানী লোক সুতরাং আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুরূহ ব্যাপার সেই জন্য ঈশ্বর উপাসনাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত।

হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে জগৎ গুরু ঈশ্বর অব্যক্ত-ভাবে সদাই বিরাজমান আছেন কিন্তু অব্যক্তের আভা সাধারণের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না বলিয়া সময়ে সময়ে কোন দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ জনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের এই-রূপ বিশ্বাস যে ধ্যানীবুদ্ধ সময়ে সময়ে কোন মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া জীবগণের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন। ঈশ্বর যখন এইরূপ কোন দেহাশ্রয়ী হন তখন তিনি ব্যক্তভাবে মনুষ্যজন সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলা যায়। এইরূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের সাহায্যে মোক্ষের পথ অনুসন্ধানের নাম ব্যক্ত উপাসনা।

একটি কথা তোমাকে এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর কোন দেহ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন বলিয়া সেই দেহকে যেন ঈশ্বর বলিয়া বুঝিও না। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইঁহারা ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরাবতার কিন্তু যদি কৃষ্ণ উপাসক বা বুদ্ধ উপাসক হইতে চাও তবে তাঁহাদের দেহের রূপকেই যেন ঈশ্বর জ্ঞান করিও না। ঈশ্বর, দেবকী পুত্রের শরীরে অবতীর্ণ হইলে ও দেবকী পুত্রের মনুষ্যরূপকে ঈশ্বরের রূপ মনে করিও না। দেবকী পুত্রের বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও। এইটি শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করিতে শিখ তবেই ঈশ্বর তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিবেন, ব্রহ্ম কি পদার্থ তখন বুঝিতে পারিবে।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করা কথাটির অর্থ একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন।

স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি সতত স্মরণ রাখিও, তাহার পর যে অব-তারের নামে তোমার সহজেই ভক্তি আসে, তাঁহাকেই গুরু জানিয়া,

জ্ঞান উপার্জ্জনের চেষ্টা কর ক্রমে সেই গুরুকে বিশ্বরূপ জানিয়া বিশ্বকেই গুরু স্বরূপ দেখিতে শিখ। যতদিন না গুরুকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া অন্তরের প্রত্যয় জন্মিবে ততদিন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয় নাই জানিও।

যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার গুরু। জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, ফলে ফুলে, নদীতে সমুদ্রে, মনুষ্য-দেহে মনুষ্যচিত্তে সর্ব্বত্রই আমার গুরু বিদ্যমান আছেন। গাছের ফুলটি আমায় শিক্ষা দিয়া থাকে, ফুলটির নিকট হইতে ঢের শিখিতে পারি, একটি পাঁচ মাসের শিশুর নিকট হইতে কত জ্ঞান পাই, যে দিকে দেখি সেই দিকেই সকলে আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যয় চিত্তে জন্মিলে তবেই গুরুদেব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। জ্ঞান লাভের প্রকৃত ইচ্ছা যদি অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে কোন পদার্থই চিত্তের অবলম্বন হউক না তাহা হইতেই সত্য তথ্য কত জানিতে পারা যায়। যখন দুই বৎসরের একটি ছেলের দিকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে চাহিয়া দেখি, তখন সেই দুই বৎসরের ছেলেই আমার গুরু, কেন না তীব্র জ্ঞান লালসাবশতঃ সেই ছেলের দেহেই তখন ঈশ্বরের অবির্ভাব হয়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সকলে তাহা দেখিতে পায় না। জ্ঞান লালসার তীব্র সংবেগ উপস্থিত হইলে আমাদের এমন একটি ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হয় যাহার সাহায্যে জগৎগুরু ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই পদার্থকে যখন যে ভাবে দেখিবে তখন উহা সেই অনুযায়ী আকার ধারণ করে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যখন একটি সুপক্ক ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহা তোমার ক্ষুধা শান্তির উপযোগীতার আকার ধারণ করে, আবার যখন জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ঐ ফলের দিকে দৃষ্টি

কর তখন উহাই জ্ঞানদাতাব আকাব প্রাপ্ত হয। জগতে শত্রু নাই, মিত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেহ নাই, কেবল গুরু আছেন এই প্রত্যয দৃঢ় কবিতে চেষ্টা কর তবেই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা কবিতে শিখিবে। যদি প্রকৃত জ্ঞানলালসা জন্মিযা থাকে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে তোমার পবম শত্রু যে তোমাব শত্রুতাচবণ করিতেছে তাহাব ভিতব হইতে একজন তোমাকে জ্ঞান দান করিতেছে।

দেখ, আমাব গুরুর রূপ তোমাকে বলি শুন। অব্যক্ত ব্রহ্ম আমার গুরুব আত্মা, আদিত্যলীন ঋষিগণ তাঁহার চিত্ত, এই পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মাবা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের গুহ্যভাব বহন কবিতেছেন তাঁহাবাই তাঁহাব মুখ, বৃক্ষলতা মনুষ্য সমাকীর্ণ ভূতল তাঁহার দেহ, কর্ম্মীগণ তাঁহার হাত ইত্যাদি।

ছা। মহাশয ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্যাপী বলিযাই বুঝিতে হইবে,তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইহঁাদের ঈশ্বরেব অবতার বলিযা মানিবাব প্রযোজন হয।

শি। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইযা জগতের হিত-সাধন জন্য যে সকল জ্ঞান বিতবণ কবিযা গিযাছেন, সেই জ্ঞান লাভেচ্ছায তাঁহাদেব শবণাপন্ন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দেয। মানুষ মবে না এটা জানিযা বাখিও। শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব স্থূল দেহ ছাড়িযা গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা আমাদের ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে শিখিযাছি-লেন, তাই স্থুল দেহ ত্যাগ করিযা সর্ব্বভূতস্থ হইয়া আছেন। সাধা-রণ মানুষে, মানুষকে যত ভাল বাসিতে পারে, অন্য কোন পদার্থ কিম্বা অব্যক্ত পদার্থকে তত ভাল বাসিতে পারে না, সেই জন্যই ঈশ্বর সমযে সমযে মনুষ্য দেহ আশ্রয় কবিযা মোহিনী শক্তি আশ্রয়

করিয়া সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া মনুষ্য বিশেষের প্রতি তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই উন্নত মনুষ্যের মুখ দিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান পূর্ণ অমৃতময়ী বাক্য সকল বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, অবতার বিশেষের প্রতি ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং ব্যক্ত ভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপাসকগণকে ঘৃণা করিও না, বরং অধিকারীভেদে এইরূপ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া জানিও। কেন না—

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতেঃ।

কিন্তু একটি কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, যে অবতার বিশেষে মানুষের ভক্তি সহজেই উদয় হয়, তাঁহার মনুষ্য মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের, মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার, তিনি জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য অবতার বিশেষের শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। আসল কথা এই যে যাঁহার চিত্তে ঐশ্বরিক আলোকের আভা নির্ম্মলভাব প্রতিবিম্বিত হইতে পায়, তাঁহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারা যায়।

ছা। কোন ব্যক্তির চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মলতা পাইয়াছে এবং কোন ব্যক্তির তাঁহা হয় নাই ইহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

শি। ইহাত তোমায় একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যিনি "সর্ব্ব ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্ব ভূতকে আপনাতে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মলতা পাইয়াছে। যিনি ক্লেশ শূন্য, যাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম, যিনি সদানন্দ তাঁহারাই চিত্ত নির্ম্মলতাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিও।

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের প্রথমে নামে ভক্তি স্থাপন করিতে শিখা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবে নামে ভক্তি হইতে জ্ঞান লালসা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন জানিও যে ভক্তির পরিপক্বতা উপস্থিত হইয়াছে, জ্ঞানময়ী ভক্তিই প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি, এইজ্ঞান লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যখন ঈশ্বর তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুজনের সঙ্গ কামনা প্রবল হইবে, যখন সর্ব্বভূতেই গুরুর অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, তখন তোমার ভক্তিবীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে জানিও ক্রমেই সেই অঙ্কুর হইতে জ্ঞানময় আনন্দময় বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপন্ন হইয়া, চারিদিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া গ্রীষ্মার্ত্তজনকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

ঈশ্বর প্রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জন্মিয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য একটি সুন্দর উপায় বলিতেছি শুন। দেখ যেরূপ ভালবাসাকে সাধারণতঃ প্রেম স্নেহ বা ভক্তি বলা যায়, ঈশ্বর প্রীতি সেরূপ ভালবাসা নহে। প্রীতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে যাহাকে অনুরাগ বলি, দ্বেষ তাহার আনুসঙ্গিক। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই রাগ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দ্বেষকে ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, দ্বেষ যেরূপ ভালবাসার আনুসঙ্গিক সেরূপ ভালবাসা যাহাতে অন্তরে না আসিতে পায় তাহারই চেষ্টা কর্ত্তব্য। পাতঞ্জলির মতে ঈশ্বর প্রণিধানের আসল উদ্দেশ্যই তাই। যখন ঈশ্বর প্রীতি নিবন্ধন কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব আর থাকে না তখনই প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি জন্মিয়াছে বলা যায়। খ্রীষ্টিয়ান যদি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হন, নিরাকার উপাসক যদি সাকার উপাসকের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হন, তবে তাঁহাদের ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই বলিতে

হইবে। যাঁহার অন্তর একেবারে দ্বেষশূন্য হইয়াছে তাঁহাকেই প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত বলিয়া জানিও। যে অনুরাগ হইতে গোঁড়ামী জন্মে সে অনুরাগ ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না গোঁড়ামী জন্মিলেই নিজের মত ছাড়া অন্য মতের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। এই সব কথা বুঝিয়া ঈশ্বর প্রীতি কি পদার্থ তাহা শিখিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরে অনুরাগ এবং গোঁড়ামী ও দ্বেষ ভাবের উপর সমস্ত দ্বেষ রাখিয়া দিয়া, ঈশ্বর প্রীতি শিখিতে চেষ্টা কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

ছা। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যে সকল কর্ম্ম কামনা শূন্য হইয়া করা যায় তাহা আমাদিগের বন্ধের কারণ হয় না শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যে কাজ করিবে, তাহাতে যেন আসক্তি না থাকে, কর্ম্মফলে যেন স্পৃহা না থাকে। একটি ছেলে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি সেই লেখা পড়ায় আসক্তি না থাকে সে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি লেখা পড়ায় এলাকাড়া দিবে একপ এলাকাড়া দেওয়াকে কি ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়।

শি। তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম কথাটির অর্থ ঠিক বুঝ নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মে এলাকাড়া দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয় না। উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে অথচ কর্ম্ম ফলে স্পৃহা থাকিবে না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমি একটি উদাহরণ দিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন ছেলেরা ছুটাছুটি খেলা করিতেছে দেখিতেছিলাম। খেলায় হার হউক বা জিৎ হউক সে বিষয়ে কেহই উৎকণ্ঠিত নহে, তাহারা খেলা করিবার জন্য খেলা করিতেছে। এরূপ খেলায় ছেলেদের বড়ই উৎসাহ তাহা তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ। এই ছেলেদের খেলার বিষয় মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকিলে যে কর্ম্মে উৎসাহ থাকিবে না ইহা কোন কাজের কথা নয়।

অনেকে এরূপ অলস যে তাঁহাদের কোন কর্ম্মেই গা নাই। অদৃষ্ট বলে যা হইতেছে হউক এইরূপ ভাবিয়া সকল কর্ম্মেই, যত্ন ও উৎসাহ বিহীন হইয়া চুপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাই এক কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহার ফললাভে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও অলস ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায় যে ফল তাহাতে আসক্ত। কথাটা আর একটু পরিস্কার করিয়া বুঝ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে অনেক যত্ন অনেক চেষ্টা করা রূপ কষ্ট আছে সেই কষ্ট যাহাতে না পাইতে হয় অলস ব্যক্তির সেই আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম না করাকে, বন্ধের কারণ কর্ম্মের ন্যায় দেখিবে—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দিযাছেন।—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মকে অকর্ম্ম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে কিন্তু আমি ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ অভিমানশূন্য হইতে হইবে। আমি করিতেছি না, এইরূপ জ্ঞান জন্মাইলেই ঐ কর্ম্ম আমার পক্ষে অকর্ম্ম হইবে। এবং অলস হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন না করা যে অকর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্ম জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ অকর্ম্ম ও বন্ধের কারণ।—অর্থাৎ চরম উন্নতি মুক্তির পথের কণ্টক বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ বুঝেন তিনি যদৃচ্ছা প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম করিযাও পরম পদে যুক্ত।

এই সংসারক্ষেত্রে আমরা খেলা করিতে আসিয়াছি। যাহার যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করিয়া যাই এস। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখা যায়, সে ফলের উপর কোন লক্ষ্য রাখিয়া

কাজ নাই। সকল কর্ম্ম সাধনের এক চরম ফল আছে সেই ফল আত্মজ্ঞান বা মোক্ষপদ বা ঈশ্বরে লীন হওয়া, সদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে অভ্যাস করি এস। কোন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন it is not the goal but the course that makes us happy ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফল সম্বন্ধে এই জ্ঞানটি রাখা উচিত, যে কর্ম্ম করাটিই সুখ, কর্ম্মফল পাওয়াটি সুখ নহে।

যে ছেলে লেখা পড়া শিখিতে এলাকাড়া দিবে সে তাহার ঐ এলাকাড়া দেওয়া কর্ম্মের ফল পাইবে। লেখা পড়া শিখিয়া উপাধি পাব পুরস্কার পাব বা পরে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব, এই সকল সম্মুখস্থিত ফলের প্রত্যাশী হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে যাওয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নহে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই জন্য লেখা পড়া শিখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। সকল প্রকার কামনা শূন্য হইবে, কর্ম্মফলে কখন আসক্তি রাখিবে না— গীতাশাস্ত্রে এই উপদেশ বরাবর কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই কর্ম্মফল কথায়, মোক্ষ ফল ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মফল—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কামনা অর্থে ভোগৈশ্বর্য্য সুখে কামনা, মোক্ষফল পাইবার আগ্রহকে কামনা বলে না। নিষ্কাম হও এই কথার অর্থ সমস্ত অনিত্য সুখের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ পাইবার জন্য লালায়িত হও।

এমন অনেক অলস ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেটি ভ্রম। আমাদিগের ইচ্ছাবৃত্তি কোন না কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিবেই থাকিবে। সাধারণতঃ এই ইচ্ছাবৃত্তি নানারূপ ভোগ্য বিষয়েই লিপ্ত থাকে। নিষ্কাম ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে তোমার ইচ্ছাবৃত্তি যাহা এখন নানা বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাকে সেই সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া কেবল

একমাত্র নিত্য পদার্থ ঈশ্বর প্রীতিতে সংযুক্ত কর। যেমন সূর্য্য রশ্মি আতশি কাচের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া একটি বিন্দুতে জমা হইযা প্রখরতর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের সমস্ত ইচ্ছা, এক ঈশ্বরপদ লাভে যোজনা করিযা, সৎ ইচ্ছাব প্রখরতা বৃদ্ধি করাই, নিষ্কাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ছা। এখন বুঝিলাম যে চুপচাপ করে, যা হচ্ছে হউক এইরূপ ভাবিয়া বসিযা থাকিলেই নিষ্কাম হওয়া হয় না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কোনটি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কোনটিই বা কর্ত্তব্য নহে তাহা কেমন করিযা বুঝিব।

শি। ঐ বুঝা একটু শক্ত কথা। মনুষ্যের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং কোন কর্ম্মই বা কর্ত্তব্য নহে এই বিষযে এক্ষণে তোমাকে কিছু বলিতে চাই। কিন্তু এই বিষযটি আমি যে তোমাকে কোন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব সেরূপ সাধ্য আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন 'গহণা কর্ম্মণোগতিঃ"। (৪র্থ অ, ১৭ (গীতা) কর্ম্মের গতি বুঝিতে পারা অতি দুর্জ্জেয়। যিনি কর্ম্মের গতি হৃদযঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এ জগতে তাঁহার আর কিছুই জানিতে বাকি নাই। যে কর্ম্ম বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা কর্ম্মেব গতি তন্ন তন্ন করিযা আলোচনা কবিযাছেন জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তিনি বুঝিযাছেন কেননা কর্ম্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই এই জগৎ চক্র ঘুরিতেছে।

কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথমে ইহা জানা উচিত যে তোমারও পক্ষে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য আর একজনের পক্ষেও যে সেই সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্য তাহা নহে। আজ তুমি যেরূপ অবস্থায আছ তাহাতে তোমার পক্ষে যেরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কাল হয়ত সেই কর্ম্মই তোমার কাছে অকর্ম্ম। অর্থাৎ দেশ

কাল ও পাত্রানুযায়ী কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিচার করিতে হইবে। আমার পক্ষে যাহা ধর্ম্ম তোমার পক্ষে হয়ত তাহাই অধর্ম্ম ; সেই জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"।

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটির অর্থ যত দূর বুঝাইতে পারি তাহাই বুঝাইব।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল বিশেষ বিশেষ দৈবঘটনা স্রোতে পতিত হইয়া থাকে তাহাও তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে যে ঘটনার অধীন হইতে হয়,যে সকল ঘটনাকে অকস্মাৎ ঘটনা দৈবাৎ ঘটনা বলিয়া থাকি সেই সকল ঘটনায় যে আমাকে পতিত হইতে হয় ইহা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল জানিও, আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের সহিত ইহ জীবনের যে কর্ম্মশৃঙ্খলের একতান সম্বন্ধ (Harmony) আছে সেই কর্ম্মই আমার স্বধর্ম্ম। এবং এই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মভয়াবহ ॥

ছা। আপনি স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলেন আমি তাহা বড় বুঝিতে পারিলাম না।

শি আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি নিজের মনে সেই সকল কথা লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলে পর আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে, যে, যে বিষয় লইয়া নিজে কখন ভাবে নাই সে বিষয়ের কথার

ভাব সহজে তাহার মনে অঙ্কিত হয় না। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটী কথা তোমাকে প্রথমে বলি শুন।

আমি যে ঘটনাস্রোতে ভাসিতেছি, মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্মদ্বারা সেই ঘটনাস্রোতে সন্তরণ দিয়া, কূল পাইবার চেষ্টা করাই স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরপদ অর্থাৎ নিত্য সুখময় ঘটনাস্রোতের কূল। সর্ব্বদা সেই কূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাঁতার দিতে যাইও, নচেৎ আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে যে জন্য যুদ্ধে রত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলে স্বধর্ম্ম কথাটির অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া আত্মীয় নাশ-জনিত শোকে মোহ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন সেই সময় তাঁহার কি কর্ত্তব্য ইহা বিচার করিতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল ভগবদ্গীতায প্রকাশ করিযাছেন। যাঁহারা গীতার পাতা উলটাইয়া উহার মর্ম্ম সমস্ত বুঝিয়া লইযাছেন মনে করেন, তাঁহারা গীতাকে নানা কারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু গীতার গুহ্যভাবের ভিতর যাঁহারা প্রবেশ কবিতে চেষ্টা করিযাছেন, সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, গীতার কথঞ্চিৎ রসাস্বাদনেই তাঁহারা মোহিত হইয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রের সাহায্যে আমি এইরূপ বুঝি যে, যে ঘটনার অধীন হইয়াছি সেই ঘটনানুযায়ী এবং নিজের মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। অর্জ্জুনের মূল প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়-বৃত্তি। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইলেই যে তাঁহাকে কেবল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে তাহা কর্ত্তব্য নহে। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করাই যে কেন কর্ত্তব্য তাহার প্রধান কারণ গীতার ২য় অধ্যায়ের

৩২ শ্লোক হইতে বুঝা যায়। শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে এই যুদ্ধ "যদৃচ্ছায়া উপপন্নং।"

শ্লোকটি এই—

যদৃচ্ছায়া উপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং॥

এই 'যদৃচ্ছায়া উপপন্নং" কথাটির ভিতর যে কত গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অনেকেই ভাবেন না। যদৃচ্ছায়া উপপনং অর্থাৎ যে ঘটনা আমি খুঁজি অথচ যাহা আমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মই তাহার কারণ। এইরূপে অপ্রার্থিত ঘটনায় সাহায্যে ইহজীবনের কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মক্ষয় করাই স্বধর্ম্ম।

প্রবৃত্তির শান্তিতেই সুখ এবং প্রবৃত্তির শান্তি করাই ধর্ম্মকর্ম্ম। এবং যদৃচ্ছা প্রাপ্ত বিষয়ের সাহায্য লইয়া প্রবৃত্তির শান্তিভাব আনয়ন করিতে যাওয়াই স্বধর্ম্ম। যুদ্ধ বিষয়ে অর্জ্জুনের স্বভাবিক প্রবৃত্তি। কুরুক্ষেত্র সমরের সময়ে অর্জ্জুনের সেই প্রবৃত্তি শান্তভাব ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি কুরুক্ষেত্র সমর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং এইরূপ অযাচিত যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া, কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করাই অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ত্তব্য, ইহাই গীতার অভিপ্রায়।

ছা। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধবিষয় হইতে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যুদ্ধে যে প্রবৃত্তি ছিল ইহা কিরূপ বলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে তিনি বন্ধুবধ-জনিত অনিষ্ট সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই, সেই জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই অনিষ্ট বিষয় চিন্তা দ্বারা তাঁহার যুদ্ধবিষয়ক প্রবৃত্তি শান্ত

হওয়াতেই তিনি যুদ্ধে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে।

শি। মনুষ্যের প্রবৃত্তি অগ্নির স্বরূপ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এই অগ্নির ইন্ধন, বিষয় বায়ুর সংস্পর্শে এই অগ্নি জ্বলিতে থাকে। এই কর্ম্ম রূপ ইন্ধন সদাই জ্বলিতে চায়। যতক্ষণ না উহা ভস্মসাৎ হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তির শান্তি সম্ভব নহে। প্রবৃত্তি অগ্নি কখন কখন ধূমাবৃত বা ভস্মাচ্ছাদিত হয় এবং সেই সময়ে উহার আভা বাহিরে প্রকাশ পায় না বটে কিন্তু আভা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেই প্রবৃত্তি যে শান্ত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা ভুল। মনে কর তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছ, এমন সময়ে কোন আত্মীয়ের বিপদ সম্বাদ আসিল। তোমার খাওয়া দাওয়া ঘুরে গেল, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ক্ষুধা যে উপশম হইল ইহা ঠিক কথা নহে। অর্জ্জুনের পক্ষেও সেইরূপ বন্ধুনাশ-জনিত অনিষ্ট চিন্তায় তাঁহার যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল সেই মোহ ধূমে তাঁহার ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তির আভা আচ্ছাদিত হইয়াছিল মাত্র, তাঁহার প্রবৃত্তি উপশম হয় নাই। অর্জ্জুনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মোহ অপমোচন করিয়া তাঁহার মূল প্রবৃত্তির আভা তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাই ভগবদ্গীতার আসল কথা। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন যে কালচক্রের বশে দুর্য্যোধনাদি নিহত হওয়াই নিশ্চয়, জগতের হিত সাধন জন্য দুর্য্যোধনাদির নিধন সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল, তাঁহার ক্ষত্রিয়বৃত্তির আভা পুনঃ প্রকাশিত হইল। তখন তিনি গুরুধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন জন্যই কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গীতার মর্ম্ম যতই বুঝিতে চেষ্টা করিবে ততই নূতন নূতন ভাব সকল

মনোমধ্যে উদয় হইবে। আমার নিকট মাঝে মাঝে গুটিকতক গুটি-কতক কথা শুনিয়া কিছুই শিখিতে পারিবে না। নিজে না ভাবিতে শিখিলে কেহ কিছু শিখিতে পারিবে না। "পড়, দেখ, এবং নিজে ভাবিতে আরম্ভ কর" এই উপদেশটি, আমি যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছি সেই সময় আমার একজন শিক্ষকের নিকট হইতে পড়িয়া-ছিলাম, আমি ও তোমাকে এই উপদেশ উপদিষ্ট দেখিতে চাই। দেখ, কর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝিবার অনেক কথা আছে এবং এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আর একদিন উত্থাপন করা যাইবে।

"এখন এস প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র, কতবার আসি-য়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম।

পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

গ্রন্থকার এই কটি কথা বলিয়া দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতেই একটি বাক্য আমা-দের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথাটি পুরাতন সেই একটি কথার ভিতরে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রহিয়াছে সেই একটি কথার ভিতরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, শাস্ত্র সমুদায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ, সমুদায় সেই একটি কথার আশ্রয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়, মৃত সঞ্জীবনী রস যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা সেই কথাটির ভিতর আছে।

কথাটি—"নিষ্কাম কর্ম্ম।"

এক একটি কথা কে জানে কেমন সময় বুঝিয়া, সমাজের সমক্ষে

আসিয়া দাঁড়াইবা, কত কি কার্য্য সমাধা করিয়া, আবার চলিয়া যাব। এক Liberty, Fraternity, Equality তিনটি কথা ফ্রান্সে কি কাণ্ড না করিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমি ইহা বুঝি যে, এক একটি বাক্যেই এক একটি দেবতা। হিন্দুরা বলেন বেদের বাক্‌শক্তিই দৈবশক্তি, এবং সেই দৈবশক্তি হইতেই জগৎ চলিতেছে, প্লেটো ও ঐরূপ কথা বলিযা গিয়াছেন। প্লেটো বলেন যে "Ideas rule this world" মনুষ্যসমাজচক্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এক এক সময়ে এক একটি বাক্যই যেন সমাজের রাজা স্বরূপ হইযা আধিপত্য করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। আজ কাল যে বাক্যটি আমাদের সমাজের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে কালে যে কত অমৃতময় ফল ফলিবে তাহা এখন কে বলিতে পারে? কিম্বা এখনও হইতে পারে যে, কথাটি সম্যক আদর না পাইযা হয়ত অল্পদিন মধ্যেই সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এক একটি কথা এক একটি বীজ স্বরূপ। সম্যক্ জল সেচন না করিলে বীজ প্রায়ই শুকাইযা যায়, কিন্তু চিন্তা স্রোতের জলে বাক্য বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাই বলি যে যখন সুন্দর, শুভফলপ্রদ বাক্য তোমাদের সাক্ষাতে দেখা দিবে, তখন তাহাকে হৃদযে করিয়া, মনের মধ্যে স্থান দিয়া, তাহার সম্যক্ উপাসনা করিও। সকলে মিলিয়া একটি কথা লইয়া সদাই মনোমধ্যে বিচার করিতে থাক, তবেই দেখিবে যে, অল্পদিন মধ্যেই সেই কথা কতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। ভয়ানক ঝড়ের পর আকাশ যে শান্ত ভাব ধারণ করে, পতিব্রতা রমনীর মুখের যে মাধুর্য্যময় ভাব, মদন ভস্ম করিতে উদ্যত মহাদেবের যে রৌদ্র ভাব, যে বিশ্বব্যাপী করুণ ভাবের বশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল ভাব গুলি একত্রিত হইযা এই "নিষ্কাম কর্ম্ম"

কথাটির ভিতর রহিযাছে দেখিতে পাই। এমন সুন্দর কথাটি যখন আমাদের সমক্ষে আসিযাছে, তখন এস আমবা সকলে মিলিযা এই কথার উপাসনা করি। এই "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটির অর্থভাবনা, এবং সেই ভাবনানুযাযী কর্ম্মদ্বারা নিজের জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, সুতরাং ইহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা।

যখন কোন একটি বড প্রযোজনীয় কথা মনে আসিযাও আসিতেছে না, তখন মনের ভিতর কি একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয। তাহার পর কিছুক্ষণ বাদে হয় ত কথাটির গোডাব অক্ষবটি মনে আসিলে আবার সেই অক্ষরটি অবলম্বন করিযা ভাবিতে ভাবিতে হাবান কথাটি পুনবায় মনে ফিরিযা আসিতে পাবে। আমাদের হিন্দু সমাজ কি একটি বড প্রয়োজনীয় সত্য মনে অনিয়াও মনে আনিতে পারিতেছে না। কি কতকগুলি পুরাতন কথাব উপর ভিত্তি স্থাপন কবিযা দৃঢবদ্ধ সমাজ গঠিত হইয়াছিল সেই গুলি সমাজ ভুলিযা গিযাছে। আজকাল জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হওযায সেই কথাগুলি মনে আনিবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু মনে আসিতেছে না—সমাজের বডই যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতর কেবল দলাদলি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময এই যে "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটি আমাদের সমক্ষে আসিযা উপস্থিত হইয়াছে, এইটি সেই সমস্ত হারান বাক্যেব আদ্য অক্ষব স্বরূপ। এই গোডার কথাটি কেহ মন হইতে ছাড়িয়া দিওনা, এই গোডার কথাটি অবলম্বনে পুরাতন কথাগুলি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলেই যাহাদের ভুলিয়াছি তাহারা ক্রমে ক্রমে দেখা দিবে, ভাবতের পূর্ব্ব-গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

আজি "দেবীচৌধুরাণী" অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গুটিকত বলিতে চাই। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহারই কথঞ্চিৎ

আভাস দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের বীজ ফলপ্রদ হয় তাহাই এই প্রথম পরিচ্ছেদে বুঝান আছে।

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মার কথোপকথন লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ। ইহারা কাঙ্গালিনী। মা মেয়েকে ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে আনিতে বলিল।

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না, আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছু নাই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

কিন্তু শুধু ভাতও জোটে না—ঘরে চাল নাই। কাজেই মা ধার করিতে চলিল। কন্যা বলিল "আমরা কত লোকের চাল ধারি, শোধ দিতে পারি না আর ধার করিও না। আজ মায়ে ঝিয়ে পৈতা তুলি, কাল বিক্রয় করিয়া চাল কিনিব।" কিন্তু পৈতার পাঁজটি পর্য্যন্ত গৃহে নাই—তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা আবার ধুচুনি লইয়া চাল ধার করিতে যায় দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল—"মা আমি কেন ধার করে খাব? আমার ত সব আছে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে শ্বশুরের অন্ন খাইতে পাইনা? শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি যে শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাইব, নহিলে আর খাইব না। যাহাদের উপর আমার ভরণ পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব তাহাতে লজ্জা কি?"

এই প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে আমরা কি শিখিলাম?

যদি মরিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি যে ধার শোধ দিতে পারিব না সে ধার করিতে মনে যাঁহার সদাই সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তাঁহার চিত্ত নিষ্কাম ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। একদিন দুমুঠা চাল ধার করিয়া

সেই ধার শোধ দিতে না পারিলে যে কেহ একেবারে ধর্ম্মে পতিত হয়, এ কথা যদি ও ঠিক নহে, কিন্তু যে জনের চিত্তের গঠন এরূপ সুন্দর, যে তিনি কোন সামান্য বিষয়ে ও ঋণী থাকিতে ইচ্ছা করেন না, নিষ্কাম কর্ম্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিযা থাকে। ঋণ পরিশোধ কবিবার জন্যই এ জীবন ধারণ করিয়াছি, নূতন কোন ঋণে আবদ্ধ হইতে যেন না হয়, এইরূপ মনে কবিযা কার্য্য করিতে শিখাই নিষ্কাম কর্ম্মেব প্রথম আরম্ভ। অপ্রতিগ্রহ নিষ্কাম কর্ম্মে'ব প্রধান অঙ্গ।

২য়। প্রফুল্লব লজ্জা। পাড়া পড়সীব নিকট হইতে একটি বেগুন চাইতে প্রফুল্লর লজ্জা কবে। কিন্তু যে শ্বশুর বাড়ীতে কখনও তাহার নাম করে না সেইখানে উপযাচিকা হইযা যাইতে প্রফুল্লের লজ্জা নাই। ইহার কারণ যাহাদেব উপব ধর্ম্মতঃ তাহাব ভরণ পোষণের ভাব তাহাদেব কাছে অন্ন ভিক্ষা করিতে প্রফুল্লমুখী লজ্জিত নহেন।

লজ্জা দুই প্রকাবের দেখিতে পাওযা যায। এক প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার অনুকূল এবং অন্য প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার প্রতিকূল। আমি এ কাজটা কেমন করিযা কবিব, পাঁচজনে আমার নিন্দা করিবে এবং সেই ভয়ে কোন কাজ করিতে যে সঙ্কোচ হয তাহা এক প্রকারেব লজ্জা এবং যে কাজ আমার নিজেব মনে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝি তাহা করিতে যে সঙ্কোচ, তাহা অন্য প্রকারেব লজ্জা। যাঁহাদের লজ্জা কেবল লোক নিন্দার উপর নির্ভর করে তাঁহারা গোপনে অধর্ম্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিম্বা সমাজে যে সকল অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইযাছে সেই সমস্ত অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদের লজ্জা হয় না। কিন্তু উন্নত চেতাদের লজ্জা অন্যরূপ। যাহাতে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে, এরূপ ভাব মনে আসিলেই তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনি কেমন সঙ্কুচিত হইযা পড়ে এবং সেই বিষয়ে কেমন লজ্জা উপস্থিত হয়। এইরূপ লজ্জাই ধর্ম্মের সহায়। প্রফুল্ল

গরিব কাঙ্গাল একটা বেগুন চাইতে গেলে পাঁচজনে তাহাকে লজ্জা দিবে না বটে, কিন্তু ঐ ভিক্ষা করিবার নামেই তাহার প্রশস্ত মনে কেমন লজ্জা উপস্থিত হইল। "দারিদ্রদোষহি গুণরাশিনাশী" এই একটি কথা প্রচলিত আছে, কথাটি অধিকাংশ স্থলেই সত্য, কিন্তু প্রফুল্লের দারিদ্র তাহার মানসিক তেজ নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, প্রফুল্ল পৈতা তুলিয়া খাইবে, তবু ভিক্ষা করিতে রাজি নহে। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে চান, তাঁহার চিত্তকে প্রথমে এরূপ গড়িয়া লইতে হইবে যেন গুণ রাশিনাশী দারিদ্রদশা উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্তের প্রশস্ততা না কমে।

প্রফুল্লের লজ্জার কথা বলিতেছিলাম। প্রফুল্ল যখন উপযাচিকা হইয়া শশুর বাড়ী যাইবে, তখন তাহারা কত কি কথা কহিবে, পাঁচজনে কত কথা নিন্দা করিবে, তাহাকে কত লোকে বেহায়া বলিবে, এ সব কথা মনে আসিলে প্রফুল্লের উন্নত চিত্তের কোন সংকোচ জন্মাইতে পারে নাই, কেন না ধর্ম্মতঃ তাঁহাব যাহাতে অধিকার আছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করায় তাঁহার চিত্তে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে না, ইহা তাঁহার অন্তরের দেবতা তাঁহার মনকে বুঝাইয়া ছিল।

নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে প্রথমতঃ অন্যায় লোক লজ্জা ত্যাগ করিতে শিখিতে হইবে। সামান্ত লোকলজ্জা ভয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়। মান অপমান বোধটি দূরস্ত করিয়া লইতে হইবে। পাঁচজনের কাছে ছোট হইয়া দাঁড়াইতে হইলে আমাদের অপমান বোধ হয়—কিন্তু উন্নতচেতা কেবল নিজের অন্তরের সাক্ষী দেবতার নিকট সংকীর্ণ মন লইয়া দাঁড়াইতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

৩য়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়া গিয়াছেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনই নিষ্কাম ধর্ম্মের সার কথা।

এই ধর্ম্মপ্রতিপালন কথাটি চিত্রিত করাই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই গ্রন্থের নায়িকা অশিক্ষিত অবস্থাতে ও স্বতঃই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপরা। বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার স্বামীর উপর। স্বামীর অন্নে স্ত্রী সেই দেহ পোষণ করিয়া স্বামী সেবায় সেই দেহ পাত করিবে, ইহাই বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আপনা হইতেই প্রফুল্লের মনে এই কথা উদয় হইয়াছে যে, আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইতে লজ্জা করা অকর্ত্তব্য।

ভিক্ষা করিও না, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না সেরূপ ঋণে বদ্ধ হইও না, এবং আপনার ধন যদি পরের নিকট থাকে তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না। নিষ্কাম কর্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে এই কয়টি কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে। এই কয়টি কথার ভিতরেই নিষ্কাম ধর্ম্মের সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। নিজের ধন অর্থাৎ নিজের নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইও না, কেন না কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করাই নিষ্কাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরের ধন অর্থাৎ পরের কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেন না তাহা হইলে তোমাকে নূতন ঋণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদিন সেই ঋণ-মুক্ত না হও ততদিন তোমার মুক্তি হইবে না।

এই সংসারটা একটা ভারি বাজার। আমরা সকলেই এক একজন ব্যাপারী। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেনা পাওনার ব্যাপারে জড়াইয়া রহিয়াছি। এ বাজারে ব্যাবসা করে লাভটা যে কি তাত কিছুই খুঁজে পেলাম না, তাই এক এক দিন দোকান পাঠ বন্ধ করে পালাবার

মতলব হয়। কিন্তু পালাবার যো নাই। দেনা পাওনা না চুকাইয়া যাইবার যো নাই। যিনি এই সংসারের বাজারের দেনা পাওনার খাতা পত্র লইয়া হিসাব রোকসোদ করিবার মতলব করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা যায়। বাজার দেনার জ্বালায় এক এক সময় বড়ই অস্থির হইতে হয়, তোমরা কেউ বাজার দেনা রাখিও না। যেখানে একটু ময়লা একদিন জমে তাহা যদি তখনই পরিষ্কার না কর, তবে পরদিন আর একটু ময়লা জমিবে। বাজার দেনা ও সেই রকম। সেই জন্য আমি এক পরামর্শ বলি তোমরা শুন, যখন কিছু খরিদ করিতে হইবে তখন উহা নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া খরচ করিও। এক একজনের এমনি স্বভাব আছে যে তাঁহারা ধারে হাতী কিনিতে পারেন একপ লোক শেষ দশায় বড়ই কষ্ট পান। যিনি নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া খরচ করেন তাঁহাকে দেনা পাওনার হিসাবে গোলমালে পড়িতে হইবে না। কর্ম্মের খাতায় যা লেখা আছে তাহা আবার এমনি মুহুরীর লেখা, যে বোঝে কার সাধ্য। এই লেখা পড়িতে শিখার নাম জ্ঞান-চর্চ্চা। এসব কথা সময়ান্তরে তুলিব।

এইবারে দেবীচৌধুরাণীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লমুখী কি গুণের পরিচয় আছে তাহা দেখা যাউক। প্রফুল্লমুখী মাকে সঙ্গে লইয়া শশুর বাড়ীতে পঁহুছিল। প্রফুল্লের মার এক মিথ্যা অপবাদ প্রচার হওয়া অবধি প্রফুল্লর শশুর তাহাদিগের সহিত অনেক দিন সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্ল তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া উপযাচিকা হইয়া শশুর বাড়ীতে আসিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। গৃহিণীর সহিত দু চারি কথা হওয়ার পরই মা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। প্রফুল্ল গেল না, যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল "তোমার মা গেল তুমি

ও যাও। নড না যে? কি জ্বালা আবার কি তোমার সঙ্গে লোক দিতে হবে না কি?"

নির্বভিমানিনী প্রফুল্লমুখী এখন মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এখন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করিতে পেলেম না।" মন একটু নরম হইল।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নি। তা কি করি মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় না নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কোথায় সন্তান ত্যাগ করেছে। আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হইল। বলিলেন, "কি জান মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুট-স্বরে বলিল "হলেম যেন আমি অজাতি কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?

গিন্নি আর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা বসো।" প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা ইহা দেখিতে পাই, যে, যে ব্যক্তি দারুণ কঠোর ভাব ধারণ করিয়া প্রফুল্লকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি প্রফুল্লের দুটি গুণে একেবারে নরম হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গুণ দুটি এই প্রফুল্লর মুখ-শ্রী বড সুন্দর এবং কথা বড মিষ্ট। যদি কেহ তোমরা নিষ্কাম ধর্ম্মবতাবলম্বী হইয়া সমাজে আদর্শ স্বরূপ দাঁড়াইতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে প্রফুল্লের ন্যায় মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ এবং মিষ্ট কথায় (তা বলিয়া যেন কথা মিথ্যা না হয়) লোককে তোমার পক্ষাবলম্বী করিতে শিখ। মুখের শ্রীব এবং মুখের কথার সৌন্দর্য্যরজ্জুতে সমাজকে বাঁধিয়া ধর্ম্মের দিকে টানিতে শিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য সকলেই মুখশ্রী এবং বাক্যের মধুরতার মোহিনী শক্তির সহিত ধর্ম্মের পবিত্রতা মিশাইয়া জগৎ মাতাইয়া গিযাছেন।

মুখশ্রী সুন্দর কবিতে শিখ—এই কথা বলায অনেকে হয় ত বলিবেন যে, ওটা কি নিজের হাত, যে নিজের চেষ্টায় মানুষ মুখের শ্রী-সুন্দর করিতে পারিবে? যে যেমন মুখ লইয়া জন্মিযাছে সে মুখ কি সে বদল করিতে পারিবে? আমি এইরূপ কথার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে আমাব যা কিছু সবই আমার কর্ম্মের ফল, আমাতে যা কিছু কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিযা আনা ও আমার চেষ্টার উপর নির্ভর কবে। আমি যদি এ জন্মে কুৎসিৎ মুখ লইযা জন্মিয়া থাকি তাহা আমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, এজন্মে আবার, উপযুক্ত কর্ম্ম ও অভ্যাস দ্বারা পরজন্মে সুন্দর মুখ লইযা জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। যিনি পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম মানিতে চান না তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি যে যাহাকে মুখশ্রী বলা যায় এই জন্মেই তাহার পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের নিজের আয়ত্তাধীন। একই মুখের শ্রী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছ কি?

হাসিভরা আশা মাখা যে মুখের শ্রী একদিন বড় সুন্দর দেখিয়াছি, সেই মুখে যখন অসন্তোষ ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পায় এবং মুখ হাসি শূন্য হইয়া গোম্‌ড়া পানা হইয়া হইয়া থাকে তখন সেই মুখই আবার কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয়। মনের ভাব যে আকারে মুখে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখের শ্রী বলিতে পারা যায়। ক্রমাগত সুন্দর ভাব মনোমধ্যে আনিতে অভ্যাস করিতে করিতে মুখের শ্রী ও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে থাকে। মনে আনন্দ ভাব উদয় হইলে মুখ যেন হাসি হাসি হয়। কিন্তু অসন্তোষ ভাব মনে আসিলে মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়া যায়। আনন্দ ভাবের উদয়ের সঙ্গে মুখের পেশী সকলে এক প্রকার টান পড়ে, পেশী গুলি যেন ভ্রূর গোড়ায় কুঁচ-কায় এবং ঠোঁট দুখানিকে যেন একটু বেশী চাপিয়া দেয়। এখন দেখ যিনি ক্রমাগত চিত্তে আনন্দ, আশা, সন্তোষ এই সকল সুন্দর ভাব আনিতে চেষ্টা করেন তাঁহার মুখের মাংস পেশী সকল ক্রমাগত সুন্দর ভাবে টান পাইতে থাকে, এবং সুন্দর ভাবব্যঞ্জক মুখের শ্রীটুকু মুখ মণ্ডলে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মনের অসন্তোষে আবার কত সুন্দর মুখ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সুন্দর মুখ শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে তখন যাহা সুন্দর নয় ও তাহা চেষ্টা ও অভ্যাসে সুন্দর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মনে সুন্দর ভাব উদিত করিয়া সেই ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে এবং এই অভ্যাস দ্বারা মুখশ্রী সুন্দর হইবে। নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে ভিতর ও বাহির দুই সুন্দর করিতে হইবে। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি—মুখে পাউডার মাখিলে মুখশ্রী সুন্দর হয় না।

এইবারে মিষ্টকথা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। যযাতি পুরুকে

রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার এই কটি কথা আছে।

"যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয় এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পুরুষ-ভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যে হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীক চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ স্বায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন্ কালে ও অন্যের উপর নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান, ও মধুর বাক্য প্রয়োজন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না।"—

(মহাভারত কালীসিংহের অনুবাদ)।

মিষ্ট কথা উন্নত চিত্তের পরিচায়ক। কিন্তু মিষ্ট কথা কহিবার জন্য কেহ যেন মিথ্যাবাদী না হন। মিথ্যার ন্যায় অধর্ম্ম আর নাই।

অন্তরে ভালবাসার ভাব যত বাড়িবে মুখের কথা ও সেই অনুযায়ী সুমিষ্ট হইতে থাকিবে। অন্তরে প্রেম, দয়া, এবং মৈত্রীভাব বাহিরে মিষ্ট কথায় প্রকাশ পায়। যদি অন্তরে ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাব না থাকে তবে কেবল মিষ্ট কথা কহা কপটাচার। প্রফুল্ল মুখীর হৃদয় ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাবে পূর্ণ, তাই তিনি মিষ্টভাষী হইয়া মিষ্ট কথায় শাশুড়ির মন নরম করিতে পারিয়াছিলেন। প্রফুল্লমুখীর

প্রফুল্ল অন্তকরণে, দয়া, মৈত্রীভাব ও ভালবাসা যে কত স্রোতবাহী তাহা পরে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

"লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং॥"

এই লোকে ধর্ম্মনিষ্ঠা দুই প্রকার, ইহা বেদে আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের অধিকারী সাংখ্য যোগীরা জ্ঞান যোগে রত হন এবং প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী যোগীরা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা আত্মবিষয়ে বিবেকবান্ তাঁহারা সংসার আশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া জ্ঞান যোগ দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন তাহাই নিবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা, এবং কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া যে নিষ্ঠা লাভ করেন তাহাই প্রবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা। যিনি যে মার্গ অবলম্বনে অধিকারী তাঁহার সেই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী, সংসারাশ্রম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে, এই কথাটি দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহার চিত্ত, সুখ লাভেচ্ছায় বাহ্য বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি যদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে মনে স্মরণ করিতে থাকেন তবে সেই বিমূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে। গীতা ৩।৮

এরূপ কপটাচার প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চার ব্যাঘাত স্বরূপ। কেন না,

মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর করাই ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশ্য, বাহ্য কর্ম্ম সন্ন্যাস অবলম্বনে মনে তৃষ্ণা দূর হয় না। প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ ব্যতিরেকে মনের তৃষ্ণা দূর করা দুঃসাধ্য। সেই জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদের পক্ষে বিধি। এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার কৌশলকেই কর্ম্মযোগ বলে। "যোগ কর্ম্মসু কৌশলং।" এইরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করার নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কে আসিয়া পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ দুঃখের স্মৃতি চিত্তপটে সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের মনে সুখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে সেই সুখের আনুসঙ্গিক দুঃখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না, অপর অপর লোকের মনে দুঃখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সুখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না। যেখানে সুখের সংস্কারের প্রাধান্য, মনুষ্য চিত্ত সেইখানে সুখপ্রদ বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যেখানে দুঃখের সংস্কারের প্রাধান্য, সেইখানে মনুষ্য বিষয়বিদ্বেষী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়। প্রসূতি, প্রসবের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াই প্রসব যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া যায়। যাহারা এইরূপ সুখপ্রদ বিষয়ের সম্পর্কে আসিয়াই আনুষঙ্গিক দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তাহাদের অন্তঃকরণে বিষয়বতী প্রবৃত্তির প্রাধান্য অধিক বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গবিহিত স্বধর্ম্ম পালনই তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক কথায়, চিত্তে বাসনার বীজ যত দিন থাকিবে, ততদিন মনুষ্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

দেবীচৌধুরাণীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের প্রথম স্বামীসম্মিলন ঘটিল। একটি অপূর্ব্ব আনন্দ ভাব প্রফুল্লের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল। পতি ভক্তি রূপ যে চিত্ত বৃত্তি প্রফুল্লের অন্তরে অব্যক্ত ভাবে ছিল, তাহা এই পতিসম্মিলনে ফুটিয়া উঠিল। প্রফুল্ল কাঙ্গালিনী, প্রফুল্ল কখন ও কাহারও নিকট আদর পায় নাই সেই প্রফুল্লের স্বামী আজি আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখ চুম্বন করিল, প্রফুল্ল তখন মনে মনে ভবিতেছিল যে "বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।" এই দিন প্রফুল্ল যে সুখ অনুভব করিযাছে, তাহা সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই দিন প্রফুল্ল পতিভক্তি কি পদার্থ তাহা বুঝিল। এই পতিভক্তি বৃত্তিই প্রফুল্লের চিত্তের মূল প্রবৃত্তি, এই মূল প্রবৃত্তি অনুযাযী কর্ম্ম করাই অর্থাৎ পতিসেবায় জীবন যাপন করাই প্রফুল্লের ধর্ম্ম, এবং অহংকার শূন্য হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের নামই নিষ্কাম কর্ম্মানুচরণ।

এই বাবে মূল প্রবৃত্তি ও অহংকার এই দুইটি কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান প্রয়োজন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সুখানুযায়ী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একই রূপ বিষয়ে, সকলে কিছু সমান সুখ অনুভব করে না, সেই জন্য আমার যে বিষয় সম্পর্কে সুখ হয়, আর একজন তাহাতে যে কি সুখ আছে তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তের বর্ত্তমানবস্থায়, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর, ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আমার ভিন্ন ভিন্ন সুখের সংস্কার সকলের মধ্যে, বিশেষ কোন একটি সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়াঙ্কিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। যে সুখ ভাবনা উপস্থিত হইলে ইতর সকল সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় সেই সুখের প্রবৃত্তিকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। শত্রুর সম্পর্কে

আসিযা শক্রব সহিত যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনেব যে তৃপ্তিলাভ হইত, সেই সুখ সংস্কাব অর্জ্জুনেব চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাব মূল প্রবৃত্তি অনুযাযী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিহিত যুদ্ধকার্য্যই অর্জ্জুনেব স্বধর্ম্ম ছিল, ভগবান্ এই জন্যই তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পবামর্শ দেন নাই।

চিত্ত বড চঞ্চল পদার্থ, এক ভাবে স্থিব থাকিতে চায না চিত্তেব চাঞ্চল্য হেতু মনুষ্য তাহাব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতে পাবে না এবং সেই জন্য নানারূপ কষ্ট ভোগ কবিযা থাকে। এই জন্য জ্ঞানীগণ দুঃখ নিবৃত্তিব জন্য প্রথমতঃ চিত্তের চাঞ্চল্য দূব করিতে পবামর্শ দেন। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,

"তৎ প্রতিশোধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাস"।

চিত্তচাঞ্চল্য দূব কবিবাব জন্য কোন এক তত্ত্বে চিত্ত স্থিব বাখিতে সতত অভ্যাস কবিবে।

মূল প্রবৃত্তিতে চিত্ত স্থিব রাখায সেই প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যেরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রেরণ কবে তাহাই মনুষ্যেব স্বধর্ম্ম। মনে কর, শক্র সংহারে একজনের বড়ই আনন্দ হয, শক্র সংহারবাসনা তাহার মূল প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি তাহাকে শক্র সংহারে প্রেরণ করে এবং সেই জন্য শক্র দেখিলেই সংহার করাই কি তাহাব কর্ত্তব্য কর্ম্ম? শক্রসংহাব বৃত্তি মূল প্রবৃত্তি হইলেই যে শক্র দেখিলেই সংহার করিতে হইবে এরূপ নহে। যেখানে শক্র সংহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সেইখানেই কেবল তিনি তাঁহার চিত্তের বৃত্তি ব্যক্তভাবে প্রকাশ করিতে অধিকারী, অন্যত্র নহে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? আমি একটি চেতন জীব, যাহা চেতন জীবে আছে কিন্তু জড পদার্থে নাই তাহাই চেতন জীবের ধর্ম্ম। জড় পদার্থ সকলের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার স্বাধীন, ইচ্ছা আছে; এই

স্বাধীনতাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সাংখ্যকার কপিলদেব মতে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের সংযোগ দেখা যায়, এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং কেবল একমাত্র পুরুষই চেতন পদার্থ। এই সমস্ত জড় পদার্থের যে ক্রমপরিণাম দেখা যায় তাহা এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে হইতেছে। অর্থাৎ জড় পদার্থ আত্মবশে নাই কিন্তু পুরুষের যে সুখ দুঃখ ভোগ আছে ইহা তাহার আত্মাধীন পুরুষের সুখ-দুঃখ ভোগ তাহার নিজের কর্ম্মের অধীন এবং দুঃখ-নিবৃত্তিই সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ। দুঃখ নিবৃত্তি করা এবং না করা চেতন পুরুষের আত্মাধীন এবং এই হেতু পরবশ প্রকৃতিকে জড় এবং পুরুষকে চেতন পদার্থ বলা যায়।

আমার যে টুকু আমার নিজের বশে আছে সেই টুকুই চেতন পদার্থ, সেই টুকুতেই আমার আমিত্ব বা পুরুষত্ব আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতাই চেতনের ধর্ম্ম।

সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষ সংখ্যায় অনেক আছেন। আমি একজন পুরুষ, তুমি একজন পুরুষ, তিনি একজন পুরুষ ইত্যাদি। স্বাধীনতাই সকল পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম।

আমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করাই যেমন আমার পুরুষত্ব, সেইরূপ তোমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করা তোমার পুরুষত্ব। আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থাৎ আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার ও সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, সকল চেতন জীব মাত্রেরই এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। মনুষ্য সকল পরস্পর পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যে কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যধর্ম্ম। অর্থাৎ আমার যে ব্যক্তিগত স্বাধী-

নতা আছে, আমার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে স্বাধীন চেষ্টা আমার আছে সেই স্বাধীনতার একটি সীমা আছে, আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিতে গেলে যেখানে অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্র আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিবার স্থল নহে। আমার যে কর্ম্মে অন্যের সুখ দুঃখ জন্মে, সেই সুখ-দুঃখ-ভোগ যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী হয়, তবে আমার সেই কর্ম্ম অধর্ম্ম অর্থাৎ চেতন মনুষ্যোচিত কর্ম্ম নহে।

এইবাবে শত্রু সংহাব কোন স্থলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, কোথায বা অধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শত্রু যখন স্বেচ্ছায আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয তখন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওযা অধর্ম্ম নহে।

এইবাবে অহংকাব কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন,

"প্রকৃতেঃ ক্রিযমাণাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমার ইন্দ্রিয সকল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সাধিত হয, তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বাবাই সাধিত হয; কিন্তু আমি যে আমাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করি ইহাই অহংকাব। সত্ত্ব-রজঃ ও তম এই তিন পদার্থের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, পুরুষ সম্পর্কে প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওযায প্রকৃতির যে ভাবান্তব হয়, তাহার নাম মহৎতত্ত্ব অথবা বুদ্ধি।

এই বুদ্ধিব বিকারে অহংকার উৎপত্তি, ইহারা সকলেই জড পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে।

জড় পদার্থ কাহাকে বলে? যাহা পববশ তাহাই জড়পদার্থ। বাহ্য শক্তির বশে যাহা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। যোহিনী-

শক্তিব বশে (mesmeric powers) মুগ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মে প্রবৃত্তি আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এবং অহঙ্কাব বাহ্য শক্তির বশে চালিত হইযা থাকে। যাদু-করের ইচ্ছা শক্তির বশে মুগ্ধ ব্যক্তির মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পাবা যায়, এবং সেই মুগ্ধ ব্যক্তি এই শক্তিব বশে কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকায আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান কবে। কোন লোককে যাদুবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ কবিযা যাদুকর যদি মনে মনে তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয যে "তুমি অমুক দিন অমুক সমযে অমুক ব্যক্তিকে প্রহার কবিবে, ইহার যেন অন্যথা না হয," তবে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায যে, সেই ব্যক্তি সেই নির্দ্ধারিত সময়ে সেই ব্যক্তিকে প্রহাব করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, এবং কর্ম্ম সমাধা কবিযা আপনাকেই কর্ম্মেব কর্ত্তা জ্ঞান কবিযা থাকে। সে ব্যক্তি কেন ঐরূপ কর্ম্ম কবিল তাহা জিজ্ঞাসা কবিলে কাবণ কিছুই বলিতে পাবে না, কেবল এই মাত্র বলে যে ঐ কর্ম্মে তাহার একটা বড় ইচ্ছা হওয়ায সে ঐরূপ কর্ম্ম করিযাছে। সম্প্রতি ইটালিতে ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিযাছে শুনি-যাছি। একটি লোক খুন অপবাধে বিচারালযে আনীত হয, সে ব্যক্তি জানে যে সে খুন করিযাছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হইল যে যাদু বিদ্যায় পারদর্শী (mesmerist) কোন লোকের মোহিনীশক্তির বশে তাহার ঐ খুন করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইযাছিল। বিচারে সে ব্যক্তি খালাস পাইযাছে।

আমরা ও মানুষ মাত্রেই যে সকল নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাও একটা একটা মনের খেয়ালের বশে করিযা থাকি। এক এক সমযে অন্তরে এক একটা ভাব ফুটিযা উঠে এবং তাহারাই

ইন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়ম শৃঙ্খলা বশেই ঐরূপ ভাব সকল প্রকাশ পায়, তিনি আর আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করেন না। তখন তিনি কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারকে জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার অন্তরে কোন কর্ম্ম করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে বাহিরের কোন জড় শক্তির বশে তাঁহার এই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তাকে জড় শক্তি বুঝিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথক্ ভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই অহঙ্কার শূন্য। যিনি কর্ম্মের হেতু অহঙ্কারকে জড়শক্তি বশতাপন্ন পরবশ জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বাধীন আপনাকে চেতন পুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন অহঙ্কারের কর্ম্ম নিবন্ধন তিনি দায়ী হন না। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে নীত হইলেও তিনি খালাস পাইয়া থাকেন।

দেবী চৌধুরাণীর গ্রন্থকার প্রফুল্লকে এই নিরহঙ্কারিতা শিক্ষা দিবার জন্য পবিত্র যোগ শাস্ত্র ভগবদ্গীতাগ্রন্থ রহস্যবিৎ পণ্ডিত ভবানী ঠাকুরের কাছে জ্ঞান শিক্ষার্থে পাঠাইয়াছেন। কেন না, এই জ্ঞান না জন্মাইলে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্বমসি।

"তৎ-ত্বম-অসি" বেদের এই মহা বাক্যের প্রকৃত অর্থটি কি ইহা অদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদীগণের মধ্যে বিবাদ আছে, সে বিবাদ যেমন আছে তেমনি থাক, সে বিবাদ খণ্ডন করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নহে। আমি "তত্ত্বমসি" কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র স্বরূপ বুঝি।

তৎ-ত্বম-অসি অর্থাৎ তুমিই তাই। আমি যাবে খুঁজি, সে সুন্দরের সৌন্দর্য্যে আমি মিশিতে চাই, তুমিই তাই—এই জ্ঞানটি যিনি পরিস্ফুট করিতে শিখিয়াছেন, তিনি যথার্থ ভালবাসা শিখিয়াছেন, আমি বলি তিনিই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছেন।

"মনের মানষ খুঁজিতে এসে
হলেম দিশে হারা
প্রাণে মারা যাইলো শেষে"

বাউলদের এই একটি গান আছে। এই গানটির এই কথাগুলির ভিতর বড় গভীর ভাব আছে এই জীবনে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া অবধি সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি, কি যেন একটা বড়ই অভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিসে যে সে অভাব পুরিবে বুঝিতে পারিতেছি না। মাহশ্বেতার বিরহে পুণ্ডোরীর আচ্ছোদ সরবরের তীরে প্রাণ হারাইয়া পর জন্মে বৈশম্পায়ন নাম ধারণ করিয়া যখন ঘটনাক্রমে আবার সেই আচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল, মানুষ মাত্রেরই জীবনে সেই রকম একটা

ভাব অজ্ঞাত কারণ বশে মনের একটা চাঞ্চল্য ভাব সদাই বিরাজমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তবে কোন চিত্তে বা সেই ভাব প্রস্ফুটিত কোথাও বা লুক্কায়িত। মানুষের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ইহাই মনে হয়, যে এই সংসারে আসিয়া মনের মানুষ খুঁজিয়া লওয়াই মানুষের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষ খুঁজিতে জানেনা বলিয়া খুঁজিয়া পায় না, শেষে দিশে হারা হইয়া প্রাণে মারা যায়।

আমার মনের মানুষ আমার মনের ভিতর রহিয়াছে, আমি বাহিরে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু মনের ভিতর কখনও খুঁজি নাই তাই মনের মানুষ পাই নাই। তোমরা যদি কেহ মনের মানুষ খুঁজিবার জন্য অধীর হইয়া থাক, তবে অন্তরের ভিতরে অন্বেষণ করিতে থাক, ভিতরের অন্ধকার যতই দূর করিবে, ততই দেখিবে যে তোমার কল্পনাপটে একটি সুন্দর পুরুষের প্রতিবিম্ব ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। ইঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখ। এই দেবতাই তোমার মনের মানুষ, ইঁহাকে অন্তরের আড়াল করিও না।

মন্ত্রবলে মনোময় দেবতাকে শরীরী পদার্থে আবির্ভূত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। মনের মানুষকে যদি বাহিরে আবির্ভূত করিতে চাও তবে "তত্ত্বমসি" এই মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ।

কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বাঁধা থাকা নিবন্ধন, এজন্মে যাহা সঙ্গী হইয়া চিরজীবন কাটাইবে মনস্থ করিয়াছে, সেই মূর্ত্তি সমক্ষে রাখিয়া, তোমার ইচ্ছাবলে সেই মূর্ত্তিতে তোমার দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন ভাবিয়া লইয়া 'তুমিই সেই' 'তুমিই সেই' 'তুমিই সেই' এই মন্ত্র জপ করিতে থাকে। এই পূজা পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে তোমার দেবতা বাহিরে আবির্ভূত হইবেন।

মনের মতন সুন্দর বাহিরে মিলে না। যদি বাহিরের সুন্দরের সহিত কথা কহিতে সাধ থাকে তবে সুন্দর গড়িয়া লইতে হইবে। যাহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকিতে হয় কথোপকথন করিতে হয় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ থাকিলেও ভাল হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইলেও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। যদি কাহাকেও তোমার ভালর আদর্শের ন্যায় ভাল করিতে চাও তবে তাহাকে সেই রকম ভাল বলিয়া ভাবিয়া লইতেও হইবে। যাহাকে ভাল বলিয়া ভাবিলে, তাহার সহিত ব্যবহার, কথাবার্ত্তাও ভাল ভাবেরই হইয়া থাকে। আদর্শ সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে তুমি যেরূপ ভালবাসা মাখা কথাও ব্যবহার করিতে ভাল বাস, বাহিরের সঙ্গীর সহিতও যদি সেইরূপ ভালবাসা মাখা ব্যবহার ও কথা কহিতে শিখ, তবে তোমার সেই ভালবাসা, সেই কথা ও সেই ব্যবহারের গুণে তোমার সঙ্গী বদ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহাকে আস্তে আস্তে তোমার মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে সক্ষম হইবে। শেষে দেখিবে যে তোমার মনের মানুষ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবারে তুমি তাহাকে "তৎ-ত্বমসি" বলিয়া তোমার জীবনের চিরসাধ পুরাইতে সক্ষম হইবে। যিনি এইরূপ 'তত্ত্ব-মসি' শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই যথার্থ ভালবাসা শিখিয়াছেন।

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাকে ভাল ভাবিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব এরূপ ব্যবহার কপটাচার কি না? এরূপ ব্যবহারের ভিতর অসত্য আছে কি না? যদি কিছু অসত্য থাকে তবে এরূপ ব্যবহার কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে

এই জগতে মানুষ কখনও মন্দ হইতে পাবে না আমবা মানুষকে যে মন্দ বলিযা বুঝি সেইটিই আমাদেব ভ্রম, সেইটিই মিথ্যা। মানুষ মাত্রেই সুন্দর তবে নানাবিধ ময়লায় জড়িত থাকায় আদর্শ মানুষকে আমবা চিনিতে পারি না। কালা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্ত আছে, যিনি মুক্তার আদর বুঝেন তিনি এই ময়লা ঝিনুকেও আদর করেন।

যে ময়লায় মানুষকে কুৎসিৎ করে সেই মলাকে ঘৃণা কবিও কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করিও না। মানুষকে ভাল বাসিযা, মানুষকে আদর কবিযা, মানুষেব মনের ময়লা দূব করিতে সতত সচেষ্ট থাক।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয। তুমি যদি এক জনকে উন্নত দশায় তুলিতে সচেষ্ট থাক তবে কর্ম্মের ফলে তোমাব আপনার উন্নতি ক্রমশই সাধিত হইতে থাকিবে। পরকে আদর্শ পুরুষের ন্যায় সুন্দর কবিতে গিয়া আপনি সেইরূপ সুন্দর হইযা দাঁড়াইবে। 'তত্ত্বমসি' বলিতে বলিতে "সোহং" বলিতে শিখিবে, অর্থাৎ 'আমি যারে খুঁজি 'তুমিই সেই' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিবে যে আমি যারে খুঁজি আমি নিজেই সেই দেবতা।

"কমলাকান্ত একদিন কোকিলের ডাকে মুগ্ধ হইযা কোকিলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "তবে কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক দেখিরে। কর্ণ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পারিলাম না। যদি তোর ও ভুবনভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম।" আমি এই কথাগুলির উপর আরো দুটি কথা বেশী বলিতে চাই।

"শ্রোতা পাইনা বলিয়া কর্ণের চর্চ্চা কখনও হইল না, গলা সাধা হইল না বলিয়া আমার শ্রোতা ও জুটিল না, এখন কি করি কোকিল বল দেখিরে। পাখী তোর ডাকে ভালবাসা মিশান আছে, তাই তোব সুন্দর ডাকে লোকে আকৃষ্ট হয়, আর আমার নিরস কর্কশ কথা কেউ শোনে না, পাখী একটু ভালবাসা দে দেখিরে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বিবাদ, অনেক কাল হইতে চলিতেছে, এই বিবাদের গোড়াটি কোথায় ইহা একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম এই দুই এর মধ্যে আমাদের যে ভেদ জ্ঞান আছে ঐ ভেদ জ্ঞান নিত্য কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা ভ্রান্তি মূলক, এই ভ্রম দূর হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া, মুক্তি লাভ করিতে পারে।

"তৎ ত্বং অসি" বেদের এই মহাবাক্য অদ্বৈতবাদীরা যেমন মান্য করেন, দ্বৈতবাদীরা ও সেইরূপ মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা উহার যেরূপ অর্থ করেন দ্বৈতবাদীরা সেরূপ অর্থ করেন না।

বেদান্ত জ্ঞানাভিলাষী শিষ্য গুরুর নিকট যখন দীক্ষা লাভ করেন তখন গুরু তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম এই কথাটিতে অন্তরে কি অর্থ বোধ হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া শিষ্যকে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মন্ত্র আলোচনা দ্বারাই শিষ্য পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

অদ্বৈতবাদীদের মতে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মন্ত্রের অর্থ এই— তৎ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

তৎ ত্বমসি অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবেন যে আপাততঃ 'আমি" বলিলে আমাকে যেরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝি বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে, আপাততঃ আমি ব্রহ্ম কথার যে অর্থ বুঝিতেছি প্রকৃত পক্ষে আমিই তাই, কেবল ভ্রমবশতঃই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধিযুক্ত জ্ঞান করিতেছি। গুরুদেবের নিকট হইতে ব্রহ্ম বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান* লাভ করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও উপাধিশূন্য স্বরূপ বুঝিয়া "ব্রহ্মই আমি" এই ধ্যান করিতে থাকিব তাহা হইলেই ক্রমে ব্রহ্ম বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বৈতবাদীর মতে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ তৎ ত্বম্ অসি অর্থাৎ তস্য ত্বম্ অসি। হে শিষ্য তুমি তাঁহার। সত্য স্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তুমি সেই ব্রহ্মের ইহাও জানিও। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন, যে—সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মের সহিত আমি একটি নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। আমি তাঁহার। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের কোন না কোন সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত গাঁথা। তাঁহার সহিত আমার এই যে সম্বন্ধ এ সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ;

---

* যিনি মধু খাইয়াছেন তিনি যদি আমায় বলিয়া দেন যে মধু মিষ্ট দ্রব্য তবে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু মধু খাইয়া মধুর মিষ্টতা অনুভব করিলে পর, মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান।

আমি আমার নহি, আমি তাঁহাব। শুধু আমি নহি জীব মাত্রে সকলেই সেই আমি পুরুষের। আমি তাঁহাব তুমিও তাঁহার, গুরুদেব যিনি আজ এই উপদেশ দিলেন তিনিও তাঁহাব, ইহা বুঝিয়া আজি গুরুপদে নমস্কার করি।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে সেই ভেদ যদি নিত্য বল, তবে, জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপতঃ একটি ভেদ স্বীকার করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্যের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। "একমেবা দ্বিতীয়ং" কথার অর্থ এই যে, চৈতন্য পদার্থের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলে ও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগতে যাহা এক এবং অদ্বিতীয় তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে গেলে, সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ কি তাহাই অনুভব করিতে হইবে। যাহার পরিণাম আছে অর্থাৎ আজ যাহা এক রকম আকার ধারণ করে, অন্য সময় অন্য রকম আকার ধারণ করে তাহা এক এবং অদ্বিতীয় নাম পাইতে পারে না। এই জগতে যত জীব আছে এই জীব সমূহের মধ্যে পরস্পরের যে যে বিষয়ে বিভিন্নতা আছে সেই সেই বিষয় চৈতন্য পদার্থ নহে কিন্তু এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে বিষয়ে একতা আছে তাহাই চৈতন্য পদার্থ। এইরূপে, এক এবং অদ্বিতীয় কি তাহাই অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং দ্বৈতবাদী, জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে যদি পৃথক ভাবে ভাবেন তবে তিনি ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে কখনই সমর্থ হইবেন না। নিজের চৈতন্য সম্বন্ধেই মানুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব, কেন না পুরুষ নিজের চৈতন্যই নিজে অনুভব করিতে পারেন; চৈতন্য

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহে সুতরাং পরের চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং নিজের চৈতন্যকে ব্রহ্ম চৈতন্য-কে ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন ভাবিলে ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান কখনও সম্ভবে না। সুতরাং নিজের চৈতন্য বিষয়ক যে অপ-রোক্ষ জ্ঞান আছে অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞানকে, উপাধি শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া, উপাধি শূন্য চৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হয় না সুতরাং দ্বৈতবাদে মুক্তিলাভ হয় না। দ্বৈতবাদীর মতে, জীবের উপাধি নিত্য সুতরাং সেই উপাধি ঘুচাইতে দ্বৈতবাদীর চেষ্টা ও হয় না, অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যের জীব—উপাধি অজ্ঞান মূলক, আত্মজ্ঞান জন্মাইলেই সেই উপাধি ঘুচিয়া যায়।

'উপাধিগত ভেদ'—এই কথাটির অর্থ একটু বুঝান আবশ্যক। মনে কর একটী কাচের পুতুল আছে, কাচ এই কথাটীতে যাহা বুঝায়, কাচের পুতুল কথাটীতে তাহাই কিছু বুঝায় না, কিন্তু কাচ, ও কাচের পুতুলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, উপাধিগত একটি ভেদ আছে, এখানে কাচ-বস্তু পুতুল উপাধি পাইয়া অন্য অন্য কাচ হইতে একটু ভিন্নতা পাইয়াছে। সেই যাহার কোন বিশেষ নাম নাই তাহা উপাধিশূন্য কিন্তু যাহা কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে তাহাই উপাধি যুক্ত। যাহা না থাকিলে আমার 'আমি জ্ঞান' থাকে না তাহাই আমার চৈতন্য; যাহা না থাকিলে অন্যান্য জীবের 'এই আমি জ্ঞান'—'অস্তিত্ব জ্ঞান' থাকে না তাহা তাহা-দিগের চৈতন্য, ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে সেই আদি পুরুষ চৈতন্য ময় পুরুষ; যেখানেই চৈতন্য দেখিব সেইখানেই যখন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্রই এক তখন আমার চৈতন্য-

কে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ আমার অহংজ্ঞানের উপাধি আছে। আমি জানি যে আমি মনুষ্য, ইতর জন্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। আবার মনুষ্যের মধ্যে আমি একটী বিশেষ দেহ-ধারী মনুষ্য, অর্থাৎ এই দেহ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্য-দেহাধারী মনুষ্য হইতে আমার প্রভেদ জ্ঞান আছে সুতরাং আমার একটি বিশেষ নাম আছে। এই নামটিই আমার উপাধি। আমি এখন, 'আমি' কথায় যাহা বুঝি এবং ব্রহ্ম কথায় যাহা বুঝি এই দুইটী জ্ঞানের (Idea) মধ্যে প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ জ্ঞান নিবন্ধন এখন আমি, আমাকে ব্রহ্ম বলিতে পারি না এবং আমি, চেতন পুরুষ হইলেও, আমাকে জীব এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্ম নাম দিয়া থাকি। জীব যতদিন আপনাকে উপাধিশূন্য চৈতন্যময় পুরুষ বলিয়া না বুঝিবে ততদিন জীবের জীব উপাধি থাকিবে। ভেদ জ্ঞান হইতেই উপাধির সৃষ্টি। দ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যের সহিত জীব চৈতন্যের কোন ভেদ নাই কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত ভেদ আছে এবং সেই ভেদ নিত্য, সুতরাং জীব তাহার জীব উপাধি ত্যাগ করিয়া কখনও নিরুপাধিক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন জীব নিরুপাধিক না হইলে তাহার মুক্তি লাভ হয় না অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যাত্মা হইলে ও স্বর্গাদি ভোগের পর তাহার ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয়।

অদ্বৈতবাদী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথার যেরূপ অর্থ করেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্য সোপাধিক এবং ব্রহ্ম চৈতন্য নিরুপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা করা কিম্বা ঘুচাইয়া দেওয়াই পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটির কিরূপ অর্থ করেন তাহা

দেখা যাক্‌। দ্বৈতবাদী বলেন যে জীব নিয়ত উপাসক, বেদোক্ত দেবতা সকল উপাস্য পদার্থ। কিন্তু এই দেবতা সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হওয়ায় বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন, দেবতারা নিত্য পদার্থ নহে সুতরাং তাহারা নিত্য সুখ প্রদানে সক্ষম নহে, যে চৈতন্যের সত্বা নিবন্ধন দেবতারা কর্ম্মফলানুযায়ী সুখ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়াছে। দেবতা—উপাধিগত চৈতন্য অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষই নিত্য পদার্থ, জ্ঞানমার্গাবলম্বনে তাঁহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্য-ময় পুরুষ বিষয়ক মানসব্যাপারের নামই তাঁহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্রই সেই পুরুষের বাচক। ইহাই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথার অর্থ।

অদ্বৈতবাদী পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজেই নির্গুণ পুরুষের পদ পাইতে অভিলাষ করেন, দ্বৈতবাদী নিত্য নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইয়া উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে চাই" ইহাই দ্বৈতবাদীর মনের ভাব।

অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী উভয়েই বলেন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই অর্থাৎ জন্ম জরা মরণাদি ব্যাপার জনিত দুঃখভোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য পথ নাই। এখন একটি কথা ভাবিতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে সেইখানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয় ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। দ্বৈতবাদী বলেন যে যখন ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় বিষয় হইলেন

তখন ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইবে কে? অবশ্যই আমিই হইব। তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে পৃথক সম্বন্ধ, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক্ সম্বন্ধ রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্ম জ্ঞান থাকিবে সুতরাং ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য জ্ঞেয় হইলেন তাহা হইলেই ব্রহ্মের সহিত আমার একটি নিত্য ভেদ রহিল সুতরাং দ্বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ, তাহার অহংপদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাঁহার কাছে 'আমি' জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্ম জ্ঞান।

অদ্বৈতবাদী যে পদ্ধতির অবলম্বনে ধ্যান করেন তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই জ্ঞেয় বিষয়, অর্থাৎ জীব যে আমি তাহা কি পদার্থ তাহাই জ্ঞেয় বিষয়, এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অভেদ্য সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান।

গত বারের ভারতীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে "এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইয়া অহম্বৃত্তি একাকী থাকিতে পারে কি না? যদি বল "হাঁ পারে" তবে তুমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল "না—পারে না" তবে তুমি দ্বৈতবাদী। এই একটি হাঁ ও না'য়ের উপর অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ অবলম্বিত রহিয়াছে।" এই একটি 'হাঁ ও না'য়ের উপর 'অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ কেমনে অবলম্বিত রহিয়াছে তাহা একটু বুঝাবার চেষ্টা করিব। ইদম্বৃত্তি বলিতে আমার অহং প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যয়, এই ইদংবৃত্তি ছাড়া যদি অহংবৃত্তি থাকিতে না পারে তবে ধ্যানের যতই কেন উৎকর্ষতা জন্মাক না, অহংজ্ঞান

থাকিলেই অহংজ্ঞান ভিন্ন যে ইদং জ্ঞান তাহা থাকিবে সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের একটি প্রভেদ নিত্যই রহিল, শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ধ্যানের উপযুক্ত নহে কেন না ব্রহ্ম ভিন্ন আর সব অনিত্য পদার্থ সুতরাং ব্রহ্মই আমাদের নিত্য জ্ঞেয় এবং তাহা হইলেই 'অহং ও ব্রহ্ম' এই দুই এর একটি নিত্য প্রভেদ রহিল অর্থাৎ দ্বৈতবাদ সমর্থন হইল। কিন্তু যদি এমন হয় যে ধ্যানের চরম অবস্থায় 'আমি জ্ঞান' ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান না থাকিলে ও 'আমি জ্ঞান' থাকিতে পারে তবে অহং ও ইদম্ এর সহিত যে ভেদ তাহা অনিত্য হইল সুতরাং অদ্বৈত্যবাদীর মত সমর্থন হইল।

আমি এতক্ষণ দ্বৈতবাদীর কথা ও অদ্বৈতবাদীর কথা যাহা বলিলাম তাহার কাহার কথা সত্য কাহার কথা অসত্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই, কেন না কেবল তর্ক দ্বারা আমাদিগের ন্যায় লোক এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারেন না। 'তৎ ত্বমসি' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অর্থাৎ বেদকর্তা ঐ সকল কথায় ঠিক কি অর্থ যোজনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন সুতরাং আমরা কেবল ঐরূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের কথার উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াই ঐ সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিতে পারি। তাহার পর আবার,—সমাধির চরম অবস্থায় আমাদের অহং জ্ঞান অবলম্বন শূন্য অবস্থায়,—অর্থাৎ অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে কি না, এ কথার উত্তর পরমযোগী ব্যতীত আর কেহই দিতে সমর্থ নহেন সুতরাং এই সকল দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে মহাপুরুষ-

গণের বাক্যকেই প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।

পরম যোগী—পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে দ্রষ্টা তাহার নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে জীব চৈতন্য বলা হইয়াছে পাতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে তাহাকেই দ্রষ্টা নাম দেওয়া হইয়াছে। পরম যোগ সমাধা হইলেই দ্রষ্টা কৈবল্য পাইয়া থাকেন, এই যোগ কাহাকে বলে? যোগ-শাস্ত্রের ২য় ও ৩য় ও ধর্ম্ম সূত্র এই—

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। ১

চিত্তবৃত্তি সমূহের নাম যোগ।

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং ॥ ২

সেই সময় অর্থাৎ যোগবস্থায় দ্রষ্টা তাহার স্বরূপে অবস্থান করে।

বৃত্তি সারূপমিতরত্র ॥ ৩

অন্য সময় বৃত্তি সারূপ্য প্রাপ্ত হয়।

অনুমান বা শব্দ প্রমাণ পতঞ্জলি শাস্ত্রের ভিত্তি নহে, যোগমার্গ অবলম্বনে যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি জন্মে সেই সকল কথাই যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে যে সকল কথা আছে তাহা হইতে ইহা পাওয়া যায় যে চিত্তের বৃত্তি সমূহ নিবন্ধন দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব, যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা দ্রষ্টার স্বরূপ নহে; চিত্তবৃত্তি নিরোধাবস্থা পাইলে, দ্রষ্টা, উপাধিশূন্য হইয়া তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিতি করে। যোগমার্গ অবলম্বনে মনুষ্য যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন যে চিত্তের বৃত্তি সমূহের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়া যায় তখনই পুরুষ কৈবল্য পদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে

দেখা যাইতেছে যে পরমযোগী পতঞ্জলির কথায় জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য, এই উপাধি ঘুচানই মোক্ষ এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন প্রযোজনীয় তাহাই তাঁহার যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পতঞ্জলির কথা মানিতে হইলে বৈদান্তিক দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। সাংখ্যকার কপিলদেবের মতে পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মুক্ত, এই পুরুষতত্ত্বই তাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরম তত্ত্ব। দেহী অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও দেহাভিমান নিবন্ধন তাহার দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এ দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় অবিবেক নিবন্ধন, পুরুষ আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান করে, সেই অবিবেক দূর করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং সাংখ্যকার মতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, জীব যে আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান করে তাহাই তাহার বন্ধের হেতু সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করেন অথচ তিনি অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন যে পুরুষ অসংখ্য হইলেও, আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ, তিনি পুরুষ ইত্যাদি কাহারও মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে ব্রহ্ম স্তোত্র ইদানী ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করা হয় তাহাতে ও ব্রহ্মকে অদ্বৈত তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা আছে।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে জীব মোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম সারূপ্য লাভ করে, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা নিত্য নহে।

ব্রহ্মভূতং প্রসন্নাত্মা ন শোচন্তি ন কাঙ্খতি।
নমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যা মামেভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্বতঃ।
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥

গীতা, ১৮।৫৪ ৫৫।

ঈশ্বর ভক্ত শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ অর্থ করেন—

ব্রহ্মাহং ইতি নৈশ্চল্যনাবস্থানস্য কলমাহ ব্রহ্মেতি।

ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবাস্তুতঃ, প্রসন্ন চিত্ত, নষ্ট ন শোচতি ন চ অপ্রাপ্ত কাঙ্খতি দেহাদি অভিমানা ভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগ দ্বেষাদি কৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনা লক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে।

ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্বতো মামভিজানাতি কপস্তুতং যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দনন্তত্তাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে, পরমানন্দরূপো ভবতি।

'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে, নিশ্চল ভাবে অবস্থানের ফল বলিতেছেন। মনুষ্য ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলে কোন কারণে শোক করেন না এবং কিছুরই আকাঙ্খা করেন না। অতএব সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী হইয়া, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর ভাবনা রূপ যে ঈশ্বর ভক্তি, সেই পরা ঈশ্বর ভক্তি লাভ করেন।

আমি (ঈশ্বর) যেরূপে সর্ব্বব্যাপী এবং আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহা এই পরাভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারা যায়। ভক্ত এই-রূপে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া পরে সেই জ্ঞানের চরম অবস্থায় আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দরূপ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তি প্রধান শাস্ত্র ভগবদ্গীতা অনুসারে ও দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। গীতার কথানুসারে ভক্তের পরা-ভক্তির চরম ফল ব্রহ্মসারূপ্য লাভ এবং ইহাই মুক্তি। সুতরাং দ্বৈতবাদী যে বলেন যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য, সে কথা ঠিক হইতেছে না।

অদ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা হইল কিন্তু বিবাদের মূলটি কোথায় সেটি এখনও বলা হয় নাই।

দ্বিতীয়-প্রসঙ্গ।

মনুষ্য চিত্তের প্রীতিভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়, চিত্তের প্রীতিভাব দুই প্রকারের হওয়ায় সমাজে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বৈত-বাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

আমি যাঁহাকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি, তাঁহার আদর্শা-নুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভক্তি করি, সেই ভক্তি অদ্বৈতভাবের ভক্তি। দয়াবান্‌কে ভক্তি করি বলিয়া যখন নিজে দয়াবান্ হইতে ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন সেই ভক্তিকে অদ্বৈত ভাবের ভক্তি বলা যায়। এইরূপ স্থলে "দয়াবান্" হইতে চাই—এই সংবেগ অন্তরে উপস্থিত হয়।

কিন্তু দয়াবান্‌কে দয়াবান জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে দয়া পাইবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভাল বাসি, তাহা দ্বৈত -ভাবের ভক্তি। এই স্থলে ভক্তির আধারের যে নাম, ভক্ত সেই নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছুক নহেন, ভক্তির আধারের নাম "দয়াবান্" ভক্তের নাম "দয়াপ্রার্থী"। অদ্বৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির আধারের উপাধি এবং নিজের উপাধি এক করিতে চাহেন, কিন্তু দ্বৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির পাত্রের নামে নিজে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

তুমি একজন মহৎ লোক, যে যে গুণ আছে বলিয়া তুমি মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছ, আমাকে সেই সেই গুণে ভূষিত করিবার জন্য তুমি আমাকে যে স্নেহ করিবে, তাহা অদ্বৈত ভাবের স্নেহ। মনে কর তুমি স্বাধীন পুরুষ, তোমার মনের স্বাধীনতা আছে বলিয়া

তোমাব মাহাত্ম্য। তুমি যদি আমাকে স্বাধীন কবিবাব অভিলাষে আমাকে স্নেহ কর, তবেই তাহা অদ্বৈতভাবের স্নেহ। কিন্তু তুমি স্বাধীন অথচ আমাকে স্বাধীনতা দিবাব ইচ্ছা তোমাব নাই, আমি তোমার অনুগত বলিয়া তুমি আমাকে স্নেহ কব, তোমাব অধীন হইয়া থাকি, এই জন্যই তুমি আমাকে স্নেহ কর, এইরূপ স্নেহ দ্বৈত-ভাবের স্নেহ। তোমার "স্বাধীন" নাম এবং আমার "পবাধীন" নাম, এই দুইএব প্রভেদ দূব কবিবার জন্য যে ভালবাসা তাহাই অদ্বৈতভাবেব স্নেহ, কিন্তু যেখানে এই প্রভেদ দূব করিবাব অভিলাষ নাই অথচ ভালবাসা আছে, তাহা দ্বৈতভাবেব ভালবাসা।

আমি বাঙ্গালী, তুমি ও বাঙ্গালী, তোমার উপাধি এবং আমাব উপাধি সমান হওয়ায় আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহা দ্বৈত-ভাবেব প্রণয়। আমি বাঙ্গালী—হীনবল প্রজা, আর তুমি ইংবেজ প্রতাপশালী বাজা, অথচ তোমায় আমায় ভালবাসা আছে, আমি প্রতাপশালী বাজা হই--এ ইচ্ছা আমাব ও নাই, তোমার ও নাই, কিন্তু তথাপি আমি তোমাব প্রতাপে মুগ্ধ, সেই জন্য তুমি আমায় ভালবাস, এরূপ ভালবাসা দ্বৈতভাবেব ভালবাসা।

আমি ও যাঁহাব পুত্র, তুমি তাঁহাব পুত্র, এইজন্য তোমায় আমায় যে ভালবাসা—তাহা অদ্বৈতভাবেব ভালবাসা। ভ্রাতৃভাব অদ্বৈত-ভাবেব প্রীতি।

আমি পুরুষ এবং তুমি স্ত্রী, এইজন্য তোমায় আমার যে ভাল-বাসা—তাহা দ্বৈতভাবেব ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়েব ভাব দ্বৈত-বাদ। স্ত্রী ও পুরুষেব ভেদ জ্ঞান দূর হইলেই দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব দ্বৈতবাদ। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান দূব হইলেই দাম্পত্য প্রণয়েব ভাব অন্তব হইতে দূব হইযা যায।

পিথাগোরসের দর্শন মতে "এক" এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝায়, তাহাই "অদ্বৈতভাব" এবং "দুই" এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝায় তাহাই "দ্বৈতভাব।"

চিত্তে যখন দ্বৈতভাব প্রবল থাকে তখন মনুষ্য "আমি" ছাড়া আর একজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন চিত্তে মিথুন ভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায়—অর্থাৎ বৃত্তি যুগপৎ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী হইয়া চিত্তে উদয় হয়। যেমন এক খণ্ড, লৌহ চুম্বক প্রস্তরের নিকটেবাখিলে সেই লৌহটিতে মিথুন-ভাবাত্মক ম্যাগনেটিজম্ শক্তির প্রকাশ পায়, সেইরূপ সুখভোগ কামনা থাকায়, মনুষ্য চিত্তে মিথুনভাবাত্মক, দ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিত্তের এক প্রান্ত আত্মাভিমুখী ও অপর প্রান্ত বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। মানুষ তখন নিজেকে ও ভালবাসে এবং সুখপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাসে।

ভোক্তা ও উপভোগ্য এই দুইটি জ্ঞানের একটি জ্ঞান আর একটি ছাড়া থাকিতে পাবে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথার অর্থ নাই, এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে, ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটি এবং উপভোগ্য কথাটি একটি জ্ঞানের দুটি প্রান্ত স্বরূপ। চিত্তে দ্বৈতভাবের প্রীতি যখন দেখা যায়, তখন মানুষ নিজেকে প্রীতি সুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং সেই জন্যই "আমি" ছাড়া আর একজনকে উপভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন যে "চিনি হইতে চাই না মা চিনি খেতে চাই" এবং ইহাতেই দ্বৈতবাদীদের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। দ্বৈতভাবে ভক্ত হইয়া আপনাকে প্রীতিসুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন, সুতরাং তাঁহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থ স্বরূপ দেখিতেই ভালবাসেন।

আরাধ্য পদার্থকে ভাবনা করিয়া যে প্রীতিসুখ পাওয়া যায়, সেই সুখ-ভোগের জন্যই দ্বৈতবাদী আরাধ্য পদার্থকে দ্বৈতভাবে ভক্তি করেন। দ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম-প্রীতি সকাম কেন না দ্বৈতবাদী যদি নিজের মনের ভিতর ভাল করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি নিজেকে সুখভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং সেই সুখ ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে তাঁহার অভিলাষ না থাকাতেই তিনি জীবের জীব নাম ঘুচাইতে কখন ইচ্ছা করেন না। যতদিন আমি সুখ দুঃখ ভোক্তা, ততদিনই আমার জীব উপাধি থাকিবে, কেন না যিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন তাঁহারই নাম জীব। যাঁহার ব্রহ্ম-প্রীতি নিষ্কাম, তিনিই অদ্বৈতবাদী।

দ্বৈতভাবের ভালবাসা এবং অদ্বৈতভাবের ভালবাসার মধ্যে যেরূপ প্রভেদ আছে তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে কর দুইজন লোকে বেড়াইতে বেড়াইতে, একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইল, সেই পদ্মটির শোভায় ও সৎগন্ধে উভয়েরই মনে বড়ই তৃপ্তি উপস্থিত হইল, উভয়েরই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পদ্মটিকে দেখিতে লাগিল, সেই পদ্মটিকে দেখিতে দেখিতে একজন বলিল "দেখ ভাই এই পদ্মের সৎগন্ধে এরূপ মনোরম যে, দিবারাত্রি এই পদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা হয়।" অন্য জন বলিল যে "এই পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া যাই, ঐ পদ্মটি যেমন সরোবরে ফুটিয়া যেমন হাসিতেছে, ঐ রকম ফুটিয়া পদ্মফুল হইয়া থাকিতেই আমার ইচ্ছা হয়।" এই দুই জনের মধ্যে প্রথম জন পদ্মটিকে দ্বৈতভাবে ভাল বাসিয়াছেন, অন্য জনের ভালবাসা ভাবকে অদ্বৈতভাবের ভালবাসা বলা যায়। একজন পদ্মের সৌন্দর্য্যে তাঁহার অহংজ্ঞানটি মিশাইয়া দিতে ইচ্ছুক,

কিন্তু অন্যজন নিজের অহংজ্ঞান বজায় রাখিয়া পদ্মের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই অদ্বৈতভাবের প্রীতি, যেখানে নিজের পৃথক নাম বজায় রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই দ্বৈতভাবের প্রীতিতে মনুষ্যের মনে সুখভোগ বাসনা প্রচ্ছন্ন লুকায়িত থাকে, সেই জন্যই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীগণ দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এত তর্ক-বিতণ্ডা করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন যে "ব্রহ্মনাম" রূপ অগ্নিতে নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম নাম সমস্তই আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণাহুতি। দ্বৈত্যবাদী ও ব্রহ্মাগ্নিতে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আহুতি দিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটি দিতে চান না যাঁহারা দ্বৈতভাবের ভক্তি রসে সিক্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া, ব্রহ্মকৃপা প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিতেই ভালবাসেন কিন্তু অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবার জন্যই ব্রহ্ম নাম ভালবাসেন।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেদ সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে বেদ আজকাল আদরণীয় হইয়াছে কিন্তু সে আদরে আমরা সন্তুষ্ট নহি। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদকে যে ভাবে দেখেন হিন্দু পণ্ডিতগণ বেদকে সে ভাবে দেখেন না। প্রাচীন আর্য্যজাতি যখন সভ্যতার সোপানে প্রথম উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সময়কার কবির কাব্য বলিয়া ইয়ুরোপে বেদের আদর, কিন্তু হিন্দুরা ভাবেন যে বেদ আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত ব্রহ্মার বাক্য। হিন্দুরা ভাবেন যে বেদ জগতের সমস্ত তত্ব নির্ণয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্র। বাস্তবিক বেদ ঋষিগণের কপোল কল্পিত কাব্য না প্রকৃত সত্যমূলক বিজ্ঞান, এ বিষয়ে সকল হিন্দুরই একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বেদ হিন্দুর কাছে মহামান্য। বেদের এই মান্য আজ কতকাল ধরিয়া রহিয়াছে তাহা কেহই জানে না। বেদকে হিন্দুরা এত যে

মান্য করে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। কারণটা কি একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। সাধারণ হিন্দুজন সকলেই বলিবেন যে বেদ কি জিনিস তাহা আমরা কিছুই জানি না কিন্তু তথাপি বেদকে মান্য করিয়া থাকি। যাহাকে চিনি না তাহার কি গুণ দেখিয়া তাহাকে মান্য কর? এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু এই কথা বলিবেন যে, হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা সকলেই বেদকে সত্যমূলক বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছেন তাই আমরাও জানি যে ইহা সত্যমূলক। আমাদের দর্শন শাস্ত্র ত কবির কল্পনা নয় ইহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা বেদ বুঝি না বটে কিন্তু সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা কপিল যখন বেদ ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তখন তিনি যে বেদকে কবির কল্পনা বলিয়া বুঝেন নাই ইহা নিশ্চয়। সমাজ যাঁহাদিগকে সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিল তাঁহার সকলেই বেদকে সত্যমূলক বুঝিতেন তাই হিন্দু সমাজে বেদের এত মান্য প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সকলেই কি নিউটন বুঝিতে পারে কিন্তু নিউটনের আদর এখন চারিদিকে যেরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেইরূপেই বেদের আদর হিন্দু-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দু দর্শনকারগণ বিশেষতঃ মহাত্মা কপিল যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন ইহা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। এখন ভাবিতে হইবে কপিলদেব বেদকে সত্যমূলক সেই বুঝিয়া সেই বেদ ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার চিন্তা স্রোত চালাইয়াছিলেন, আর আজকালকার পণ্ডিতগণ সেই রহস্য বুঝিতে পারেন না বলিয়া বেদকে সে ভাবে দেখিতে পান না। হিন্দুদের কাছে

এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, গুরুদীক্ষা ব্যতীত লোকে বেদ রহস্য বুঝিতে পারে না, একথাটি যদি সত্য হয় তবে পাশ্চাত্যগণ যে প্রকৃত রহস্য বুঝেন নাই ইহা নিশ্চয়।

যাই হউক পাশ্চাত্যগণ বেদকে কাব্যস্বরূপ দেখিতেছেন বলিয়াই আমরা ও যে সেই ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিব ইহা আমাদের উচিত নহে। যখন আমাদের মধ্যে এই কথা প্রচলিত যে গুরুদীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত বেদ রহস্য বুঝিতে পারা যায় না,—তখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া বেদের কিছু রহস্য থাকে তাহা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া পরে বেদ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মনে কর একটি গোলকধাঁধা আছে সেই সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি চারিদিকে ব্যাপ্ত আছে যে তাহার মধ্যস্থলে এমন এক অপূর্ব্ব বাসস্থান আছে যে সেখানে যাইলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্থলে যে একবার গিয়াছে তাহার সাহায্য ব্যতীত অন্য কেহ পথ খুঁজিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন না। ঐ গোলকধাঁধাটি সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়া একদিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তুমি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলে সম্মুখেই ভিতরে ঢুকিবার একটি দ্বার রহিয়াছে। এখন বল তুমি কোন পথ পরিদর্শকের সাহায্য বিনা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে, এবং খানিক পথ যাইয়াই দেখিলে যে সম্মুখে পথ বন্ধ এবং সেই খানে কোন একটি ভাল রকম বসিবার স্থান আছে। এখন বল দেখি তুমি যদি বাহিরে আসিয়া বল যে গোলকধাঁধাটি সম্বন্ধে যা কিছু জনশ্রুতি আছে সে সমস্তই মিথ্যা, ভিতরে একটি বেশ বসিবার স্থান আছে এই পর্য্যন্ত, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে সুবিবেচকের কথা হয়

না। যখন সকলেই বলে যে উহার ভিতরে যাইবার পথ যে জানে তাহার সাহায্য ব্যতীত ভিতরে যাওয়া যায় না তখন প্রথমে সেইরূপ কোন লোকের সাহায্য লইযা তবে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে যাওয়া উচিত ছিল তাহাব পব তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে বাহিরে সেইরূপ বলিলেই ভাল ছিল। বেদ সম্বন্ধে আমি ও ঠিক ঐ কথা বলিতে চাই। তুমি আমি একটু সংস্কৃত শিখিয়া বেদ সম্বন্ধে যাহা বলিতে যাই সে কথার যে বেশী মূল্য আছে ইহা আমি মানিতে চাহি না। যিনি ঠিক পথ অবলম্বন কবিযা অর্থাৎ গুরু-দীক্ষা লাভ করিয়া বেদ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ কবিবেন তাঁহাব কথাই সবিশেষ মান্য।

বেদ সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে ঋষিগণ যে অবস্থায যোগারূঢ হইয়া থাকিবেন বেদমন্ত্র সকল সেই সময তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয। এবং যিনি সেই যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিযাছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহই বেদ মন্ত্রেব প্রকৃত বহস্য বুঝিতে সক্ষম নহেন। এই সকল কথা গুলির বিষয় মনোমধ্যে একটু ভাবিযা তবে বেদ সম্বন্ধে কথা কহা সকলেবই উচিত।

ম্যাক্সমূলর বেদের যে সকল অংশ বুঝিতে পারেন নাই সেই সকল ভাগকে Theological twaddle অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বসম্বন্ধীয় বাজে কচকচি বলিয়া বুঝিয়াছেন। আমাদেব কাব ভাবত চন্দ্র যদি ইংরাজী শিখিয়া নিউটনের principle পড়িতেন তবে তিনি ও হয়ত বলিতেন যে উহার ভিতর কিছুই নাই কেবল বাজে কথা আছে। কবি না হইলে কবির কথা বুঝা যায না, বিজ্ঞান না শিখিলে বৈজ্ঞানিকেব কথা বুঝিতে পাবা যায না, সেইরূপ ঋষি

হইতে না শিখিয়া যিনি ঋষিদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চান তিনি মূর্খ।

মনে কর তুমি এই ১৮৮৫ সালের এক দিনকার খবরের কাগজে দেখিলে যে War between the Lion and the Bear is expected in winter, তুমি যদি ইহা হইতে বুঝ যে কলিকাতায় জিওলজিক্যাল বাগানে শীতকালে সিংহের সহিত ভল্লুকের যুদ্ধ প্রদর্শনী হইবে তবে তুমি লেখকের ভাব কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলে না। পলিটিকসের ভাষায় এখানে সিংহ অর্থে ইংলণ্ড এবং ভল্লুক অর্থে রুষিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ ঋষিদের ভাষার কি কথায় কি ভাব বুঝায় তাহা না শিখিয়া বেদ বুঝিতে চেষ্টা করিলে তুমি যে বেদের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয়।

ঋষি দীক্ষিত কোন লোকের সাহায্যে বেদ সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনের ভাব জন্মিয়াছে, সেই ভাব অবলম্বন করিয়া আমি বেদ সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে চাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমন জড় জাতীয় শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে সেইরূপ বেদ মনোময় জগতের-শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের দেবতা সকল মনোময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। জড় বিজ্ঞানে যেমন শিক্ষা দেয় যে ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগনিটিজম্, তেজ প্রভৃতি ভিন্ন প্রকারের শক্তি সকল কোন একটি শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, সেইরূপ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে মনোময় জগতের যে সকল শক্তি কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যক্ত হইয়া থাকে সকলই সেই এক ব্রহ্ম-শক্তির রূপান্তরিত অবস্থামাত্র।

হিন্দুধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে, যে সকল জড়শক্তির ক্রিয়া জড়-জগতে দেখিতে পাই তাহারা আবার মনোময় জাতীয় শক্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই জন্য আর্য্য ঋষিগণ জগৎ-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমে মনোময় জগতে প্রবেশ করিয়া সেইখানকার শক্তি-তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বেদ এই আলোচনার ফল।

বেদের এক একটি মন্ত্র কোন না কোন মনোময় শক্তি বিষয়ক সত্যমূলক কথা, যেমন কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ঠিক করিয়া বুঝিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয় এবং কিরূপে সেই পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা বিজ্ঞান শাস্ত্রে লিখিত থাকে সেইরূপ বেদের মন্ত্রমূলক সত্য সকল পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিবার জন্য বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে সেই সকল পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্যগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ সম্যক্ আলোচনা না করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ বুঝিতে গিয়াছেন তাই বেদের প্রকৃত অর্থ কিরূপ তাহার আভাস পর্য্যন্ত পান নাই।

বেদ মনোময় জগৎ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, এক্ষণে মনোময় জগৎ কথাটির অর্থ একটু বুঝান চাই। যাহা চক্ষু আদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই স্থূল জড় জগৎ, কিন্তু যাহা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে অথচ অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে তাহাই সূক্ষ্ম জাতীয় বিষয়। এই সূক্ষ্ম জগৎকেই মনোময় জগৎ বলিয়া আসিয়াছি। ভারতীতে 'মনের কথা জানা' নামক প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি মনোময় জগৎ কিরূপ তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। একজনের মনের ভাব আর একজনের বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর নহে কিন্তু আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় স্ফুরিত হইলে উহা যে সেই অন্তরেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে ইহা আজ-

কাল পাশ্চত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কেহ কেহ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা স্থূল ইন্দ্রিয় সকল যখন চালনা করি তখন যে শক্তি ব্যয় করি বাহ্য জগতে সেই শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেই জন্যই বাহ্য জগতে স্থূল শক্তির আধার আছে ইহা বুঝিতে পারি। আমাদিগের কর্তৃক প্রযুক্ত শক্তির ক্রিয়া যাহাতে লক্ষিত হয় তাহাকেই আমরা পদার্থ (matter) বলিয়া বুঝি। হাত নাড়িলাম, একটি স্থূল শক্তি ব্যয় করিলাম, দেখিলাম সেই শক্তির বলে একটি ভাঁটা গড়াইয়া গেল, তখন বুঝি যে ভাঁটা একটি পদার্থ। কিন্তু আমরা ইচ্ছা প্রকাশ, মনে মনে বিচার কার্য্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিবার সময় যে শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি বাহ্য জগতে তাহার কোন ক্রিয়া দেখিতে পাই না, সেই জন্যই বাহ্যজগতে যে আবার মানসিক শক্তির আধার ক্ষেত্র আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত 'মনের কথা জানা' নামক প্রস্তাব যাঁহারা একটু যত্নের সহিত পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত পক্ষে আমার মানসিক কার্য্য করিবার সময় ব্যয় করিয়া থাকি তাহা যে অমনি আমার মনেই লয় পায় তাহা নহে। বাহ্য জগতে মনোময় শক্তির আধার আছে এবং আছে বলিয়াই অন্তরেন্দ্রিয় বিকাশ হইলে একজন আর একজনের মনের ভাব মনের সাহায্যে বুঝিতে পারে। এই মনোময় শক্তির আধার ক্ষেত্রকেই মনোময়জগৎ কহে (The substratum of thought energy)। স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ ও সেইরূপ সত্য। ঋষিগণ আপন আপন সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ সাধন করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্মজগতের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বেদ সেই আলো-

চনার ফল। আমাদের এই ইন্দ্রিয় লইযা বেদেব প্রকৃত অর্থ কেমন করিয়া বুঝিব।

যে জন অন্ধ তাহাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়েব প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। বাহেন্দ্রিয হইতে মনকে যতই সরাইযা লইবে ততই অন্তরেন্দ্রিযের বিকাশ হয। স্বপ্নাবস্থায় যখন বাহ্য ইন্দ্রিয সকল বিশ্রাম করে সেই সময় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিযেব সাহায্যে আমবা আমাদের নিজের নিজের মনের ভাবের রূপ রসাদি প্রত্যক্ষ কবিযা থাকি কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় আমবা নিদ্রিত থাকি স্বপ্নরহস্য কিছু বুঝিতে পারি না। নিদ্রিতাবস্থায় যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমবা আমাদেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিতে সক্ষম হই না, যেরূপ ভাবে দেখিযা পদার্থ -তত্ত্ব আলোচনা কবিতে হয সেরূপ ভাবে স্বপ্নেও সক্ষম হই না— কিন্তু যেজন জাগ্রত থাকিযা স্বপ্ন দেখিতে শিখিযাছেন তিনিই মানসিক তত্ত্ব আলোচনা কবিবার পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিযাছেন। প্রথমে স্বপ্নাবস্থায ইচ্ছা প্রকাশ কবিতে শিখিতে হইবে, স্বপ্নাবস্থায বিচাব করিতে শিখিতে হইবে, তবে বেদ-রহস্য বুঝিতে যাওযা উচিত। এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নবস্থায থাকিযা কোন এক বিষয় আলোচনা করিবাব জন্য চিত্ত স্থিব করাব নামই সবিকল্প সমাধি যোগ। ঋষিগণ এইরূপ যোগাবস্থায আরূঢ় হইযা জগতেব মনোময রাজ্যে বিচবণ করিযা বেদ প্রণযন করিযা গিয়াছেন। ঐ অবস্থায উপনীত হইযা বেদের একটি মন্ত্র লইযা আলোচনা করিযা দেখিলে বেদে কিরূপ সত্য আছে তাহা বুঝিতে পারিবে।

হিন্দুবা বরাবর এই কথা শুনিয়া আসিতেছে যে মন্ত্রসিদ্ধ হওযা কথাটা বড সহজ কথা নয়। কত কত যোগীর সমগ্র জীবন

অতিবাহিত হইযা গিযাছে অথচ কোন একটি বিশেষ মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ইচ্ছা করিলেই অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম হওয়াব নামই মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া। সুতরাং ম্যাক্সমূলবেব ভাষ্য দেখিয়াই বেদ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইযাছি এরূপ মনে করা আমাদেব কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুদের এখন আর কিছুই নাই, হিন্দুদের সমাজ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের সব লোপ পাইযাছে, কেবল বাহিবেব অঙ্গহীন অস্থিচর্ম্ম সাব দেহটি আছে। তবে যে হিন্দু সমাজ এখন ও বাঁচিযা আছে। ইহাব কারণ এই যে, হিন্দুদেব ঋষিদের নামে এখন ও ভক্তি আছে। সেই ঋষিদের অসভ্য রুষক বলিযা যদি কেহ বুঝাইতে চান, হিন্দু ধর্ম্মেব গোড়া বেদকে যদি কাব্য বলিযা কেহ প্রতিপন্ন করিতে চান তবে তিনি যে অস্থিচর্ম্ম সার হিন্দুসমাজের প্রাণহানিব চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিশ্চয। হিন্দু সমাজের বন্ধন ধর্ম্ম পলিটিকল্ ন্যাসনালিটি ইত্যাদিব বন্ধনে হিন্দুসমাজ টেকিবে না, তাই বলি ঠিক না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া যা মনে আসিল বলিযা ফেলিযা গাববেব সর্ব্বনাশ করিবাব চেষ্টা কেহ যেন না করেন। বেদে যে অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি দেবতাব কথা আছে তাহারা মনোময জগতেব শক্তি সকলেব ভিন্ন নাম। মনোময় জগতের সূর্য্যদেবেব নাম সূর্য্যদেবতা। মনোময় জগতে আবার অগ্নি সূর্য্য কি কথা। বেদের একটি মন্ত্র লইযা ইহা বুঝাইতে চাই।

ব্রাহ্মণেব প্রথম দীক্ষা-মন্ত্র গাযত্রীমন্ত্র ইহাব দেবতা জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য। এই মন্ত্র ও এই মন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে আমি যেরূপ অর্থ বুঝি তাহা কথঞ্চিৎ বুঝাইতে চাই।

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধীযোযোনঃ প্রচোদযাৎ।"

আইস সেই দীপ্তিমান্ সবিতা দেবের বরণীয় ভর্গ আমরা চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রদান করিবেন"।

বাহ্য জগতে সূর্য্য উদয় হইলে উহার জ্যোতি আমরা চক্ষে দেখিতে পাই উহার তেজ আদি অন্যান্য গুণ আমাদের ত্বগেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যোগী যখন বাহ্য-ইন্দ্রিয় হইতে মন সরাইয়া লন, যখন তিনি স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হন তখন বাহ্যজগতীয় সূর্য্য তাঁহার নয়নগোচর হয় না, কিন্তু সেই অবস্থায় থাকিয়া যে মানসিক শক্তির সাহায্যে তিনি অন্তর-চক্ষুর সাক্ষাতে সূর্য্যতেজ প্রকাশিত দেখিতে পান, অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার সূর্য্য সম্বন্ধীয় গুণ সকল যেমন প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থায় যখন ঠিক সেই সকল গুণ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে তখন যে মানসিক শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই সূর্য্য দেবতা শক্তি। যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া বৃক্ষাদি পদার্থ সকল আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয় যখন দেখিবে যে অন্তর্জগতীয় পদার্থ সকল সেইরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, তখনই অন্তরে সূর্য্যদেবতার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। বাহ্য জগতের সূর্য্যালোকের গুণ মানুষকে জাগাইয়া রাখা, সূক্ষ্মজগতের সূর্য্যের গুণ যোগীকে স্বপ্নাবস্থায় জাগাইয়া রাখা। যোগী বাহ্য-ইন্দ্রিয় হইতে মন সরাইয়া লইয়া যে সময়ে যে মানসিক শক্তির সাহায্যে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ও বিচার ক্ষমতা প্রবুদ্ধ থাকে সেই মানসিক শক্তির নামই সূর্য্য-দেবতা। এই দেবতাকে চিন্তা করিলে, এই দেবতার সাহায্য পাইলে অর্থাৎ মানস ক্ষেত্রে সূর্য্য দীপ্তি

প্রকাশিত করিয়া জাগ্রত থাকিতে শিখিলে ধীশক্তির প্রকাশ পায়। সাধারণ স্বপ্নাবস্থায় ধীশক্তির বিকাশ থাকে না, কিন্তু সূর্য্যদেবকে চিন্তা করিয়া বিচার শক্তি প্রবুদ্ধ রাখা যায়, তাই সবিতা মন্ত্রে "ধীয়োযোন প্রচোদয়াৎ" সত্য মূলক কথাটি সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু বেদের সূর্য্য-দেবতাকে যিনি জড়জগতীয় সূর্য্য বিবেচনা করেন তিনি এই 'ধীযোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' কথাটিতে একটুখানি কবিত্ব বই আর কি দেখিতে পাইবেন?

বেদ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে আর বেশী কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। উপসংহারের বক্তব্য এই যে, ঋষিদের গুপ্ত -ভাণ্ডার ঋষিদের সাহায্য বিনা খুলিতে চেষ্টা করা রথা শ্রম মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতি।

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ॥
অজা যে তাং জুষমানাঃ ভজন্তে।
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্॥

(অন্বয়—লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং একাং অজাং প্রকৃতিং নমামঃ। যে অজাঃ পুরুষাঃ জুষমানাঃ সন্তঃ তাং প্রকৃতিং ভজন্তে তে এনাং প্রকৃতিং জহতি। ভুক্তভোগান্ তান্ পুরুষান্ নুমঃ)।

(লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা (সত্বরজ ও তমগুণময়ী) বহু প্রজাপ্রসবিণী জন্মরহিতা একা প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। যে সকল পুরুষেরা এই প্রকৃতিকে ভক্তিভাবে ভজনা করেন তাহারাই ইহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ভুক্তভোগী (যাঁহাদের ভোগের অবসান হইয়াছে) এই সকল মুক্ত পুরুষগণকে আমরা নমস্কার করি। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর টিকাকার উপরে লিখিত নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা ও সেই নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সম্বন্ধে গুটি কত কথা বলিব।

এই জগতে নিত্য পদার্থই কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি

ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই নিত্য পদার্থ কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি অচেতন। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে অচেতন বলায় অনেকে প্রকৃতিকে, জীবন শূন্য জড়পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্রের ন্যায় ভাবিয়া থাকেন কিন্তু সাংখ্য দর্শনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহা বুঝা যায় যে প্রকৃতি জীবন শূন্য নহেন।

প্রকৃতি কখনও পুরুষছাড়া থাকে না সাংখ্য দর্শনে এই একটি বিশেষ স্মরণ রাখিয়া তবে সাংখ্য দর্শনের "প্রকৃতি অচেতন" এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। দেহ ও দেহীর যে সম্বন্ধ উহাই প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। ওই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী সম্বন্ধ।

আমার এই যে একটি দেহ আছে, আমি জানি যে উহা আমার দেহ, আমি এই দেহের স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ এই দেহের স্বামী। দার্শনিকগণের ভাষানুসারে এই দেহের যে সত্ব আছে উহার স্বামীত্ব আমাতে আছে। দেহের সাহত চেতন জীবের এই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী সম্বন্ধ। সেই জন্য গীতা শাস্ত্রে চেতন জীবকে দেহী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহ শব্দের উত্তর স্বস্বামী সম্বন্ধে ইন্ প্রত্যয় করিয়া দেহী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেহের সহিত দেহীর এই স্বস্বামী সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মায় ইহাই সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের মূল কথা। এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। স্বস্বামী সম্বন্ধ কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। একজন লোকের একখণ্ড ভূমি আছে এ লোকটি ঐ ভূমিখণ্ডের স্বত্বাধিকারী,

অর্থাৎ ঐ ভূমিতে যে স্বত্ব আছে, তিনি সেই স্বত্বের স্বামী। এই স্বত্বাধিকারীত্ব নিবন্ধন উক্ত ভূমিজাত যাবতীয় ভোগ্য বস্তুতে সেই ব্যক্তিরই অধিকার। উক্ত ভূমিখণ্ডের যে ভোগ্য উৎপাদিকা শক্তি আছে উহাই ভূমির স্বত্ব বা স্বভাব এবং ভূস্বামী সেই স্বত্বাধিকারী। ভূমির সহিত ভূস্বামীর এই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী-সম্বন্ধ। আমার এই যে দেহ আছে এই দেহের সহিত আমি ঐরূপ স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত আছি, এই জন্য এই দেহ সম্ভূত সুখ ও দুঃখাদি "আমি" ভোগ করিয়া থাকি, এই দেহে যে শক্তি থাকা নিবন্ধন ইহা হইতে সুখ দুঃখাদি উদ্ভূত হইয়া পুরুষের ভোগ সম্পাদন করেন উহাই দেহের স্বত্ব বা স্বভাব, দেহ এই স্বত্বাধিকারী। দেহের জীবন শক্তিই এই সুখদুঃখ প্রদায়িনী-শক্তি। যিনি এই শক্তির স্বামী সাংখ্য দর্শন মতে তিনিই চেতন। যাহাতে স্বামীত্ব বিদ্যমান সাংখ্য দর্শনে তাঁহাকেই চেতন বলা যাহাতে স্বামীত্ব না থাকিয়া কেবল স্বত্ব বিদ্যমান তাহাকে অচেতন বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বামী উপমায় উৎপাদিকা শক্তিশালী ক্ষেত্র যেমন অচেতন পদার্থ এবং ক্ষেত্রস্বামী চেতন পদার্থ দেহ ও দেহী-সম্বন্ধে ও সেইরূপ. জীবনী-শক্তিবিশিষ্ট সজীব দেহকে সাংখ্যদর্শনে অচেতন বলা হইয়া থাকে এবং দেহীকে চেতন বলা হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দেহও দেহীর যে সম্বন্ধ উহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। আমার দেহ একটি নশ্বর ক্ষর পদার্থ, সেইজন্য এই দেহস্বামী যে আমি, সেই "আমি" ও ক্ষর পদার্থ। যতক্ষণ এই ক্ষরদেহের স্বামী বলিয়া আমাকে বুঝিব

ততক্ষণ আমি চেতন পুরুষ বটে কিন্তু ঐ চেতন ভাব ক্ষর ভাব, ততক্ষণ আমি ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ জীব।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোক্ষর উচ্যতে॥

গীতা

এই ক্ষর পুরুষ ভাব ভিন্ন আর এক পুরুষ ভাব আছে যাহা অক্ষর ভাব। এই অক্ষর পুরুষই নিত্য প্রকৃতির সহিত স্বস্বামী ভাবে সম্বন্ধ। বিশ্বের যাবতীয় শক্তির একমাত্র আধার স্বরূপ অনন্ত অসীম যে ক্ষেত্র সমস্ত জগদীশ্বর—রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, এই জগতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর, যাহা-কিছু আছে সমস্তই এই একাধারে ভাষমান হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকৃতি যাঁহার দেহ, এই প্রকৃতির সহিত স্বস্বামী ভাবে যিনি যুক্ত, তিনিই অক্ষরপুরুষ। এই অক্ষর পুরুষকে ছাড়িয়া যদি কেহ এই একার্ণব সমুদ্ররূপা জগদাদিকারণ প্রকৃতিকে ভাবিতে চান তবে তিনি তাঁহার মনের সমক্ষে এক মহান্ধকারময় বিস্তৃত জড়পরমাণুর সমুদ্র ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিবেন না কিন্তু যিনি এই প্রকৃতিকে পরম জ্যোতির্বিন্দুরূপ অক্ষর পুরুষের সহিত স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত বলিয়া বুঝিয়া সেইরূপে তাঁহার ধ্যান করেন, প্রকৃতি তাঁহার কাছেই আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকৃতি তখন কথা কন।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়পরমাণুর এক চরম সূক্ষ্ম অবস্থাকে (The ultimate essence of matter) জগতের আদিকারণ বলিতেছেন। হারবার্ট স্পেন্সার এই জড়ের চরম সূক্ষ্ম

অবস্থাকে জ্ঞানের অগম্য অব্যক্ত পদার্থ (The unknown and unknowable) বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে জড় এবং অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্যের কথা এবং পাশ্চাত্য জড় পদার্থের কথা একই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের ভিতর প্রবেশ করিলে তাঁহাদের এই ভ্রম দূর হইবে। যে চেতন অক্ষর পুরুষবাদ সাংখ্যের মূল ভিত্তি, সেই টুকুই পাশ্চাত্য জড়বাদে নাই এবং সেইজন্য সাংখ্য দর্শনে ও পাশ্চাত্য জড়বাদে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যের আকাশে সূর্য্য আছেন, পাশ্চাত্য জড়বাদীর পাতালে কেবল অন্ধকার।

সাংখ্যের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সঙ্গে একত্রে ভাবিতে হইবে, নচিলে প্রকৃতি কথার অর্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। প্রকৃতিকে চেতন পুরুষের সহিত যাঁহারা সম্পর্ক শূন্য ভাবেন, তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্র কথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতের মূল কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া Chaotic cosmic matter কে জগতের আদি কারণ বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কথার সেরূপ জড়পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদিশক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্বরজ-তম শক্তি, কথা সেরূপ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তি আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মধ্যে বড় একটি প্রভেদ আছে, এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আর প্রাচীন পণ্ডিতগণের শক্তি কথার এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকাল-

কার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা ভাবেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ সূত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়াছেন. শক্তি কথার সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে আসিত, কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যখন তড়িৎ শক্তির কথা ভাবেন তখন বাহ্য জড়পদার্থের উপর তড়িৎশক্তির যেরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উদয় হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎশক্তির কথা ভাবিতে গেলে ঐ শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সুখপ্রদ কি দুঃখপ্রদ, যদি সুখপ্রদ হয় তবে সে সুখ কোন জাতীয়. যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সেই দুঃখই বা কোন জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। ইংরাজী Force কথার অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force জড়ের গতি কারণের নাম Force। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের নাম শক্তি। জীব নামধারী যে "আমি" সেই আমার যে অবস্থান্তর হয় সেই পরিবর্ত্তনের কারণকেই হিন্দুশাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই সমস্ত কারণে সাংখ্য—যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্ত্তে ইংরাজী force বা energy কথা ব্যবহার করিতে একটু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়, সাংখ্য দর্শনের এই কথাটি বিজ্ঞান যত দিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন ঐক্য হইবে না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি Chaotic cosmic matter নহে কেন না সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের

আভায় আভাম্বিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি উপাধি অভিমানী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের Chaotic cosmic matter নির্জীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বটে কিন্তু সজীব। আমার সত্তানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড়পদার্থ সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সত্তানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণের মতে এই জগত কাহা-রও সঙ্কল্প প্রসূত নহে। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা-যায়, এই যে বাহ্য জগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থার বীজ স্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদিপুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাংখ্য দর্শন অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিপুরুষের অন্তঃ-করণের যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ, চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরি-ণামি কূটস্থ, যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতেছে, কিন্তু নিত্যপুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হন নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারেন না এবং এইজন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির প্রথমাবস্থা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। পরমাণু সকল ঘুরিতেছে নড়িতেছে একটি অপ-রটি কে আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসি-তেছে, পরমাণু সমুদ্রে নানারূপ আবর্ত্ত ঘুরিতেছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শন আলোচনা করিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায় যে

সময মহৎ-তত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইযা সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ম্ময় তেজঃপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন, প্রকৃতিব গুণক্ষোভ হওযায তাঁহাব অন্তরে জ্ঞানময় ভাবেব স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টিব প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন পুরুষকে ধ্যান নিমগ্ন করা-নই তাঁহাব শক্তির ক্রিযা এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধি তত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব প্রসব করিল এবং এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিল।

এইরূপে যখনই একটু ভাল করিযা ভাবিযা দেখা যায তখনই ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায যে, সাংখ্যকার সৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইযাছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণ সে দিক দিয়াও যান নাই।

সাংখ্যকাব প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিযা অভিহিত করিযাছেন। এই জড় কথা আব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব Inanimate matter একার্থ বোধক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্য নহেন, পুরুষ সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পান না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুঝিতে পাবেন কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুঝিতে পারেন না এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায।

কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায, কেন না উহাব জন্ম বৰ্দ্ধন অবস্থান্তর পরিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্যা হইলেও উহার ক্রম পরিণাম আছে, এবং সেই ক্রম পরিণাম প্রকৃতি অভ্যন্তরস্থ শক্তিববশে একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিযা প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায। যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই প্রকৃতির অন্তর্বাহী শক্তি বলিযা বর্ণনা

করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও ক্রমপরিনাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্য মরণ ও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universe কে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরাপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাম।
জীব ভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্য্যতেজগত।

গীতা ৭।৫

ইহ হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থা শক্তি। ইয়ুরোপে একসময় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়কার দার্শনিকগণ Animusmundi (The universal life) অর্থে যাহা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কথারও তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হইতে প্রথমে যে জীব উৎপন্ন হয় তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিন্দ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এইকথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যবে প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা এই,-

সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ।

প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে সত্ত্ব রজ ও তমো গুণ কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া ঐ ত্রিগুণের সমতা কিরূপ তাহা ধারণা করিতে হইবে। যে পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে এই ত্রিগুণের সমতা

উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারই চিত্তক্ষেত্রে প্রকৃতির সারূপ্য লাভ করিয়াছে। ত্রিগুণের সাম্যভাব যাঁহার চিত্তে সদাই বিদ্যমান তিনিই শান্ত তিনিই শিব। এবং এই শিবের চিত্তক্ষেত্রই প্রকৃতি।

সত্ব রজঃ ও তম গুণের অর্থ গীতাতে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই এই খানে উদ্ধৃত করিলাম।

সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যযম্ ॥৫
তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম ॥৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮
সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯
রজস্তমশ্চাভিভূয সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বংতমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদাতদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥১১
লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশম স্পৃহা।
রজস্যেতানি জাযন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২
অপ্রকাশোপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ।
তমস্যেতানি জাযন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩
ভগবদ্গীতা ১৪শ অধ্যায়।

সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারাই অব্যয় দেহীকে (চেতন আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময়, নির্ম্মলতা হেতু এই সত্বগুণ দেহীকে সুখ সঙ্গে এবং জ্ঞান সঙ্গে বদ্ধ করে।

রজঃগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা সঙ্গ হইতে সমূদ্ভূত, এই রজগুণ দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মুগ্ধ করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ব দেহীগণকে সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমগুণ প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ব-গুণ রজ ও তমকে, রজগুণ সত্ব ও তমকে এবং তমগুণ সত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যখন দেহের সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিও।

রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ স্পৃহা ও অশান্তির উদয় হয়, তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদও মোহ উপস্থিত হয়।

গীতা হইতে যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুখ ও জ্ঞানপ্রদা শক্তির নাম সত্বগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্ত চঞ্চল হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোগুণ এবং যে জন্য মোহ উপস্থিত হইয়া আলস্যের উদয় হয় তাহারই নাম তমোগুণ। এই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যে ক্ষেত্রে সম্ভূত পদার্থ উহাই প্রকৃতি। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণই প্রকৃতির রস,

জীব দেহধারী হইয়া এই ত্রিবিধ রস ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জীবের চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণের যখন সাম্যবস্থা উপস্থিত হয় তখন তাঁহার চিত্তের বিস্তার অসীম হইয়া পড়ে, তাঁহার চিদাকাশে তখন আর কোনও তরঙ্গ থাকে না। চিত্তের এই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা, এই অবস্থায় তিনি অসীম এক। প্রকৃতির স্বামীত্ব লাভ করেন অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ সারূপ্য লাভ করেন। ইহাই পূর্ণানন্দ অবস্থা। সেই জন্য পূর্ণানন্দকেই প্রকৃতির স্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বুঝিলাম যে প্রকৃতি সমাধিগম্যা আনন্দময়ী জগজ্জননী। ইনি শিব হৃদয়বাসিনী। যদি কেহ প্রকৃতিকে খুঁজিতে চান তবে শিবের হৃদয়ের দিকে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন তবেই প্রকৃতিকে বুঝিতে পারেন।

ওঁ নমঃ শিবায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একটী প্রবন্ধ।

একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। একটা কিছু জিনিষ প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে উপাদান সংগ্রহ করা চাই, সেই জন্য আমার প্রবন্ধের উপাদন কি কি চাই, তাহারই যোগাড় প্রথমে করিতে হইবে। লোকে বলে কালী কলম মন, লেখে তিন জন। আমি কালী প্রস্তুত করিয়াছি, হংস পুচ্ছ কাটিয়া কলম প্রস্তুত করিয়াছি, কালীতে কলম ডুবাইয়া টেবিলের উপর কাগজ ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু লেখার প্রধান উপাদান মনটি যে আমার কোথায় রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত যদি খুঁজিয়া মনের তল্লাস পাওয়া যায়, ও লেখাটা সমাপ্ত করিতে পারি। আমি আমার মনের অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় কে যেন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তোমার মন কি কখনও ছিল" কথাটা শুনিবাই ত চমকিয়া উঠিলাম। লোকটি কে, ঐ কথা বলিল তাহাকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু স্বরটি বড় মিষ্ট, লাগিল সেইজন্য ঐ কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমার ত বেশ মনে হচ্চে যে আমার মন ছিল। সেই মনের ভিতর কত সুখের সংকল্প রাখিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আজি কে বলিল আমার মন কখনও ছিল না।

আমাব মন ছিল এটা নিশ্চয় কথা কিন্তু আমার সেই মন কি বকম বস্তু তাত কখনও ভাবি নাই। মনটা আমাব কেমন বস্তু ছিল, তাহা আজি একবার ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

আমি একজন চেতন মনুষ্য, আমাব একটা দেহ আছে, ঐ দেহে একটি শক্তি আছে, যাহাব নাম জীবনী শক্তি। ঐ দেহেব উপব ঐ জীবনী শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, আমি সেই সব ক্রিযাব ফলভোগ কবিতেছি। আমাব মন যাহাকে বলি উহাও কি জীবনী শক্তিব একটা ক্রিযা?

জীবনী শক্তি কি? মন কি? এই জিজ্ঞাসু হওযাতে আমাব মাথাটা যেন একটু ঘুবিযা গেল, কালী কলম ছাডিযা বিছানায় গিযা শুইযা পডিলাম। একটু তন্দ্রাও আসিল। তন্দ্রাবস্থাতে দেখি যে একখানা বিপুল পরিধির চাকা আমার সামনে ঘুবিতেছে ও নাদস্বরে একটা ধ্বনি হইতেছে। ঐ চক্রটি সূর্য্যসম তেজোময। চাকাখানি অবিবাম ঘুবিতেছে এবং নানাবর্ণের কতকগুলি তেজস্ফুলিঙ্গ ঐ চাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা অবিরাম গতিতে কোথাও চলিতেছে ও কতকগুলা তেজোকনা চাবি দিক হইতে আসিযা টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ করিয়া ঐ চাকায আসিযা পডিতেছে। ঐ সময আমি দেখি যে আমি একটি ছোট তেজোকণা, ঐ চাকার পরিধিতে পডিবাব জন্য বেগে আকৃষ্ট হইযা আসিতেছি, অবশেষে চাকাব কাছে আসিযা একটি নাম জোরে উচ্চাবণ কবিযা ঝুপ করিযা উহাব পরিধিতে পডিযা গেলাম, তন্দ্রা ভাঙ্গিযা গেল।

তন্দ্রা ভাঙ্গিযা মনে হইতেছে যে ঐ সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট চক্রটিই আমাব জীবনীশক্তি, আমার মন একটি তোজোকণা যাহা ঐ চক্র হইতে বাহির হইযা কোথায চলিযা যায, এবং কখনও বা ফিবিযা

আসিয়া ঐ চাকার পরিধিতে মিশিয়া যায়। ঐ জ্যোতির্ময় চক্রটীর মধ্যস্থলটিতে সুনীল আকাশ, সেই আকাশের রূপ দেখিলে আর ভোলা যায় না, ঐ নীলিমাকে বড় ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

জীবনী শক্তি ও মনের কথা যাহা বলিলাম, আমার ঐ কথাতে অনেকেই আপত্তি করিতে পারেন, বলিতে পারেন যে "তুমি কি বলিলে উহার ত কোন অর্থ দেখিতেছি না"। উত্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা ঐ কথার অর্থ বুঝিলে না? কিন্তু ঐ চাকাখানি যদি দেখিতেন তবে অর্থ বুঝিতে পারিতেন। স্বপ্নের ভাষায় জীবনী শক্তি ও মন কি তাহাত এক রকম ঠিক করিলাম, এখন জাগ্রত মানুষের ভাষাতে জীবনী শক্তিটা কি তাহাও ত একবার ভাবিতে হইতেছে। জীবনীশক্তি কথাতে আমি সোজাসুজী এই বুঝি যে দেহের মধ্যে যে আগুন জ্বালাইয়া রাখার জন্য আমায় প্রত্যহ ভোজন করিতে হয়, উহার নাম জীবনী শক্তি। সূর্য্যের তেজ যেমন সূর্য্যের শক্তি সেইরূপ আমার দেহে একটা তেজ আছে, উহাই আমার জীবনী শক্তি। কতকগুলা কাঠ একজায়গায় রাখিয়া আগুন ধরাইয়া চারিদিকের বাতাসের সহিত কাঠের কণায় রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং কাষ্ঠ থেকে একটা তেজ বাহির হইতে থাকে, উহার নাম আগুন, জীবনীশক্তি ও সেইরূপ একটা আগুন। কাষ্ঠ যেমন বায়ুসাগরে ডুবিয়া থাকিয়া জ্বলিতে থাকে আমার দেহ ও সেইরূপ এক মহাসাগরে ডুবিয়া আছে, আমার দেহের অণুসকল কি এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ বশে স্থূলভাব ছাড়িয়া ক্রমাগতই সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইয়া শেষে সেই মহাসাগরে মিলিতেছে এবং উহার ফলে একটা অনির্ব্বচনীয় আভ্যন্তরিক আগুন জ্বলিতেছে। ঐ যে মহাসাগরের কথা বলিলাম উহার

কুল কিনারা নাই। আমার দেহের কণা সকল দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মহাসাগরের স্রোতে অনন্ত দূরে চলিতেছে আবার আমার দেহের কণা সমস্ত পূরণ করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ ইচ্ছা কখন ক্ষুধা, কখন তৃষ্ণা, কখন কাম, কখন জ্ঞান, কখন সংকল্প রূপে পরিণত হইতেছে। অন্তরের এই অগ্নির কথা যখন ভাবি এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐ মহাসাগরের কথা মনে হয় তখন দেখি যে আমার হৃদয়ের আগুনের জ্যোতিই অনন্তব্যাপী। দেহটা যেন ঐ আগুনের ঢাকনি, কিন্তু ঐ দীপশিখার তেজ দেহ ভেদ করিয়া অপার সমুদ্রের স্রোতে চলিতেছে। তখন আমার হৃদয়েও দীপ শিখা দেখি, সকলের হৃদয় মধ্যেই সেইরূপ এক একটি দীপশিখা দেখিতে পাই। এই অসংখ্য দীপশিখা কে জ্বালিল, কেন জ্বালিল? কে বলিতে পারে? ইহার উত্তর দিবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের কথা এখন কহিতে চাহি না।

একদিন কার্ত্তিক মাসে বালিকারা নদীতে প্রদীপ ভাসাইয়া দিতেছে দেখিয়াছিলাম, যে যাহার প্রদীপটি ভাসাইয়া দিয়া একাগ্র-মনে সেই প্রদীপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, শেষে ভাসিয়া ভাসিয়া প্রদীপ অদৃশ্য হইলে পর উহারা ঘরে ফিরিয়া গেল। ঐ প্রদীপ ভাসানর দৃশ্য আমার মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়াছিল, তাহাত আমার বর্ণনার ক্ষমতা নাই। আমার এখন মনে হয় আমার হৃদয়—প্রদীপ ভাসাইয়া দিব বলিয়াই ঐ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। সাগরের কূলে পহুঁছিবার পূর্ব্বে বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া যায়, তাই দেহের ঢাকনে ঐ প্রদীপ ঢাকা দিয়া রাখিয়াছি।

আমার মন কি ঐ দীপশিখা? ঠিক তাহা নহে। আমার মন ঐ দীপশিখা—নিঃসৃত এক প্রকার জ্যোতি। ঐ জ্যোতির্ম্ময়

পদার্থ কখন মাথা থেকে বাহির হয় কখন হৃদয় থেকে বাহির হইয়া থাকে। মনের সংজ্ঞাটা আমি এই করিতে ইচ্ছা করি, হৃদয়ের অন্তরস্থ জীবনী শক্তিরূপ অগ্নির তেজ যখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক রূপ চোঙের ভিতর দিয়া বাহির হয় তখন উহাকে মন নাম দেওয়া যায়। এইত মনটা পদার্থ কি এক রকম স্থির হইল। এখন মনটাকে খুঁজিবার জন্য দেখিতে হইবে যে আমার জীবনাগ্নির তেজ হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়া বাহির হইয়া এখন কোথায় যাইতেছে।

হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এখন বলিতে পারিলাম না। তথা হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে চলিয়া গিয়া এক মনো—পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনিই আমি, তিনি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী। অজ্ঞানী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মন কোথায় বলিয়া দিতে পারেন? জ্ঞানী আমি বলিলেন তোমার মন ত এখন ভিতরে নাই মন যে তোমার বাহিরে। আমি তখন দেখিলাম মন আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উপর রহিয়াছে। জ্ঞানী আমি হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া, হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিলেন, "মন কাহার তোমার না আমার? তোমার কি কখন মন ছিল?" অজ্ঞানী আমি বলিলাম, "মন আপনার, আমার মন কখনও ছিল না।" জ্ঞানী আমি বলিলেন, "মন তোমারও নহে আমারও নহে, মন বিশ্বরূপের অংশ।" ব্যোম শব্দে আকাশটা ফাটিয়া গেল। উহার পর কি হইল মনে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোণার পাখী।

আমবা কয ভাইয়ে একটি অবণ্যে বাস করিতাম, সচ্ছন্দে বনে বনে বেডাইতাম, আমরা যেমন সুখে সচ্ছন্দে বেডাইতাম বনের সোনার পাখীগুলি ও সেইরূপ উডিযা উডিযা বেডাইত, পাখী-গুলিকে খাবার দিতাম তাহাবা আমাদিগকে গান শুনাইত, বড আনন্দে ছিলাম, ছাডা পাখীব মধুর গান যে কি মধুব তাহা তোমবা বুঝিবে না।

চির দিন সুখে কাটে না— কতকগুলা ব্যাধ সেই অবণ্যে প্রবেশ কবিল। আমাদের সদানন্দ পাখীগুলিব বক্ত খাইবাব অভিলাষে ব্যাধ সকল নানা অস্ত্র প্রহাবে পাখীগুলিব প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। জাল পাতিযা ভাল ভাল খাবাবের প্রলোভন দেখাইয়া পাখী ধবিতে লাগিল। দেখিলাম, পাখীগুলি ব্যাধের প্রলোভনে ভুলিযা তাহাদের জালে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে, অজ্ঞান পাখী প্রলোভনে ভুলিযা যায়।

আমবাও একটি সোনার খাঁচা নির্ম্মাণ করিলাম, সেই খাঁচায পাখী ভুলান ভাল ভাল খাবাব রাখিযা দিলাম, পাখীগুলি তখন আবাব আমাদের খাঁচাব আরও ভাল ভাল খাবাব দেখিয়া আমাদেব খাঁচাতেই আসিত, ব্যাধেব জালেব দিকে বড একটা

যাইত না। আমরা কিন্তু খাঁচার দ্বার কখনও রুদ্ধ করিতাম না, খাঁচায় বদ্ধ পাখী মধুর গান গাইতে ভুলিয়া যায়।

এই রকমে কিছুকাল কাটে, ক্রমে এমনি সময় আসিল যে আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। সেই সময়, সময় বুঝিয়া ব্যাধেরা আমাদের খাঁচা অধিকৃত করিল, খাঁচার সহিত সোনার পাখী সকল ব্যাধের হাতে পড়িল, পাছে পাখীরা উড়িয়া যায় এই ভয়ে ব্যাধগুলা খাঁচার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং একটি একটি করিয়া পাখীগুলিকে মারিয়া তাহাদের রক্ত খাইতে লাগিল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে, দুই একজন ভাইযের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ঘুম ভাঙ্গিয়াই তাহাদের আদরের পাখীগুলির দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিতেছে। তাহাদের আর্ত্তনাদ আমার কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু চোক হইতে পোড়া ঘুম আর ছাড়িতেছে না। ভাই, আমার চোকে একটু জল দেবে এস, নহিলে ঘুম যে ভাঙ্গে না।

স্ত্রীগণ আমাদের বনের পাখী, ইন্দ্রিয় পরবশ পাষণ্ডগণ ব্যাধ ইহারা রমণীগণকে প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাদের রক্ত শোষণ করে, বিবাহ পদ্ধতি আমাদের সোণার খাঁচা। এই সোনার খাঁচা এখন ব্যাধের হাতে পড়িয়াছে ভাই সকল, একবার জাগিয়া দেখ তোমাদের মনোহারিণী সচ্ছন্দে-বিহারিণী সুন্দরীগণের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

আমার সূক্ষ্ম শরীর একটি সোনার পাখী, আমার দেহ সোনারখাঁচা, কামাদি রিপু সকল ব্যাধ। এই ব্যাধ সকল আমার দেহ অধিকার করিয়া আমার খাঁচার দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমার পাখী—আর আমায মধুর গান শুনায না, ব্যাধ সকল উহাকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত রহিযাছে, ইহা দেখিযাও আমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না কেন? বুঝিযাছি—আমি যাহাকে ঘুম বলিতেছি ইহা ঘুম নহে—ইহা ঐ পাষণ্ডের মোহিনীমাযা। তোমরা কে আছ আমার চক্ষে একটু জল দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিরামিষ ভোজন।

ছাত্র। মহাশয় মাংস ভোজন কবাটা ভাল না মন্দ ?

শিক্ষক। সিংহ ব্যাঘ্রের পক্ষে ভাল কিন্তু গরু ছাগলেব পক্ষে ভাল নয়।

ছা। আমি পশুদের কথা কহিতেছি না, মনুষ্যেব পক্ষে উহা উপযোগী কি না?

শি। যেমন পশুজাতির সকলের পক্ষে এক নিয়ম খাটে না। সেইরূপ মনুষ্যদেব সকলেব জন্য এক নিয়ম খাটে না। মাংস ভোজন কাহারও পক্ষে ভাল আবাব অন্যের পক্ষে মন্দ। যে সকল মনুষ্য এখনও অসভ্যাবস্থায় আছে তাহাবা মাংস ভোজনেই দিন পাত করে, কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জেব উপব দিন পাত করিলে তাহাদের শরীর ধারণ করা কষ্টকর হয় সুতরাং মাংস ভোজন তাহাদের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন হইলে নিরামিশী হইযাও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যায় সে অবস্থায় মনুষ্য মাংস ভোজন করিযা উদরকে কবরস্থান রূপে পরিণত করিবে ইহা আমি ভাল বিবেচনা করি না। যাঁহার মাংস ভোজনে প্রয়োজন আছে তিনি মাংস ভক্ষণ করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহাব জীবন ধারণের জন্য মাংস ভোজন প্রয়োজনীয় নহে তিনি যদি রসনা তৃপ্তি করিবার জন্য আমিষাশী হন তবে তিনি তাঁহার উন্নতির পথে কণ্টক দেন।

ছা। আমি বিলাতী ডাক্তারদের নিকট হইতে জানিয়াছি যে, মাংসে পুষ্টিকর নাইট্রোজিন্স পদার্থ বেশী আছে, এবং সেই জন্য মাংস ভোজনে শরীর পুষ্ট ও সবল হয় সুতরাং শরীরে উপযুক্ত সামর্থ্য রক্ষার জন্য উহা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়।

শি। নাইট্রোজিন্স পদার্থ শরীরে প্রবেশ করাইলেই যদি দেহের পুষ্টিসাধন হইত তবে আদত নাইট্রোজন আর অক্সিজন যাহা লইয়া নাইট্রোজিন্স পদার্থ নির্ম্মিত, তাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারিলেই শরীরে পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। অস্থিতে চুণ আছে, খানিক চুণ খাইলেই কি অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারে। শরীরের ভিতর যদি এমন ক্ষমতা থাকিত যে তদ্বারা ঐ চুণকে অস্থি-স্তর পদার্থে পরিণত করিতে পারিত তবেই চুণ খাইলে অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। সেইরূপ মাংস ভোজন করা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে গেলে মাংসে কি কি "কেমিক্যাল এলিমেন্ট" আছে তাহার অন্বেষণের বেশী দরকার নাই। যিনি ভোজন করিবেন তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। গরুকে মাংস খাওয়াইলে সে কখনও বলিষ্ঠ হইবে না। কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে। আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেইজন্য যাহার মাংস ভোজন প্রয়োজন তাহার পক্ষে মাংস ভোজন বিধি আর যাহার প্রয়োজন নাই তাহার পক্ষে অবিধি।

ছা। আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

শি। মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু শরীর সঞ্চালন বা মন চালনা দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাই মনুষ্যের জীবন। যেমন বাষ্পের তেজ-শক্তি কলের

গাড়ীর গতিরূপ কর্ম্মে পরিণত হয় সেইরূপ মনুষ্য বা জীবজন্তু যে সকল কর্ম্ম করে তাহা দ্বারা আভ্যন্তরিক শক্তির (Energy) ব্যয় হয়। এই ব্যয় পূরণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন। ভোজ্য দ্রব্য শরীর যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা রূপ শারীরিক রসাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় পরে নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত অম্লজান বাষ্পের সহিত রাসায়নিক সংযোগে এবং তড়িত, আকর্ষণ ইত্যাদি শক্তির বশে সম্পূর্ণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে কাষ্ঠ যখন পূর্ণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তখন যেমন তাহা হইতে তেজশক্তি নির্গত হয় ভুক্ত দ্রব্যও সেইরূপ যখন নানারূপ পদার্থের সংযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তখন সেই ভুক্তদ্রব্যস্থ অন্তর্নিহিত শক্তি (Potential energy) বাহ্যে (Kinetic energy) প্রকটিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই শরীরের তাপ ম্যাগ্নেটিজম ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি স্থূলজাতীয় শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি, কল্পনা শক্তি স্মৃতি শক্তি ও উদ্ভূত হইয়া থাকে। স্থূলজাতীয় শক্তির সাহায্যে আমরা স্থূল-জাতীয় কর্ম্ম অর্থাৎ শরীর সঞ্চালনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির সাহায্যে মানসিক কর্ম্ম করিয়া থাকি। যাহাকে যে রূপ কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্মে যে শক্তির ব্যয় হয় যেরূপ আহার দ্বারা সে ব্যয় সহজেই পূরণ করা যায় তাহাই জীবের পক্ষে প্রশস্ত আহার।

ছাত্র। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষক। বহির্জগতে যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাও তাহা যেমন সকলই এক প্রকারের নয় অর্থাৎ কোন শক্তি তেজ-

রূপ, কোন শক্তি তড়িতরূপ, কোন শক্তি ম্যাগনেটিজম্ রূপে কোন শক্তি রাসায়নিক আকর্ষণ রূপে প্রকাশ পায় আমার ভিতরে ও যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় তাহাও এক রকমের নহে; যে জাতীয় শক্তির বশে হাত নাড়া যায়, যে জাতীয় শক্তির বশে প্রাণ রহিতে থাকে, যে জাতীয় শক্তির বশে ইচ্ছা জন্মে, যাহার সাহায্যে কল্পনা করা যায় ইহারা সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। বহির্জগতে রাসায়নিক শক্তি হইতে যেমন উত্তাপ জন্মে আবার তাপশক্তি হইতে আলোক শক্তি উদ্ভূত হয় কখন বা তড়িত শক্তি উদ্ভূত হয় আবার সেই তাড়িত হইতে ম্যাগনেটিজম্ শক্তি জন্মিয়া থাকে। সেইরূপ দেহের ভিতরে ও অন্নগত-অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে অবস্থা ভেদে নানারূপ শক্তি উদ্ভূত হয় এবং সেই এক এক জাতীয় বল বলা যায়। যেমন যে জাতীয় শক্তির দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালন হইতেছে এবং যে জাতীয় শক্তির দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইতেছে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়।

মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের শক্তি যে ভাবের ব্যয় হয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের শক্তি সে ভাবের ব্যয় হয় না ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা বুঝিলে তুমি ইহাও বুঝিতে পারিবে যে মানসিক শ্রমদ্বারা সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির ব্যয় হয় এবং শারীরিক শ্রমদ্বারা স্থূলজাতীয় শক্তির ব্যয় হয়।

এখন আহারের উদ্দেশ্য জীবন ধারণ করা, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহাকে সেইরূপ শক্তি দান করা। সুতরাং যে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা যেরূপ শক্তির ব্যয় করিয়া থাকে যেরূপ আহার করিলে সেইরূপ শক্তি সহজেই উদ্ভূত হইতে পারে সেইরূপ আহারই তাহার পক্ষে প্রশস্ত। সুতরাং ভোজন সম্বন্ধে সকলের পক্ষে এক নিয়ম খাটা সম্ভব নয়।

খড স্থূলপদার্থ আর ধান শস্য, সূক্ষ্মপদার্থ। মাংস স্থূল পদার্থ আর দুগ্ধ সূক্ষ্মপদার্থ। সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি সূক্ষ্মপদার্থ হইতে যত সহজে পাওয়া যায় স্থূলপদার্থ হইতে তত সহজে পাওয়া সম্ভব নহে। গরুকে সূক্ষ্ম জাতীয় কর্ম্ম মানসিক চিন্তাদি কাজ করিতে হয় না; কিন্তু মানুষকে তাহা করিতে হয় এইজন্য মনুষ্য খড খাইয়া থাকিতে পারে না, চাল খাইতে হয়। ব্যাঘ্র কেবল মাংস ভোজন করিয়া দিনপাত করিতে পারে কিন্তু মানুষে তাহা পারে না, কেননা কেবল মাংস ভোজন করিয়া থাকিলে মাংসের ন্যায় স্থূলজাতীয় দ্রব্য হইতে মানসিক চিন্তার অনুকূল সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি উদ্ভাবন করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

ছাত্র। সকল ভোজ্যপদার্থেই ত অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এবং সেই শক্তি ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে, তবে স্থূল-পদার্থ হইতে সূক্ষ্মশক্তির প্রকাশ হওয়া কি অসম্ভব?

শিক্ষক। অসম্ভব নহে, কিন্তু দুরূহ। চুম্বকের নিকট লোহা রাখিলে তাহাতে চৌম্বকীয় শক্তির প্রকাশ হয় কিন্তু কয়লা রাখিলে হয় না। কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি চৌম্বকীয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে না এমন নহে। সেইরূপ আমাদের দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধস্থ-শক্তি যত সহজে সূক্ষ্মশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে মাংসস্থ-শক্তি তত সহজে সূক্ষ্মাবস্থা পায় না।

মাংস ভোজন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে মাংস ভোজনে স্থূলকর্ম্মের অনুকূল-শক্তির বেগ যেরূপ বেশী হয়, নিরামিষ ভোজনে সেরূপ হয় না। ব্যাঘ্রের শক্তির বেগ আর হস্তীর শক্তির বেগ তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। ব্যাঘ্রের বল হস্তীর বল অপেক্ষা বেশী নহে, কিন্তু উহার বেগ বেশী। ব্যাঘ্রের নিশ্বাস যেরূপ খরতর বহে তাহা তুমি দেখিয়াছ। মাংস

ভোজনে নিশ্বাসের বেগ খরতর হয়। যুদ্ধাদি কর্ম্মে শারীরিক স্থূল শক্তি বেগবান হওয়া প্রয়োজন, যুদ্ধাদি কার্য্যে-লিপ্ত-যোদ্ধার শ্বাস ও খর বহিতে থাকে এই জন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাঁহারা স্থূলজাতীয় শক্তির বেগ কমাইতে ইচ্ছুক, যাঁহারা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর ভাবাপন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশে যত্নবান হইতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে মাংস ভোজন করা শ্রেয় নহে।

দেখ কোন্ দ্রব্য ভোজন করা কাহার পক্ষে ভাল আর কাহার পক্ষেই বা মন্দ তাহা স্থির করিবার জন্য আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে একটি যন্ত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু আমরা আপনাদের দোষে সেই যন্ত্রটি এমন খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি—যে তাহার সাহায্যে আহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বড় ঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ছাত্র। সে যন্ত্রটি কি?

শিক্ষক। সে যন্ত্রটি আমাদের রসনেন্দ্রিয়। দেখ পশুদের রসায়ন-শাস্ত্রও নাই এবং তাহাদের মধ্যে এমন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও কেহ নাই যে খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, কোন্ খাদ্য দ্রব্য তাহাদের পক্ষে ভাল আর কোনটিই বা মন্দ অথচ তাহারা আপনাদের রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য সম্বন্ধে যেরূপ ভালমন্দ বিচার করিয়া লয় সে বিচারে ত ভুল হয় না। কিন্তু মনুষ্য আপন দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ সেই যন্ত্রটির কল বিকল করিয়া ফেলিতেছে। অনন্ত প্রকৃতি মনুষ্যকে ইন্দ্রিয় সকল যে কারণে দিয়াছেন মনুষ্য সে কারণে তাহার ব্যবহার করে না বলিয়াই মানুষ এত গোলে পড়িতেছে।

বাহ্যজাতীয় পদার্থের অন্তঃস্থলস্থ শক্তির সৌন্দর্য্য বিচার করিয়া কিরূপ পদার্থ কাহার উপযোগী ইহা স্থির করিবার জন্যই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল মনুষ্য আপাত সৌন্দর্য্যে, উপরের চাকচিক্যে এত মুগ্ধ হইয়াছে যে তাহারা স্বভাব জাত-বাহ্যজাতীয় পদার্থ কুৎসিৎ হইলেও তাহার উপর অন্য একটা সুন্দর আবরণ দিয়াই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কুৎসিৎ রমণীগণ অলঙ্কারের সাহায্যে মুখে পাউডার মাখিয়া মানুষের মন হরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, যে সকল স্বভাবজাত পদার্থ স্বভাবতঃ মনুষ্য রসনার উপাদেয় নহে তাহাই নানাবিধ মসলা প্রভৃতির সহ-যোগে সুন্দর সুখাদ্য হইয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতেছে। মনুষ্য রসনা এইরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্য-কৃত আপাত-তৃপ্তিদায়ক সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আস্বাদন লইতে আর ব্যস্ত নহে তাই এখন কেমিষ্ট্রির সাহায্যে মানুষকে বিচার করিতে হয় কোন আহার ভাল আর কোন আহার মন্দ। সে দিন একখানা ইংরাজী কাগজে দেখিতেছিলাম যে একজন ডাক্তার অস্থির অভ্যন্তরস্থ কেমিক্যাল এলিমেণ্ট সকল পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে জানাইতেছেন যে অস্থিতে যে সকল পদার্থ আছে দেখা যাইতেছে তাহাতে অস্থিভোজনে মনুষ্য-দেহ বিশেষ পুষ্ট হইতে পারে। কাগজখানি পড়িয়া আমার বড় হাসি পাইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভাবিয়াছিলাম হায় কতদিনে এই রকম ডাক্তারের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

কোন খাদ্য দ্রব্য খাওয়া উচিত আর কোন্‌টিই বা উচিত নয় তাহা বিচার করিতে গেলে কি করা উচিত বলি শুন। স্বভাবজ যে সকল খাদ্যদ্রব্য অতি সামান্য রকমে রন্ধন করিয়া রসনা তৃপ্তিকর হয় তাহাই প্রশস্ত আহার জানিও। আর পঞ্চাশ রকম মসলা দিয়া নানা

রূপ কারখানা করিয়া হালের পাকপ্রণালী নামক অপদার্থ সেই বই খানা হাতে করিয়া দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া মুখরোচক আহার প্রস্তুত করিলে তোমার রসনা তোমার খাদ্যের গুণাগুণ বলিয়া দিবে না।

এখন দেখ মাংসভোজন কখন ভাল। ব্যাঘ্রের নিকট কাঁচা চাল রাখিয়া দাও ও মাংস রাখিয়া দাও ব্যাঘ্র তাহার রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার উপযুক্ত যে আহার তাহাই বাছিয়া লইবে। কাঁচা মাংসে তাহার দুর্গন্ধ ঠেকে না সেই দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য সে মাংসে পেঁয়াজের রস ঢালে না, ক্ষুধার চোটে অতি সুস্বাদু জ্ঞানে সে সেই কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। একজন ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কাছে কাঁচা চাল দাও আর কাচা মাংস দাও, সে কোনটা খায় দেখ। যদি সেই কাঁচা মাংস খাইতে তাহার অধিক প্রবৃত্তি দেখ তবেই জানিও যে তাহার পক্ষে মাংস চাউল অপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যদি কাচা মাংসে বড়ই ঘৃণা হয় তবে নিশ্চয় জানিও যে, প্রকৃতি তখন এই উপদেশ দিতেছেন যে দেখ ক্ষুধার্ত্ত, এই মাংসে যে শক্তি এখন রহিয়াছে সেই শক্তিকে তোমার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তোমার উপযোগী কার্য্যকারী-শক্তিতে পরিণত করা তোমার পক্ষে দুরূহ ও ক্লেশদায়ক হইবে, কেন না ঐ উভয়বিধ শক্তিতে সামঞ্জস্য নাই, সামঞ্জস্য থাকিলে তুমি উহাকে ঘৃণা করিতে না।

আসল কথাটি এই যে যদি কাঁচা মাংস খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে অথবা শুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া কোন মসলা না দিয়া মাংস খাইতে কাহারও ভাল লাগে তবে মাংস তাহার পক্ষে উপযোগী।—

ছাত্র। শুদ্ধ সিদ্ধ মাংস মসলা না দিয়া আমি ত সাতজন্মেও খাইতে পারি না।

শিক্ষক। মাংস তবে তোমার খাওবাই উচিত নহে। বিশেষতঃ মানসিক শক্তির ক্রিয়াই যখন তোমাকে বেশী করিতে হয তখন তোমাকে আমি মাংস খাইতে নিষেধ করি।

মাংস ভোজনের একটি মহৎ দোষ আছে সেইটি তোমায বলি শুন। বেশী মিষ্ট খাইলে যেমন জল খাইতে ইচ্ছা করে যাহারা মাংস খায তাহাদের সেইরূপ মদ্য সেবনে ইচ্ছা হয। এইজন্য মাংস আর মদ্য এই দুইটি এক সঙ্গে বেড়ায় ইহাই দেখা যায়। মনুষ্যকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে হয মাংস ভোজনে তাহার অনুযায়িক সূক্ষ্ম শক্তির প্রকাশ দুরূহ হওয়াতেই মদ্যেব সাহায্য লওয়া মনুষ্যেব প্রযোজনীয হইযা পড়ে। অতীতকালের মনুষ্যজাতি এবং বর্ত্তমানের মনুষ্যজাতির মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে যেখানে মাংস, মদ্যও সেইখানে আছে। এমন অনেকে থাকিতে পাবেন যে যাঁহারা মাংসাশী অথচ মদ্যপ নহেন কিন্তু মদ আব মাংসের সম্বন্ধ বিষযে আমার এতদূর দৃঢ় প্রত্যহ যে আমাব বোধ হয যাঁহারা মাংসাশী অথচ নিজেরা মদ্যপ নহেন তাঁহাদের সন্তান সন্ততির অন্তরে মদ্যপানেব স্পৃহা প্রকাশ হইবে।

আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্য ও মাংস সেবনে কাটাইয়াছিলেন। শরীর নানা প্রকার রোগে রুগ্ন হওয়ায় তিনি মদ্যসেবন ত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু মাংস ভোজন ত্যাগ করিলেন না। ইহাতে এই ফল ফলিল যে তিনি মদ্যসেবনের স্পৃহা কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিলেন না তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইল না। পরে এক দিন মদ্য

ও মাংস উভয়ই পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মাংস ভোজন না করায় মদ্যসেবনের স্পৃহা ক্রমে কমিয়া আসিল। এইবারে তিনি প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হইলেন। আমি জানি মাংস ভোজন বন্ধ করিয়া অবধি তিনি এক ফোঁটা ও মদ্যসেবন করেন নাই। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল তিনি রাক্ষস রাক্ষসীকে জয় করিয়াছেন।

মদ্য ও মাংস উভয়েই কামনার বেগ বৃদ্ধি করে। মদ্য ও মাংস মনুষ্যকে কামনার তীব্র বেগশালী স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া কখন কোন পথে লইয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। মদ্য ও মাংসের বশে মনুষ্য নিজের আয়ত্তাধীন থাকিতে পারে না। কামরূপী শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং যাঁহারা আপনাহারা হইতে ভয় করেন তাঁহারা ঐ দুই শত্রুর নিকট হইতে দূরে থাকিবেন।

ছাত্র। কিরূপ আহার কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় বিচার করা বৈদ্য-শাস্ত্রেরই অঙ্গ, ধর্ম্মের সহিত মদ্য সেবন ও মাংস ভোজনের সম্বন্ধ কি?

শিক্ষক। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে তুমি তাহা জান কি? যেরূপ কর্ম্মে সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় কেবল সেইরূপ কর্ম্মই নিষ্কাম-ধর্ম্ম অনুমোদিত। রসনা তৃপ্তির জন্য যিনি আহার করেন তিনি নিষ্কাম-ধর্ম্মের অধিকারী নহেন। সুতরাং কিরূপ আহারে কিরূপ শক্তির প্রাধান্য জন্মে তাহা বিচার করা নিষ্কাম-ধর্ম্মের অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এইজন্য অধিকারী ভেদে আহারের উপযোগীতা সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মাংস মদ্য মনুষ্যের অন্তরে রজঃগুণ উত্তেজক। সেইজন্য সাত্ত্বিক কর্ম্মে মদ্য ও মাংস নিষিদ্ধ।

মাংস ভোজন-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার সার বলি শুন। মদ্য মাংস উভয়েই মনুষ্যের কামনার বেগ বৃদ্ধি করে। মাংসের সহিত মদ্যের বড় নিকট সম্বন্ধ। সেইজন্য মাংস ভোজনে মদ্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা আসিয়া পড়ে। যাঁহারা কাম জয় করিতে চান তাঁহারা এই উভয়কেই শত্রু জ্ঞান করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিরামিষ ভোজন।

(প্রতিবাদের উত্তর)।

আমি ভাবতীতে নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিযা ছিলাম, সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ ভারতীতে বাহির হইযাছে। মাংস ভোজন সম্বন্ধে আমার যাহা মত, তাহা বোধ হয পরিষ্কার রূপে আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝান হয় নাই--কেন না দেখিতেছি প্রতিবাদ লেখক আমার লেখা হইতে আমার অভিপ্রায বুঝিতে পারেন নাই। পাঠক-গণ আমায মাপ করিবেন।

মাংস ভোজন করা যে. সকল মানুষের পক্ষে অন্যায, আমার মত এরূপ নহে। কিন্তু প্রতিবাদ লেখক আমাব লেখা হইতে আমাব মত সম্বন্ধে তাহাই বুঝিযাছেন, মানুষ মাত্রেরই পক্ষে যে মাংস ভোজন কবা দূষ্য তাহা বোধ হয পূর্ব্ব প্রবন্ধে কোথাও বলি নাই।

আমার প্রবন্ধে এইরূপ কথা ছিল যে "যিনি মাংস ভোজন করিবেন তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্ত্তব্য-গরুকে মাংস খাওযাইলে সে কখন বলিষ্ঠ হইবে না। কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহারেব উদ্দেশ্য নহে, আহাবের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই জন্য যাঁহার মাংস ভোজন প্রযোজন, তাঁহাব পক্ষে মাংস ভোজন বিধি, আর

যাঁহার তাহার প্রয়োজন নাই—তাঁহার পক্ষে অবিধি।” প্রতিবাদ লেখক ঐটকু উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে “এতদ্বারা বুঝা গেল যে লেখকের মতে গরুর পক্ষে যেমন মাংস ভোজনের আবশ্যকতা নাই, মনুষ্য পক্ষেও সেইরূপ। তাহার পর অসভ্যাবস্থায় মানুষ কাঁচা মাংস খাইত, এই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে যে মাংস ভক্ষণ অবিধি, একথা তিনি উদ্ধৃত বাক্য হইতে কেমন করিয়া বুঝিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা কামনা জয় করিতে চান, তাঁহারা যেন মদ্য ও মাংসকে শত্রু জ্ঞান করেন, কল্পনা শক্তি ধীশক্তি ইত্যাদি সূক্ষ্ম শক্তির ব্যয় যাঁহাদের বেশী করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন শ্রেয় নহে। অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের মাংস ভোজন করা উচিত নহে, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, পাঁচ ইয়ারে বসিয়া মদ্যসেবন নৃত্যগীতাদি যাঁহারা করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে মাংস ভোজন অনুচিত একথা আমি বলি না।

প্রতিবাদ লেখক একস্থলে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে “এস্থলে গুরুঠাকুর রসিকতা করিয়াছেন মন্দ নয়।” প্রতিবাদ লেখকের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবে সাধারণকে জানান কর্ত্তব্য যে শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন অবলম্বনে আমি মাঝে মাঝে যাহা লিখি তাহাতে এমন যেন কেহ মনে না করেন যে আমি নিজেকে সাধারণের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনে করি। আমার লেখায় আমি নিজেই শিক্ষক, আবার নিজেই ছাত্র। পাঠকগণকে আমার জানান কর্ত্তব্য যে আমি যখন যাহা লিখি, তাহা শিখিবার জন্য; এবং সাধারণের কাছে যে সেই লেখা প্রকাশ

করি, তাহাও শিখিবার জন্য। প্রতিবাদ লেখক মহাশয় আমাকে ছাত্র বলিয়া জানিবেন।

প্রতিবাদ লেখক মহাশয় আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন এবং কথাগুলি বাস্তবিক সত্য কথা। আমি উক্ত প্রবন্ধ লিখিতে যে পথে গিয়াছি তাহা না আধ্যাত্মিক, না ভৌতিক, না নৈতিক, না বৈজ্ঞানিক। কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কেন না আমি আধ্যাত্মিক রহস্যের কিছু জানি না, ভৌতিক রহস্যের কিছুই জানি না, নৈতিক রহস্যেরও কিছুই জানি না, বৈজ্ঞানিক রহস্যের ত কথাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিবাদ লেখক যে ঠিক বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বনে তাহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, তাহাও বলি না। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে আমি বিজ্ঞানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ জ্ঞান করি। এই জগতের ভিতর যে সমস্ত গূঢ়, গূঢ়তর, গূঢ়তম তত্ত্ব আছে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান সাহায্যে তাহার কণামাত্রের আভাস পাওয়া যায় এই পর্য্যন্ত। যিনি পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চরম অবস্থা জ্ঞান করেন, তাহাকে আমি ভ্রান্ত জ্ঞান করি। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমিও এককালে উহার বড় গোঁড়া ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার সে গোঁড়ামী এখন আর নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চরম অবস্থায় উঠিতে যে এখনও ঢের বিলম্ব আছে, ইহা প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনারাই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ডাক্তারি শাস্ত্র আবার অত্যন্ত অপরিপক্ব সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বা পাশ্চাত্য ডাক্তারি শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই অকাট্য প্রমাণ, ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

আরও এক কথা আছে, লেখক যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া মাংসভোজন মনুষ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্থির করিয়াছেন,

মাংস ভোজন সম্বন্ধে সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেই মতভেদ আছে। বিলাতের অনেকে আজকাল মাংস ভোজনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহারা মদ্য-সেবন-জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হন তাঁহাদিগকে মদ ছাড়াইবার জন্য আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারেরা প্রথমে মাংস ছাড়িবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিলাতে যাঁহারা মদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মাংস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে অস্থিতে চূণ আছে খানিক চূণ খাইলেই কি অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারে? ইহার উত্তরে প্রতিবাদ লেখক বলিয়াছেন যে "এস্থলে গুরুঠাকুর রসিকতা করিয়াছেন মন্দ নয়, কিন্তু তাহার অনুধাবন করা উচিত ছিল যে চূণ অস্থিরোগের একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, অস্থির পুষ্টিসাধনের জন্য চূণের তুল্য ঔষধ ইংরাজীতে নাই" ইত্যাদি।

যেরূপ রোগে ডাক্তারেরা চূণ ব্যবস্থা করেন, সেরূপ রোগে সেই ব্যবস্থা দ্বারা শরীরের যে অনেক সময় উপকার হয়, ইহা আমার নিজের দ্বারা পরীক্ষিত সুতরাং প্রতিবাদ লেখকের কথা, আমি সম্পূর্ণ মান্য করিতে বাধ্য, কিন্তু একটি কথা বলিতে চাই যে ঔষধের সহিত যে চূণ খাওয়ান হয় সেই চূণের কেমিক্যাল ইনগ্রিডিয়েণ্ট সকল হাড়ে জমা হইয়া যে হাড়ের পুষ্টিসাধন হয় একথা আমি স্বীকার করি না। না স্বীকার করিবার একটি কারণ আছে—হাড়ের যেরূপ রোগে ডাক্তারেরা চূণের জল কিম্বা চূণঘটিত অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করেন সেই সেই অসুখে হোমিওপ্যাথী চূণঘটিত ঔষধ (Calcarea Carbonica, Calcium Phosphite ইত্যাদি) সেবন করাইয়া বেশী উপকার হইতে দেখিয়াছি। হোমিওপ্যাথী চূণঘটিত ঔষধের এক কোঁটায় চূণের

কেমিক্যাল এলিমেণ্টের কণার কণামাত্র থাকে, সুতরাং চূণ ঘটিত ঔষধ সেবন দ্বারা সেই চূণের কেমিক্যাল এলিমেণ্ট হাড়ে গিয়া জমা হয় বলিয়া যে হাড়ের পুষ্টি সাধন হয় সে কাজের কথা নয়। আমি বিজ্ঞানের বড় পক্ষপাতী, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ ধরিয়া "মাংসের রাসায়নিক বিশেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহার অনিষ্ট কারিতা" প্রতিপাদনের চেষ্টা করি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড় এলিমেণ্ট ছাড়া অন্য অন্য পদার্থ খাদ্য দ্রব্যের ভিতর আছে কিন্তু সেই পদার্থ যে কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার বড় খবর রাখে না।

প্রতিবাদ লেখক ভারতীর ৩৫২ পৃষ্ঠার একস্থলে বলিয়াছেন যে 'এমনও প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত ডাল সকলের মধ্যে কোন কোনটিতে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে যে সেই সকল ডাল অধিক দিবস একাদিক্রমে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়ার উৎপত্তি হয়।" কিন্তু এই বিষাক্ত দ্রব্য যে কি তাহা বোধ হয় প্রতিবাদ লেখক জানেন না, কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ ডাল হইতে কেহ বাহির করিতে পারেন নাই এবং কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা এই ডালের ভিতর যে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, সেই দ্রব্য কি জাতীয় তাহা যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থির করিতে পারিবে তখন মাংসের ভিতরও কি বিষাক্ত পদার্থ আছে তাহাও স্থিরীকৃত হইবে।

কেবল স্থূল কেমিক্যাল এলিমেণ্টের বিশ্লেষণ দ্বারাই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে তাহা ঠিক করা যায় না। চিনি একটি খাদ্য দ্রব্য, উহার কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা কয়লা

আর জল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে কয়লা আর জল বই কিছুই নাই কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে স্থূল কয়লা ও জল ছাড়া এমন পদার্থ আছে যাহা পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু বিজ্ঞানের কথায় চিনিতে স্থূল কয়লা এবং জল ভিন্ন এমন একটি পদার্থ আছে যাহা রস তন্মাত্রের এক প্রকার পরিণাম এবং যাহাকে চিনির "স্বরূপ" বলা যাইতে পারে। এই পদার্থটি কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলে খাদ্য সম্বন্ধে চিনির উপযোগীতা অনুপযোগীতা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নির্ণয় কখনও ঠিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে কর গম একটি খাদ্য দ্রব্য। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল যে উহাতে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ইত্যাদি পদার্থ আছে। একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের মধ্যে কত অক্সিজন, কত হাইড্রোজেন ইত্যাদি থাকে তাহা নির্ণয় করিবার খাদ্য সম্বন্ধে গমের গুণাগুণ বিচার করা যায় না। প্রতিবাদ লেখক "প্রটিড" ইত্যাদি পদার্থে কি কি কেমিক্যাল এলেমেণ্ট আছে তাহা বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে 'কিন্তু তাই বলিয়া অমিশ্র বা আদত এই দ্রব্যগুলি খাইলে কি আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে?" কিন্তু কেন হইতে পারে না প্রতিবাদ লেখক সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। প্রশস্ত বিজ্ঞানের পথ অবলম্বনে তিনি যখন প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন সেটা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

অমিশ্র বা আদত খাইলে কেন যে শরীর রক্ষা হইতে পারে না তাহার একটি বিজ্ঞান সম্মত উত্তর আমি দিতে চাই এবং বোধ হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অন্য উত্তর থাকিতে পারে না। রাসা-

য়নিক আকর্ষণে এলিমেণ্ট সকল যখন মিশ্রিত হইয়া যে নূতন পদার্থ জন্মে, তাহার গুণ সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্টদের গুণ হইতে সম্পূর্ণ রূপ ভিন্ন হইয়া পড়ে। কার্বন অর্থাৎ কয়লা আর অক্সিজেন অর্থাৎ বায়ুস্থিত পদার্থ যাহা প্রতি নিশ্বাসে শরীরের, মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই দুই পদার্থ মিশিয়া একটি বিষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রটিডের গুণে প্রাণ ধারণ সম্ভব বলিয়া কার্ব্বণ হাইড্রোজেন ইত্যাদি খাইয়া প্রাণ ধারণ হইবে এরূপ অনুমান করা অন্যায়।

এইবারে একটি কথা বলিতে চাই—মাংসে ১১ ভাগ মাংস-বিধায়ী পদার্থ আছে, ১৪ ভাগ উষ্ণজনক পদার্থ আছে, ১ ভাগ খনিজ পদার্থ এবং ৬৩ ভাগ জলীয় ও মেদসিক পদার্থ আছে, কিন্তু এত পদার্থ গুলি যে মাংসে মিশিয়া আছে তাহা ডাল ও চালের খিচুড়ির ন্যায় মিশ্রণ কি কোন রাসায়নিক সম্বন্ধে মিশ্রিত। যদি খিচুড়ির ন্যায় মিশ্রণ হয়, তবে উদ্ভিদ জগৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে লইয়া খিচুড়ি বানাইলেই মাংস তৈয়ারি হইতে পারিত, মাংস খাইবার জন্য আর প্রাণী হত্যা করিতে হইত না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যে পদার্থ মাংসে আছে, তাহারা পরস্পর আবার এক প্রকার রাসায়নিক আকর্ষণে বদ্ধ। এবং সেই জন্যই মূল জড় পদার্থের গুণ জানিলেই মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থের গুণ জানা যায় না। প্রটিড অ্যামেলয়েডের গুণ জানিলেই মাংসের গুণ জানা সম্ভব নহে। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের গুণা গুণ নির্ণয় জন্য যাঁহারা কেবল কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহার ইষ্টানিষ্টকারিতার প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা ভুল পথে চলিতেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে ডালের সঙ্গে চালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডালের সঙ্গে চেতন পদার্থ আমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহাই দেখিতে হইবে। হিন্দু বিজ্ঞান যে পথ অবলম্বন করিয়া দ্রব্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতেন, সেই পথ অবলম্বনে খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ঠিক বুঝিতে পারা যায়। কোন পদার্থের সহিত চেতন পদার্থ-আমার কি সম্বন্ধ তাহাই আলোচনা দ্বারা ঋষিগণ দ্রব্যস্থ পদার্থ সকলকে ভিন্ন ভিন্নরূপে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

একটি চুম্বক আছে আর একখানি লোহা আছে। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে দুইই এক পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক চুম্বকেও যা আছে লোহাখানিতেও কি তাই আছে? একজন নব্য বিজ্ঞানবিদ হয়ত বলিবেন যে matter সম্বন্ধে দুইই এক, তবে চুম্বক খানিতে এমন একটি শক্তি আছে যাহা লোহা খানিতে নাই। কিন্তু যাঁহারা ঋষিদের বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বনে দ্রব্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অয়স্কান্তমণিতে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা লৌহ খানিতে নাই এই পদার্থ সাধারণের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে কিন্তু অনুভূতি শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশে এই পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। প্রতিবাদ লেখকের কাছে আমার একটি নিবেদন এই যে আমার এই সকল কথা একেবারে বিজ্ঞান বহির্ভূত কিনা সে বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্ব্বে রিসনব্যাক রিসার্চ্স এবং বিলাতের সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রসিডিংসগুলি যেন পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে অনুভূতি শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশের সাহায্যে চুম্বক হইতে

দীপশিখার ন্যায় এক প্রকার আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায়। যেমন দীপশিখায় ফুঁ দিলে দীপশিখা চঞ্চল হয়, ফুঁ দিলে এই শিখাও সেইরূপ চঞ্চল হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চুম্বকে এমন এক প্রকার পদার্থ আছে যাহা লোহায় নাই। বিসনব্যাক এই পদার্থকে অড (Od) নাম দিযাছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই পদার্থকে তেজ বলা যাইতে পারে।

যোগী পতঞ্জলি বলেন যে পঞ্চভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থতত্ত্ব এই পাঁচ অবস্থা আছে, এই পাঁচ অবস্থা বিষয়ে চিত্ত সংযম করিতে শিখিলে ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য সকল অন্তরে প্রকাশ পায়। ভৌতিক দ্রব্য সকলের গুণাগুণ তখনই ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

পেটের অসুখ হইলে মুড়ী চালভাজা খাওয়া ভাল কি পোলের ভাত খাওয়া ভাল এইটি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রতিবাদ লেখক কোন পথ অবলম্বন করেন তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের প্রশস্ত পথ ধরিয়া উক্ত পদার্থ দ্বয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহাদের ইষ্টানিষ্ট-কারিতা বুঝিতে যান, তবে বোধ হয় মুড়ীতে এবং পোলের ভাতের মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজিয়া পাইবেন না। প্রশস্ত বিজ্ঞান পথ অবলম্বনে তিনি যাহা স্থির করিবেন তাহাত মিথ্যা হইবার নহে সুতরাং যদি কেহ বলে যে পেটের অসুখে মুড়ী চালভাজা খাইতে নাই, তাহা হইলে প্রতিবাদ লেখক যে তাঁহার কথায় হাস্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিতে গিয়া প্রতিবাদ লেখক মধ্যে মধ্যে এইরূপ হাসি হাসিয়াছেন ইহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। পেটের অসুখের

সময় মুড়ী চালভাজা খাইতে নাই—এ কথাটি যদি সত্য হয় তবে এ সত্য কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা ঠিক করা যায় না। নিজের জঠরাভ্যন্তরস্থ শক্তির সহিত মুড়ীর সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা মুড়ী ভোজন কোন সময়ে ভাল এবং কোন সময়ে মন্দ তাহা ঠিক করিতে হয়। কিম্বা পূর্ব্বাগামী লোকেরা মুড়ী খাইয়া মুড়ীর গুণাগুণ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহা (সেই Experience) অবলম্বনে উহার উপযোগীতা অনুপযোগীতা স্থির করিতে হয়। প্রতিবাদ লেখক একস্থলে বলিয়াছেন "কেন? যদি মাংসের কেমিক্যাল এলিমেণ্ট কি দেখিবার প্রয়োজন না থাকিল তাহা হইলে তিনি আমিষ ভক্ষণের উপযোগীতা অনুপযোগীতা কি প্রকারে স্থির করিলেন?" প্রতিবাদ লেখক আমার অনেক কথায় হাসিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহার হাসি দেখিয়া ইহা শিখিয়াছি যে হাসি আসিলেও হাসি সম্বরণ করা ভাল, সেই জন্য তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যটি পড়িয়া যে একটু হাসি আসিয়াছিল তাহা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রতিবাদ লেখকের মতে কেমিক্যাল বিশ্লেষণ ভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের উপযোগীতা অনুপযোগীতা কখনই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এই দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে যখন কেমিক্যাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি বাহির হয় নাই তখন লোকে খাদ্য সম্বন্ধে উপযোগীতা অনুপযোগীতা কিছুই বুঝিতে পারিত না। প্রতিবাদ লেখকের কথার অর্থটি এইরূপ বোধ হইতেছে। খাদ্য দ্রব্যে কি কি এলিমেণ্ট আছে তাহা ঠিক করিয়া কি গরু ছাগলে তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য বাছিয়া লয়? গরু ছাগলে আপনাদের তীক্ষ্ণ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে পদ্ধতি অবলম্বনে উপযোগী অনুপযোগী খাদ্য বাছিয়া

নয়, তাহাই যে ঠিক পদ্ধতি পাঠকগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

৩৪৮ পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ লেখক একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। আমি লিখিয়াছিলাম "নিরামিষ ভোজন দ্বারা মানসিক সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ যত শীঘ্র হয়, আমিষ (মাংস) ভোজন দ্বারা তত শীঘ্র তৎক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। যেমন দুগ্ধ দ্বারা যত সত্বর সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ হয় মাংসে তাহার বিপরীত।" প্রতিবাদ লেখক ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আচ্ছা স্বীকার করিলাম তাহাই ঠিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপাদনের মূল কি? কোথা হইতে সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে? মানুষের স্থূল শক্তি না হইলে সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। স্থূল হইতেই সূক্ষ্ম আইসে, সূক্ষ্ম শক্তির মূল চিন্তা সেই চিন্তার আধার মস্তিষ্ক (Brain) চিন্তা করিতে হইলে মস্তিষ্কের সরলতা আবশ্যক। সেই সরলতার উপায় সুস্থ শরীর। শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইলে মানসিক সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা থাকে না ইত্যাদি। মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল এবং তাহাই রাখিবার নিমিত্ত পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক।" লেখক পরে দেখাইবেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে মাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

লেখক যখন যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকথিত কথাগুলি অর্থাৎ "মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য

ও শারীরিক বল” এই সমস্ত কথা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু যুক্তি দেখান উচিত ছিল।

লেখকের অভিপ্রায় যদি এরূপ হয় যে মনের জোর বা চিন্তা করিবার শক্তি গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তিনি বড় ভুলিয়াছেন। এমন লোক ঢের আছে যাঁহাদের শরীর বেশ সবল ও সুস্থ কিন্তু মনের ক্ষমতা কিছুমাত্র না অর্থাৎ মনের স্বভাব বড় ভীরু, এমন লোকও ঢের দেখা যায় যাহাদের শরীরে বেশী জোর নাই—কিন্তু চিন্তাশীলতা ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, সুতরাং শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক ক্ষমতা থাকিবে, তাহার ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না। বরং অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায় যে যাঁহারা চিন্তাশীলতায় অদ্বিতীয় তাঁহারা প্রায়ই দুর্ব্বল। (দুর্ব্বল কথায় রুগ্ন অর্থ কেহ না বুঝেন) আমি অনেককে দেখিয়াছি যাঁহারা শারীরিক বল বৃদ্ধি করিতে গিয়া নানাবিধ জিমন্যাষ্টিক আদি ব্যায়াম করিয়া থাকেন ও খুব মাংসাদি দেহের পুষ্টিকর পদার্থ সেবনের দেহের পুষ্টিসাধনে যত্নবান থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধি প্রায়ই পূর্ব্বাপেক্ষা মোটা হইয়া পড়ে। এই সব কারণে প্রতিবাদ লেখকের কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

মাংস ভোজনে যে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, ইহা আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে এক রকম বলিয়াছি এবং শারীরিক বল থাকিলেই মানসিক বল জন্মিবে ইহা যদি সত্য হয় তবে মানসিক তেজ লাভের জন্যও যে মাংস ভোজন কর্ত্তব্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক বল থাকিবে, শারীরিক বল যত বাড়িবে, মানসিক বল ও যে সেইরূপ বাড়িবে—এ কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

তবে শরীর রুগ্ন হইলে মতের ক্ষমতা কমিয়া যায়, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে মাংস ভোজন না করুক শরীর রুগ্ন হয়, এরূপ প্রমান কি কোন বিলাতী শাস্ত্রে আছে?

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে মাংস ভোজন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। মাংস ভোজনে স্থূল কর্ম্মের অনুকূল শক্তির বেগ যেরূপ বেশী হয়, নিরামিষ ভোজনে সেরূপ হয় না। যাঁহারা স্থূলজাতীয় শক্তির বেগ কমাইতে ইচ্ছুক, যাঁহারা তাঁহাদের অভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ভাবাপন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশে যত্নবান হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন করা শ্রেয় নহে। মনুষ্য মাত্রেরই যে মাংস ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে একথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলি নাই। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত কোন যুক্তি দিতে পারি নাই—কেন না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এখন যে অবস্থা, তাহাতে এসকল বিষয়ক সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আর্য্য বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ভোজ্য দ্রব্যের উপযোগীতা অনুপযোগীতা কিরূপে স্থির করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাই, কিন্তু তাহা সাধারণের কাছে কিরূপ লাগিবে, তাহা বলিতে পারি না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নাম Experimental Science—আমি যে আর্য্য বিজ্ঞানের কথা বলিব, তাহাও Experimental Science পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই আর্য্যবিজ্ঞান পদ্ধতির প্রভেদ এই যে পাশ্চাত্যগণ নানাবিধ জড় ইনষ্ট্রুমেন্ট নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই ইনষ্ট্রুমেন্টের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঋষিগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র চেতন মনুষ্য। বিজ্ঞানের যন্ত্র সকল যত সূক্ষ্ম (Sensitive) হইবে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তত সূক্ষ্ম হইবে, পাশ্চাত্যগণ জড় পদার্থ নির্ম্মিত যন্ত্র সকলকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম করিতে ব্যস্ত আছেন, ঋষিগণ অনুভূতি শক্তির সম্পাদন দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনার জন্য কোন পথ অবলম্বনে প্রকৃত সত্য জানা যায়, তাহা পাঠকগণ আপনারা বিচার করিয়া লইবেন। সেকালের বৈদ্যরা অনুভূতির শক্তির সাহার্য্যে রোগীর নাড়ী টিপিয়া রোগের অবস্থা সম্যক নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু হালের বিজ্ঞানে নাড়ী পরীক্ষার জন্য Spygmograph যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি যে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহা নাই, তাহা বুঝি আর সত্যই নহে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসটি বড়ই ভ্রান্তি মূলক।

আর্য্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া মাংস ভোজন ভাল কি মন্দ ইহা কিরূপে বিচার করিতে হয়, তাহা বলিতে চাই। মানুষ যে জাতীয় কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম অনুযায়ী তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদ, দীর্ঘতা বা সূক্ষ্মতার মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ কথাটি ইংরাজী কথায় rhythm of respiration বলা যাইতে পারে। যখন খুব দৌড়াদৌড়ি করা যায়, তখন শ্বাস যে ভাবে বহিতে থাকে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে শ্বাস সে ভাবে পড়ে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার সময় শ্বাস যেরূপ স্থূল ভাবে বহিতে থাকে, প্রগাঢ় চিন্তার সময় শ্বাস সে ভাবে বহে না, চিন্তাকালে শ্বাসের গতি বড় সূক্ষ্ম হয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম করিবার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের তাল এবং সুর ভিন্ন

রূপ ধারণ করে। আহারের সহিত আবার এই তাল এবং সুরের সম্বন্ধ আছে। লঘু আহার কর, আর গুরু আহার কর, এই উভয় অবস্থার শ্বাসের গতির যে বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহা অনেকে জানেন, আবার ভোজ্য পদার্থের বিভিন্নতা জন্য এই শ্বাস প্রশ্বাসের সুর ও তালের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবনে শ্বাস প্রশ্বাসের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাও অনেকে জানেন।

যে রূপ কর্ম্মে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি যেরূপ তালে এবং যেরূপে আহারের সহিত উহাদের একতানতা আছে, ইহাই লক্ষ্য করিয়া কাহার পক্ষে কি আহার উপযোগী এবং কোন আহার অনুপযোগী, তাহাই স্থির করা যায়। মাংস ভোজন জন্য শ্বাস যেরূপ খরভাবে বহিতে থাকে, তাহার সহিত চিন্তা কর্ম্মের শ্বাসের সুরের সহিত একতানতা নাই।

শ্বাস প্রশ্বাবের গতিবিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া আমি ইহা বুঝিয়াছি যে দুগ্ধস্থ শক্তির সহিত মাংসস্থ শক্তির, এমন কি মৎস্য নিহিত শক্তির সহিত একতানতা নাই, এবং ভক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ইহারা পরস্পর বিরোধী বস্তু।

চিন্তার একাগ্রতা সাধন পক্ষে আমিষ ভোজন ব্যাঘাত স্বরূপ। মাংস ভোজনের সহিত চিন্তা শক্তির বেশী চালনায় মাংস ভালরূপ হজম হয় না।

কেবল দুধের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটান সাধারণের পক্ষে চলে না কিন্তু স্থূল কর্ম্মত্যাগ করিয়া মানসিক শক্তির তীব্র চালনায় দিন কাটাইলে কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়, কোন কষ্ট হয় না।

লঘু আহার বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় বড় অনুকূল।

মাংস আহার করিয়া নিদ্রা গেলে যে সকল স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে ভয় এবং কামনা যে পরিমাণে থাকে, নিরামিষ ভোজনে দিন কাটাইলে স্বপ্নে তত ভয় এবং কামনা আসিতে পারে না।

কোন সত্য অনুসন্ধান করিতে গেলে মনকে সেই বিষয়ে স্থির রাখিতে হয়, কিন্তু মাংস ভোজনে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়।

মাংস ভোজনে স্থূল ইন্দ্রিয় সকল সঞ্চালনের ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং সেই জন্য মাংস ভোজন ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু জনের পরম শত্রু।

আমার এই সকল কথা সত্য কি না তাহা যিনি পরীক্ষা করিতে চান, তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু হইয়া আমিষ ভোজন ত্যাগ করুন, কিছুকাল (১ বৎসর ২ বৎসর আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া পরে পরীক্ষা করিবার জন্য দিনকতক আমিষ ভোজন করিয়া দেখুন তাহা হইলেই আমিষ ভোজনের এবং নিরামিষ ভোজনের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবেন। ইন্দ্রিয় সংযমের ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা মাংস ভোজনের দোষ দেখিতে পাইবেন না।

ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার। এক ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী এবং অন্তর্মুখী, অপর প্রকার অধঃ স্রোতস্বিনী এবং বহির্মুখী। আমাদের ন্যায় সাধারণ জনের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল অধঃস্রোতস্বিনী এবং বহির্মুখী। অভ্যাস নিবন্ধন শরীরের শক্তি যে স্রোত পথে চলিতে শিখিয়াছে, উহা সর্ব্বদাই সেই স্রোত পথে চলিতে যায়, অধঃ-স্রোতাভিমুখী শক্তিকে ঊর্দ্ধস্রোতাভিমুখী করিতে পারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; কিন্তু ইহা যে কতদূর দুরূহ তাহা যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মাংস মদ্যাদি সেবনে ইন্দ্রিয় বৃত্তির বেগ বড় বেশী হয়, ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল বড়ই বলবান হয়, তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে জয় লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু ব্যক্তি কামরূপী শত্রুদিগকে মদ্য মাংসাদি সেবন করাইয়া বলশালী করিতে ইচ্ছা করেন না। আমার এই কথা গুলির অর্থ সকলেই যে বুঝিবেন, ইহা আমি প্রত্যাশা করি না, যিনি বুঝিতে পারিবেন, একথা গুলি তাঁহার জন্যই লিখিলাম।

প্রতিবাদ লেখক মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদের শেষভাগে পাঠকগণকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মাংস ভোজন করিতেন না বলিয়াই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মাংস ভোজন না করাই যে কেশব বাবুর মৃত্যুর কারণ, ইহা প্রতিবাদ লেখক কেমন করিয়া জানিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কেশব বাবু প্রথমে নিরামিষ ভোজন করিতেন, পরে হালের ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে মাংসের সুরুয়া খাইতে হইয়াছিল, এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লেখক বুঝাইতে চান যে কেশব বাবু মাংস ভোজন করিতেন না বলিয়াই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু যুক্তিটি বড় অসার বোধ হইতেছে। মদ্য মাংস ভক্ত ডাক্তারেরা কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহার জন্য মাংস ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া নিরামিষ ভোজনই যে কেশব বাবুর অকাল মৃত্যুর কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না, যদি কোন নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বৈদ্য কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তবে তিনি হয়ত তাঁহার জন্য মাংসের শুরুয়ার বন্দোবস্ত করিতেন না। প্রতিবাদ লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—স্বর্গীয় দ্বারিকা

নাথ মিত্র ত নিরামিষ ভোজী ছিলেন না, তবে তাঁহার কেন অকাল মৃত্যু ঘটিল?

নিরামিষ ভোজনে অকাল মৃত্যু ঘটে না, দীর্ঘ জীবীদের সংখ্যা যদি গণনা করা যায়, তবে ইহা দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি দীর্ঘজীবী হইতে চান, তবে নিরামিষ ভোজনই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত। আমার এই কথাটি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্বাস প্রশ্বাস যত শীঘ্র শীঘ্র পড়ে, মনুষ্যের পরমায়ু তত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় পায়, শ্বাস প্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে পড়িতে থাকে, মনুষ্য তত দীর্ঘজীবী হয়। মাংস ভোজনে শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং মাংস ভোজন আয়ু ক্ষয় করে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মাংস ভোজন ব্যতিরেকে যে সুস্থ থাকেন না, একথা মানিতে প্রস্তুত নহি। বরং অধিকাংশ স্থলেই এই-রূপ দেখা যায় যে, যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাংসভোজী তাঁহারা প্রায়ই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। টিণ্ডল হারবার্ট স্পেন্সের প্রভৃতি বিলা-তের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অধিকাংশই অজীর্ণ রোগক্রান্ত। আমার একজন বন্ধু যিনি চিন্তা কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটান, তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে চাই। তিনি একজন বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর ন্যায় আমিষাশী ছিলেন, প্রায় আট বৎসর ধরিয়া অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান, এই আট বৎ-সরের মধ্যে অ্যালোপাথী, কবিরাজী, হোমিওপাথী কোন রকম চিকিৎসারই বাকি রাখেন নাই। ইনি পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ন্যায় মৎস্যজীবী আমিষাশী ছিলেন। কালে কখন মাংস খাইতেন। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রত্যহ মাংস সেবনের ব্যবস্থা হয়,—কেন না

ডাক্তারের মতে মাংস যত শীঘ্র হজম হয়, এত শীঘ্র কিছুই হজম হয় না। এই চিকিৎসার ফলে তাঁহার অজীর্ণ রোগ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাঁহার জীবন ভার বোধ হইযাছিল, ইংরাজীতে যাহকে Hypochondria বলে, তাঁহাব সেই Hypochondria জন্মে। ক্রমে মাংস ভোজনের উপর বিতৃষ্ণ হইযা নিরামিষাশী হন। তিনি যতদিন আমিষাশী ছিলেন দুধ সেবন করিলেই তাঁহার উদরাময হইত। কিন্তু নিরামিষাশী হইয়া অবধি দুগ্ধ ক্রমে ক্রমে সহিতে লাগিল, তিন মাসের মধ্যে তিনি রোগ মুক্ত হন। তিন বৎসরের অধিক হইল তিনি আমিষ ভোজন ত্যাগ করিযা অজীর্ণ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত পাইয়াছেন। মধ্যে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি দিনকত মাংস ভোজন করিযা দেখিযাছিলেন যে মাংস ভোজন করিলেই তাঁহার অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয এবং চাঞ্চল্য উপস্থিত হয। এই সব দেখিযা আমার ইহা ধারণা হইয়াছে যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে আমিষ ভোজন বড়ই প্রয়োজনীয়, একথাটি বড় ভুল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার মালা গাঁথা।

(বঙ্গদর্শন—১২৮৪ সাল, আষাঢ় হইতে উদ্ধৃত)।

এক ছড়া মালা গাঁথিতে বড়ই সাধ হ'লো। সূর্য্যমুখী এতক্ষণ মুখ তুলিয়া আকাশ পানে চাহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আস্তে আস্তে মস্তক অবনত করিল, আমি ও মালা গাঁথিবার জন্য এক-গাছি সূতা লইয়া মুক্ত দ্বার দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে কাহারও নিষেধ নাই, সাধারণের জন্যই বাগানটি প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধ্যার মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের পাতাগুলি অল্পে অল্পে দুলিতে লাগিল, ঝিল্লিগণের ঝাঁ ঝাঁ রব মধুর বোধ হইল, আর সেই সঙ্গে আমার ও হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আমি যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন দ্রব্য হারাইয়াছি কিন্তু কি যে সে দ্রব্য তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম না। অনেক প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম কিংশুকে যদি গন্ধ থাকিত, সুপক্ক ফল যদি না পচিত, বিদ্যুতের আলোক যদি নয়নস্নিগ্ধকর হইত, আর আমার যদি এই সকল পুষ্পের ন্যায় ভুবনমোহিনী শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় দেখি কতকগুলি শুষ্ক ফুল ভূপতিত হইল। পতন-

কালীন সরসর শব্দে যেন বলিতে লাগিল—Memento horæ novissimæ (Remember the last lover) এই উপদেশবাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন স্মরণ করিলাম, তখন বুঝিলাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি হউক—কালি হউক—দুদিন পরে হউক, এই বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। পতনকালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, সদ্গন্ধ দানে কত লোকের চিত্তসন্তোষ করিয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া ধ্বংস হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি—আমি সদ্গন্ধ বিতরণে কয় জনের চিত্ত সন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছি? কাহারও নয়। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম? যখন আমার এই জীবন বুদ্বুদ কালস্রোতে মিশাইবে তখন কি হাসিতে পারিব না? যাহা হউক আর ভাবিব না, মিছা ভাবনায় সব ভুলিয়া গিয়াছি। হাতের সূতা হাতেই রহিয়াছে, মালা ত গাঁথা হয় নাই।

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছে, আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া ফোটে ফোটে হইয়াছে। মল্লিকাসুন্দরী দেখিল যে ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনমোচন করিল—আপনার গন্ধে আপনি ঢলিয়া পড়িল। ঐ ঢলে পড়া ভাব আমি বড় ভালবাসি। নিজের গুণ মনে মনে জেনে যে নম্র ভাব ধরে, তারে বড় ভালবাসি। মল্লিকে! ক্ষুদ্র বৃক্ষে তোমার জন্ম, ঐ বিদেশী আরোকেরিয়া, উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার সৌন্দর্য্য নাই—কুক্কুর পলাশের ন্যায় বর্ণও

নাই, কিন্তু তবু আমি তোমারে বড ভালবাসি—তোমার ঐ সাদা রং ও সদ্গন্ধ আর ঐ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। শুনিতে পাই সরল মনের সহিত সবল মনের বিনিময় সহজেই হয—তোমার নিজের মন আমি চিনিতে পারিলাম না—জানি না সরল কি গরলময়, কিন্তু বোধ হয় তোমার উপর যেরূপ সাদা অন্তর ও সেইরূপ নহিলে তোমার ঐ ঢলে পড়া ভাব থাকিত না। তুমি গর্ব্বিতা হলে তোমার সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার নিকট এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেই-রূপ নও, সেইজন্যই তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি। মল্লিকে! আজি আমার কৌতুহল নিবারণ করিতে হইবে। মল্লিকে! বল দেখি, জগজ্জন মনোহর ঐ সদ্গন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? ঐ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দন কাননের সুখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে এই জন্যই কি তুমি তোমার গন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া পরের সুখ বর্দ্ধন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মনে ভাবিলাম মধুর হাসি হাসিয়া মল্লিকা বলিল—আমার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপর নহে। গন্ধ বিতরণে আমার নিজের লাভ কি? তবে বলি শুন—এ সংসারে তুমি একা—সংসার বন্ধনে বদ্ধ না হয়ে উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কামিনীগনের মনের ভাব তোমায় কিরূপে বুঝাইব? আমরা চাই জগৎশুদ্ধ সকলে আমাদের ভাল বাসিবে, মানবগণ নিজ নিজ হৃদয় কাননে আমাদের যত্ন সহকারে রোপন করিবে, আমাদের জল সেচনে পরিবর্দ্ধিত করিবে; এখন বল দেখি আমার ঐ

গন্ধটুকু না থাকিলে কে আমায় ভাল বাসিত? সকলে ভাল বাসিবে—এই সুখের আশা যদি না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই এরূপ গন্ধ বিতরণ করিতাম? আমার অভিপ্রায় স্বার্থ-শূন্য নহে। স্বার্থশূন্য এজগতে কেহই নহে।

স্বার্থশূন্য কি কেহই নাই—হতেও পারে। গ্রামের মধ্যে বড় লোক—বড় পরোপকারী শশীবাবু অতিথি প্রতিপালন করিতেছেন—কেন? নিজে প্রশংসা পাবেন বলে, আর নিজের মনের সুখ সাধনের জন্য। এই যে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর করিয়া মুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু মুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয়। যদি অন্যরূপে হাতের পুষ্টিসাধন হইতে পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের সহিত সুচিক্কণ দন্তাবলী পরিবেষ্টিত মুখের প্রণয় থাকিত কি না বলিতে পারি না।

যেখানে যাই সেইখানে দেখি সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত আমিও নিজের তুষ্টি সাধনেব জন্য মালাটি গাঁথিয়া শেষ করিলাম। এখন মালাটি গাঁথিযা শেষ করিলাম। এখন মালাটি নিজে পরিব অথবা অন্য কাহাকে ও পরাইব ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। নিজের গাঁথা মালা নিজে পরিতে ইচ্ছা হইল না। আমাব গাঁথা মালা আর এক জনের গলে দিয়া নয়ন ভরিয়া তাহার শোভা দেখিব—মনে মনে এই বাসনাই প্রবল হইল। কিন্তু এ মালা কার গলে পরাইব এ মালা গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে? অন্ধকারে বসিয়া মোটা সুতায়, কি ফুল তুলিতে কি ফুল তুলিয়া, এই যে মালা গাঁথিলাম এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। তবে পরের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে? আর পরেই বা আদর করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে? আদর—আদর এই

কথাটি বড় মিষ্ট, আমি যে আদর বড় ভাল বাসি। যে আদর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রণয়িণীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়—আর মুখে মধুর হাসি দেখা দেয়—বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর মাখান তিরস্কার করিয়া থাকে।—সেই আদর ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটি লইবে? সেই আদর মাখা বচনে কে আমায় বলিবে ও ফুলটির বদলে আর একটি ফুল বসাও—ওফুলটী ছিঁড়িয়া ফেল—এই স্থানটি বেশ হইয়াছে—ওখানটি ভাল হয় নাই, কে ঐরূপ আদর করিয়া আমার পরিশ্রম সকল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি কেহই নাই? থাকিতেও পারে যখন তেমন লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত মালা গাঁথিয়া পরাইব—এখন এই সূত্রে নিবদ্ধ কানন কুসুম নিচয়কে মাতা বসুমতীর করে সমর্পন করিব। ফুলগুলি খুলিয়া মাটিতে ছড়াইলাম।

২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইযাছিল। এইটি আমার প্রথম লেখা, উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পন্থা পত্রিকাতে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

এই সংসার কাননে; কর্ম্মসূত্র হাতে করিয়া কার্ম্মের মালা গাঁথিতে আসিয়াছি কিন্তু এই কর্ম্মের মালা নিজে পরিবাব সাধ নাই। আমার গাঁথা মালা আর একজনের গলে দিব, তিনি উহা আদর করিয়া লইবেন তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইব; এই টুকুই আমার মালা গাঁথার স্বার্থ। যাঁহার গলে আমি আমার কর্ম্মের মালা পরাইতে চাই, তিনি আমার ইষ্টদেবতা তিনি আমার আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা। তিনি আমার অন্তরে বাস করিতেছেন কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনি না। তাঁহাকে খুঁজিয়া

মালা পরাইব াহাই এবারে সংকল্প করিয়াছি, মালা আর ছিঁড়িব না, ছিঁড়িতে গেলে ও ছিঁড়িতে পারিব না। এবারে যে মালার কথা লিখিতেছি এমালা যে একবার গাঁথিলে আর ছেঁড়া যায় না। বুদ্ধি স্বরূপ ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, কর্ম্মের মালা ইষ্টদেবতার হাতে সমর্পণ করিয়া, সেই দ্যুতিময়ের দ্যুতি দর্শনে সাধকের যে আনন্দ উহাই সাধকের প্রকৃত স্বার্থ। এই স্বার্থসাধনাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংসার চক্র।

পূর্ণিমাতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করায় আমার এক বন্ধু বলিলেন "সংসার চক্র" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ। আমি তাহাই স্বীকার করিয়া "সংসার চক্র" নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

আমার বাসাতে একটি কদম্ব গাছ আছে, কি লিখিব তাই ভাবিতে ভাবিতে ঐ কদম্ব গাছটির দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকায় আমার মন তিনটি কথা লইয়া কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গেল। ১ম কথা পূর্ণিমা, ২য় কথা সংসারচক্র, ৩য় কথা কদম্ব বৃক্ষ।

পঞ্চশত শতাব্দী গত হইয়াছে, একদিন পূর্ণিমার নিশিতে কদম্ব তরুমূলে সংসারের বীজপ্রদ পিতা গোপীগণ সহ রাসচক্রে যে বিহার করিয়াছিলেন সেই কথা মনে আসিল। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বন করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রকারগণ এইকথা বলেন যে ভগবান যোগমায়া অবলম্বন করিয়া এই সংসার-চক্র ঘুরাইতেছেন—অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য করিতেছেন। যোগমায়া সংসার চক্রের মূলশক্তি এবং এই যোগমায়াই রাসলীলার মূলশক্তি, এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইয়াছে যে রাসলীলার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেই সংসার চক্রের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু

সেই রহস্য যে কি তাহা আমি সম্যক্‌ বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং পাঠকগণকেও বুঝাইতে পারিব না, তবে রাসলীলা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যে গুটিকত কথা আমার মনে আসিয়াছে তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ফুল্ল জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার নিশিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া আশ্রয় করিয়া কামবীজ পূরিত মধুর গীতিধ্বনি করিলেন, ঐ গীতিধ্বনি ব্রজবাসিনী গোপীগণের মন হরণ করিল। সেই স্বর—

'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলো গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

গোপীগণ সেই স্বরের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, অভ্রান্ত যৌবন নন্দনকাননের সমীপে রতিপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন, পতি সেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ইহা বুঝাইলেন, গোপীগণ কিন্তু তাহা বুঝিলেন না। লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ যোগমায়া অবলম্বনে নন্দন কাননের শরীর এখন এক বৈদ্যুতী শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে গোপীগণের সাধ্য নাই, তাঁহার সকল দৃষ্টিতে মুহুর্মুহুঃ সেই কিশোর কুমারের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে চন্দ্রপ্রভবয়ি, সেই গোপাল বালকের হৃদয়স্থ সূর্য্যপ্রভ প্রাণের সহিত মিশাইবার জন্য বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, এই দুই হৃদয়ের প্রেমের তরঙ্গ একত্র মিলিয়া যমুনার চন্দ্রকিরণে সিক্ত বারির কল্লোলের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে, গ্রহ নক্ষত্র খোচিত আকাশ ভেদ করিয়া কোথায় কোথায় কোথায়—কিসের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর গোপীগণ মনে

করিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত এবং ইহা হইতেই তাঁহাদের মনে অহঙ্কার জন্মিল, ভগবান অন্তর্দ্ধান হইলেন। গোপীগণ বিরহ কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অন্য এক নায়িকার পদচিহ্ন মাত্র দেখিয়া বুঝিলেন যে সেই সৌভাগ্যশালিনী নায়িকাই কৃষ্ণের পরমাপ্রেয়সী। গোপীগণ বিরহ যাতনা ভোগ করিয়া অহংকার শূন্যা হইলে ভগবান পুনরায় তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদের রতিকামনা পূর্ণ করিলেন।

যোগমায়া খেলা দেখ। শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রীর হৃদয়ের রতি কামনা পূর্ণ করিলেন কিন্তু যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই কাম লীলার নিবৃত্তি হইল তাহা অপার্থিব। ভগবান, নন্দ-নন্দনের স্বচ্ছ দেহ ছাড়িয়া, যতগুলি গোপী ততগুলি অমল শ্যাম সুন্দর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া একই সময়ে সমস্ত ব্রজগোপীগণের মনস্কামনা পূরণ করিয়াছিলেন।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপ যোষিতঃ
বরাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামপালীলয়া।

ভাগবত। ১০। ৩৩।২০

ভগবানের সহিত ব্রজ গোপীগণের রমণ স্থূল শরীরের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের সম্মিলন। এই সম্মিলন স্থলেই রাসলীলার পূর্ণ রস এবং পূর্ণ পবিত্রতা। এই রমণ গোপীগণের মন্ত্রদীক্ষা এবং ইষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগ।

স্থূল শরীর মনুষ্যের সহিত, সূক্ষ্ম শরীরী দেবতার মিলন হইলে সাধক দিব্য শ্রবণ লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব ধ্বনি তাহার হৃদয়াকাশে শুনিতে পান। সাধারণতঃ বুকের মাঝে যে লপ্‌ ডপ্‌ শব্দ হইতেছে

এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যে হাঁস ফাঁস শব্দ হইতেছে, তখন সেই শব্দ আর থাকে না, সাধকের কানে তখন শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি বাজিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি যে ভাবের সাধক সেই ভাবানুযায়ী বীজমন্ত্র তিনি শুনিতে পান। এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধরিয়া রাখাই এই অপার্থিব দিব্য রতির আনুসঙ্গিক গর্ভধারণ। কি পুরুষ হৃদয় কি রমণী হৃদয় উভয়ই এই বীজ ধারণাপযোগী ক্ষেত্র এবং ঈশ্বরের কাছে সকলের হৃদয়ই স্ত্রী। এই মন্ত্র বীজ ধারণ করিতে পারিলেই প্রকৃতি অন্তঃস্বত্বা হইতে পারা যায়, কেন না তাহা হইলেই স্বত্ব গুণ অন্তরে উদিত হয এবং উপাসক অন্তরের জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন।

গোপীগণ কাম ভাবের সাধক ছিলেন, আমার মনে হয় যে বৃন্দাবনের রাসলীলার ফল গোপীগণের কামবীজ মন্ত্র লাভ।

গর্ভধারনেই রমণীর কাম নিবৃত্তি হয়। গোপীগণ রাসলীলার যে বীজ পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া কামের পরানিবৃত্তি লাভ করিয়া সংসার চক্র হইতে মুক্তা হইয়াছেন এবং সকল জীবের উদ্ধার জন্য কালের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং:--

আপনার সম্পাদিত 'পন্থা' পাঠে অনেক তথ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইয়াছে, কিন্তু তাৎপর্য্য উপলব্ধি মাত্রেই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। কার্য্যতঃ তাহা জীবনগত করিতে না পারিলে স্থায়ী ফল লাভ হয় না। যদি মহোদয়ের পরিচিত কোন মহাত্মার কৃপায় এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোথায় কিরূপে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতে পাবে জানাইলে চির বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

উত্তর।

মহাজন সাক্ষাৎ জন্য আপনার আগ্রহ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি; এই আগ্রহ যতই তীব্র হইবে ততই আপনি মহাজন সাক্ষাতের পথে অগ্রসর হইবেন। মহাজন সাক্ষাতের ঐ একমাত্র পথ। আমি এখন যদি আপনাকে কোন মহাজনের নাম ধাম বলিয়া দিই, তবে তাঁহার উপর আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা না হইতে পারে, কিন্তু আপনার আগ্রহ তীব্র হইলে যিনি আপনার গুরু তিনি সুক্ষ্ম শরীর ধারণে আপনার ললাটদেশে দেখা দিবেন।

মন, দ্বিদলে বিরাজ করে কে রে;
মন, খুঁজে নেনা তারে।
মন, দ্বিদলে বিরাজ করে যে রে।
দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, পথের পরিচয় রে,
যে গুরু সেই কল্পতরু ললাটের ভিতরে।
মন, খুঁজে নেনা তারে।

আপনি বৈষ্ণব অথবা শাক্ত কোন সম্প্রদায় ভুক্ত কিনা? যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যাঁহার উপর ভক্তি হয়, এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিধিমত সাধনা করুন। কাম ও ক্রোধ জয় করাই যেন সাধনার উদ্দেশ্য হয়। সাতবৎসর এইরূপ সাধনার পর ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে গুরু দেব সাক্ষাৎ দিবেন।

যদি হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত কোন লোকের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পরাবিদ্যার্থী সমিতিতে প্রবেশ করুন। মন্ত্র সাধনার পথ দেখাইবার উপযুক্ত লোক এই সমিতির মধ্যে আছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চভূত।

(হিন্দুমত সমর্থন)।

এই জড় জগৎ যে সামান্য উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করিতে গিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোমকে পাঁচটি সামান্য উপাদান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও সেই সামান্য উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে ৬৮টি সামান্য উপকরণে এই জড় জগৎ রচিত। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ত তাঁহাদের ভ্রম দেখিতেছি না, সুতরাং আধুনিকের বিশ্বাস যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে পাঁচ ভূতের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের জড় জগতের উপাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। তাঁহারা যে ক্ষিতিকে একটি সামান্য উপাদান বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা ৬৮টি এলিমেণ্ট গঠিত। অপ্ অক্সিজন হাইড্রোজনের সমষ্টিতে প্রস্তুত তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তেজ ত পদার্থই নহে; এই সব নানা কারণে প্রাচীন পণ্ডিতদের উপর লোকের শ্রদ্ধা হীন হইতেছে।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ তর্ক করেন, তাঁহাদের এই কথা বলিতে চাই যে, কপিলাদি যে সমস্ত ঋষিগণ পঞ্চ ভূতের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা চিন্তাশীলতায় উন্নত বই অবনত ছিলেন না। তাঁহারা কিরূপ চিন্তা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্চ ভূতকে জড় জগতের সামান্য উপকরণ স্বরূপ স্থির

করিয়াছিলেন, যে বিষয়ে অনুসন্ধান না করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের কথার আপাতবৈষম্য দেখিয়াই তাঁহাদিগকে মূর্খ স্থির করা যুক্তি সঙ্গত হয় না।

ঘরে একখানি গালিচা বিছান রহিয়াছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম বল দেখি কত রকম সূতায় এই গালিচা খানি নির্ম্মিত? সে দেখিল পশমের সূতা, পাটের সূতা এবং তুলার সূতা এই তিন রূপ সূতার গালিচা নির্ম্মিত, সুতরাং সে উত্তর দিল যে, তিন রকম সূতার এই গালিচা নির্ম্মিত। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, রাঙ্গা কাল হলিদা ইত্যাদি দশ রকম সূতার গালিচা নির্ম্মিত। সুতরাং যে বলিয়াছে যে তিন প্রকার সূতায় নির্ম্মিত, তাহাকে যদি একেবারেই ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করি, তবে বাস্তবিক মূর্খ কে?

বাস্তবিক যে রূপ বিভাগ প্রণালী অবলম্বনে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জড় জগতের কারণ অনুসন্ধানে রত ছিলেন এবং যেরূপ প্রণালী অবলম্বনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, উভয় পথ সম্পূর্ণ পৃথক। বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরস্পরের সহিত যে রাসায়নিক আকর্ষণ আদি সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাকেই বিভাগ প্রণালীর মূল (Foundamentum Divisions) ধরিয়া অনুসন্ধান করা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ, কিন্তু বহির্জগতের পদার্থ সমূহের অন্তর্জগতের সহিত যে সম্বন্ধ থাকাতে আমার পক্ষে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বিভাগ-প্রণালীর মূল ধরিয়া অন্বেষণ করা প্রাচীন পণ্ডিতগণের অবলম্বনীয় পথ। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এবং আধুনিক বিজ্ঞানে যাহা বলিতেছে, তাহাতে আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্য দেখিয়াই প্রাচীন কথায় অগ্রাহ্য করা একেবারে উচিত নহে।

এক্ষণে প্রাচীন মুনিগণ কি অর্থে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখা যাউক। আমরা আজ কাল যাহাকে মাটী জল তেজ বায়ু বা আকাশ বলি, পঞ্চ মহাভূত অর্থে তাহা বুঝায় না। আমরা যাহাকে মাটি বলিয়া বুঝি, তাহাও ক্ষিতি অপ্‌ তেজ্‌ মরুৎ ব্যোম্‌ এই পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিতে গঠিত। যা কিছু স্থূল জড়পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, সকলেই এই পাঁচ মহাভূতের মিশ্রিত অবস্থা। হিন্দুশাস্ত্রমাত্রেরই পঞ্চভূত সম্বন্ধে এই কথা পাওয়া যায়। যদি সকল জড়পদার্থই পঞ্চভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন, তবে অবিমিশ্র ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম্‌ কাহাকে বলে?

সাংখ্যশাস্ত্রমতে শব্দগুণ সমন্বিত আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বায়ুর গুণ স্পর্শ, বায়ুর বিকারে তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজের গুণ রূপ. তেজের বিকারে অপ্‌ উৎপন্ন হয়, সেই অপের গুণ রস এবং সেই অপের বিকারে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। সেই ক্ষিতির গুণ গন্ধ।

ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতে প্রত্যেক স্থূল জড় পদার্থই যাহা রূপ রসাদি পঞ্চগুণ জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, এরূপ পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত। একের গুণ,—গন্ধ, শাস্ত্রকারগণের মতে ইহারই নাম ক্ষিতি। অন্যের গুণ—রস, ইহারই নাম অপ্‌। অপরের গুণ—রূপ, ইহারই নাম তেজ। আর একটি গুণ—স্পর্শ, ইহারই নাম বায়ু এবং শেষ উপাদানটির গুণ—শব্দ, ইহারই নাম আকাশ।

হিন্দুশাস্ত্র সমূহ মতে প্রত্যেক স্থূল পদার্থই এই পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে গঠিত। অবিমিশ্র ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম্‌ একটি একটি পৃথকরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কেবল যোগযুক্তাত্মা যোগী

জনেরই আয়ত্তাধীন। এই কথাটি প্রমান জন্য শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম॥

"ক্ষিতাপ্তেজোনিলখে সমুত্থিতে।
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে॥
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥"

তন্ত্রে যে সমস্ত যোগের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে যোগী প্রথমে ক্ষিতি তত্বের উদ্ভাবন করিবেন। পরে সেই গন্ধগুণাত্মক ক্ষিতিতত্ব অপতত্বে লীন করিবেন। সেই অপতত্ব তেজে এবং তেজস্তত্ব বায়ুতে এবং বায়ুতত্ব শব্দগুণাত্মক আকাশতত্বে লীন করিয়া শব্দ-ব্রহ্মে-যুক্তাত্মা হইবেন।

শাস্ত্রোক্ত ক্ষিত্যপতেজাদির অর্থ মাটি জল আগুণ ব্যতীত যদি আর কিছু না হয়, তবে শাস্ত্রসমূহের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলের অর্থই নাই। এবং এরূপ অর্থশূন্য বাক্য শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া মূর্খতার পরিচয় দেওয়া শাস্ত্রকারগণের কখনই উদ্দেশ্য নহে। পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আছে, তাহা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জন্মিয়াছে। এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের রূপ রসাদি গুণ সকল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় এবং সেই সমস্ত গুণের আধার বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানটিই দ্রব্যজ্ঞান। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই ভিন্ন ভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধার আছে বলেন, যথা গন্ধ গুণের আধার ক্ষিতি, রস গুণের আধার অপ্, রূপ গুণের আধার তেজ, স্পর্শ গুণের আধার বায়ু এবং শব্দ গুণের আধার আকাশ। সমস্ত স্থূল জড় পদার্থই এই পাঁচ প্রকার দ্রব্যের সমষ্টিতে গঠিত, তবে কোন্ পদার্থে

একের আধিক্য এবং কোনটিতে বা অপরের আধিক্য দেখা যায়। যথা উদ্ভিদ এবং জীব শরীরের স্থূল অংশ যাহা অল্পমাত্র বিকৃত হইলেই গন্ধ উদ্ভূত হয়, তাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক আছে। জল এবং উদ্ভিদের রস ইত্যাদি যাহা রসনার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই বিকৃত হয়ত আমাদের রসানুভব করায়, তাহাতে অপ্ পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। যাহা না থাকিলে দ্রব্যের গন্ধ গুণ থাকে না, তাহারই নাম ক্ষিতি, ক্ষিতি অর্থে মাটি নহে। যাহা না থাকিলে দ্রব্যের রস গুণ থাকে না, তাহার নাম অপ্, যাহা না থাকিলে দ্রব্যের রূপ গুণ থাকে না, তাহার নাম তেজ; যাহা না থাকিলে দ্রব্যের স্পর্শ গুণ থাকে না, তাহার নাম বায়ু। (সাধারণতঃ আমরা বায়ু অর্থে যাহা বুঝি, তাহার সহিত পঞ্চভূতের মরুতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে যে, বাতাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা তাহার গন্ধ রস বা রূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাহার স্পর্শের উপর নির্ভর করে)। এবং যাহা না থাকিলে দ্রব্যের শব্দ জ্ঞান জন্মে না, তাহারই নাম আকাশ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথাবার্ত্তা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিলেন যে, একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নিবন্ধনই দ্রব্যের রূপ রসাদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ, সুতরাং ক্ষিতির অর্থ এরূপ হয় যে—যাহা না থাকলে দ্রব্যের গন্ধজ্ঞান জন্মায় না, তাহার নাম ক্ষিতি,—তবে ক্ষিতিকে স্বতন্ত্র এক দ্রব্য না বলিয়া শক্তিবিশেষ বলাই যুক্তি সঙ্গত হয়।

ইহার উত্তর দিতে গেলে দ্রব্য (Matter) ও শক্তি এই দুই কথায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন এবং প্রাচ্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন, তাহার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে এবং সে অনেক কথা, সুতরাং সে কথা এখন থাক্।

ক্ষিতিকে যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শক্তি বলিতে চান বলুন, তাহাতে বেশী ক্ষতি নাই, কিন্তু এই শক্তি কিরূপ তাহাও ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন ও পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রাচীন যোগীগণের প্রথম আলোচ্য পদার্থই এই পঞ্চভূত। যে যে শক্তি বা যে যে পদার্থ জন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণ, সেই সেই শক্তির বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়াই সাংখ্য যোগীর প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ইলেক্ট্রিসিটি নামক পদার্থ বা শক্তি জন্য মেঘে বিদ্যুৎ খেলে, এই কথা বলিলেই তাড়িৎ শক্তি সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ যে শক্তিবশতঃ দ্রব্যের গন্ধ, তাহার নাম ক্ষিতি এই কথা বলিলেই ক্ষিতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সব বুঝা হইয়াছে, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না।

ষ্টটগার্ডের ডাক্তার ইয়গার সাহেব গন্ধের হেতু যে পদার্থ, তৎসম্বন্ধে কতক পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উদ্ভিদ এবং জীব জন্তুর জীবনে উক্ত পদার্থ সারস্বরূপ। ডাক্তার ইয়গার ওডোরিজেন নাম দিয়াছেন। আমরা ক্ষিতিশব্দে যাহা বুঝা যায় বলিয়াছি, এই ওডোরিজেন শব্দে ও তাহাই বুঝায়। ডাক্তার ইয়গারের মতে প্রত্যেক জাতীয় জীব শরীরে এক রকম গন্ধ দ্রব্য আছে, যাহা অন্য জাতীয় জীব শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। মনুষ্যের শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য অন্যান্য পশু শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু একজন মনুষ্যের শরীরের গন্ধ হইতে অন্য মনুষ্যের শরীরের গন্ধ হইতে পৃথক হইলে ও এক রকম। মনুষ্যের রক্তে কোন দ্রাবক দিলে যেরূপ গন্ধ পাওয়া যায়, অন্য জীবের রক্তে দ্রাবক ঢালিলে সে রকম গন্ধ পাওয়া যায় না। খানিকটা রক্ত লইয়া তাহাতে কোন দ্রাবক ঢালিয়া দিয়া কেবলমাত্র গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা কোন্ জন্তুর রক্ত তাহা

ঠিক করিতে পারা যায়। কেবল রক্ত কেন শরীরস্থ যে কোন অংশ লইয়া এবং তাহাতে কোন দ্রাবক ঢালিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে, সব স্থলেই একই রকমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা কোন্ জন্তুর শরীরের অংশ পরীক্ষা করা যাইতেছে, তাহা বুঝা যায়। এই সব দেখিয়া ডাক্তার ইয়গার বলেন যে, যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য জীব শরীরে দেখা যায়, তাহাই জীবের জীবনের প্রধান কারণ। জীব শরীরে যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য আছে, তাহা অন্ন আদি যে সকল দ্রব্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতেছে, তাহার গন্ধ হইতে পৃথক। যে জীব এক রকম আহারে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আহার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিলে তাহার শরীরের সেই বিশেষ গন্ধ যেমন তেমনই থাকে। সুতরাং এই গন্ধ অন্নপানীয়াদির গন্ধ জনিত নহে। জীব জন্মকাল হইতেই সেই বিশেষ গন্ধ দ্রব্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই গন্ধের সহিত যে সকল পদার্থের গন্ধের মিল আছে, তাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইতর জন্তুগণ গন্ধদ্বারা কোন্ দ্রব্য তাহাদের প্রাণধারণের উপযোগী এবং কোন দ্রব্য নয়, তাহা বুঝিয়া লয়।

বাইও-লজিষ্ট্রা বলেন যে, জীব শরীরে প্রোটোপ্লাজম্ নামে যে পদার্থ আছে, তাহাই আমাদের জীবনের কারণ, কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম উদ্ভিদ শরীরে ও যেরূপ, জন্তুগণের শরীরেও সেইরূপ এবং মনুষ্য শরীরে ও ঠিক সেই রকম, অর্থাৎ রাসায়নিক এলিমেণ্ট সব প্রোটোপ্লাজমে সমান আছে, এবং তাহাদের আকৃতি আদি ও সমান। তবে এক রকম প্রোটোপ্লাজম হইতে গাছ আর এক রকম হইতে মানুষ জন্মে কিরূপে? এ সম্বন্ধে বাই-ও-লজিষ্টরা—কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। ডাক্তার ইয়গার বলেন যে প্রোটো-

প্লাজম সকল রাসায়ণিক এলিমেণ্ট সম্বন্ধে এবং আকৃতি আদিতে পরস্পর বিভিন্ন না হইলে ও এক জাতীয় জীরের প্রোটোপ্লাজম অন্য জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম হইতে বিভিন্ন। এক জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম যে গন্ধ দ্রব্য-সমন্বিত, অন্য জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম সে গন্ধ দ্রব্য-সমন্বিত নয়। এবং এই জন্যই একটি হইতে একরূপ জীব এবং অন্যটি হইতে অন্যরূপ জীব জন্মিয়া থাকে। এই সব কারণে তিনি দেখাইতে চান যে, তিনি যাহাকে (Odougen) বলেন এবং প্রাচ্য পণ্ডিতগণ যাহাকে ক্ষিতি বলিয়াছেন, জীব জীবনের সার ভাগ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ফুরণ দ্বারা এক জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত অন্য জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ কাহার সহিত কাহার মিল আছে এবং কাহার সহিত কাহার মিল নাই, এই সমস্ত অনুসন্ধান করিলে যে জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামান্য সামান্য পশু সকল রোগ উপস্থিত হইলে গন্ধের সাহায্যে ঔষধ বাছিয়া লয়, কিন্তু আজকালকার উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য হতভাগ্যগণ ঔষধের গুণ জানিবার জন্য জন্তুগণের শরীরে তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া অকাতরে কত শত জন্তুর প্রাণ সংহার করিতেছেন। ধিক এমন সভ্যতার।

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্ষিতিতত্বকে জীবের জীবনের সার স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ উহাকে ঋতু আদির সার ভাগ স্বরূপ ও বলেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক প্রত্যেক ধাতুর যে এক বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে, সেই জন্যই এক প্রকার ধাতু সর্ব্বদাই একই আকারে দানা বাঁধে এবং অন্য প্রকার ধাতু অন্যরূপ আকারে দানা বাঁধিয়া থাকে।

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্ষিতিতত্ত্বকে পদার্থ সমূহের সংবাদ স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ও সেইরূপ ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পাঁচটিকেই জড জগতের সারাংশ স্বরূপ স্থির করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আজ কাল দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে এই রূপ বুঝিয়াছি যে দ্রব্যের গুণ দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ কোন না কোন গতি ক্রিয়া মাত্র। দ্রব্যের রূপ রসাদি গুণ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় তাহা কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া জনিত জ্ঞান মাত্র। এই গতি ক্রিয়ার আধারের নাম বস্তু বা দ্রব্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই জডজগতের সমস্ত ঘটনাই যে কোন এক মাত্র আধারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া (motion), ইহাই প্রমাণ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছেন।

যাহাকে আমরা আলোক বলি তাহা ইথর নামক দ্রব্যের অনু সকলের কম্পন জনিত, ইথর সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ইথর সমুদ্রের তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর স্নায়ুতে আঘাত করাতে যে স্নায়বীয় কম্পন জন্মে তাহাতেই আমাদের আলোক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া পাশ্চাত্যগণকে ইথর নামক এক প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ ইথরের কম্পন জন্য দ্রব্যের বর্ণ বিষয়ক গুণ জন্মিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন রূপ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে তেজ নামক এক প্রকার বস্তু আছে, এবং তাহা থাকাতেই দ্রব্যের রূপ গুণ জন্মিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা আর হিন্দু শাস্ত্রকারগণদের কথা মিলাইয়া দেখিলে

একজ্জনদের ইথর আর একজনদের তেজ দুটি যে একই অর্থবোধক ইহা বোধ হয়।

দ্রব্যের বর্ণ বিষয়ক জ্ঞান যেমন আমাদের স্নায়ুর কম্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে,সেইরূপ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ক জ্ঞান ও স্নায়ুর কম্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে। যে প্রকার অন্থুর কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর কম্পন জন্মে, তাহার নাম যেমন ইথর বা তেজ, সেইরূপ অন্থুব কম্পনে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর কম্পন জন্মে তাহার নাম ক্ষিতি। যেরূপ অন্থুর কম্পনে রসেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর কম্পন জন্মে তাহার নাম অপ, এবং অন্যান্য ভূত সম্বন্ধে ও এইরূপ।

হিন্দু ঋষিগণের মতে এই পাঁচ প্রকার ভূতের অন্থু লইয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দুদের এইমত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা, এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মে নাই। হিন্দু ঋষিগণ সূক্ষ্মানুভূতি শক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যেমন যেমন অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যদি কেহ তাঁহাদের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তবে দ্রব্যের পরমাণু সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ তথ্য অবগত আছেন, তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে। আজকাল পাশ্চাত্যগণ স্পষ্টই স্বীকার করেন যে যদিও তাঁহারা দ্রব্যের পরমাণু সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে দু এক কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের সূক্ষ্ম পরমাণু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান (Knowledge of the ultimate nature ef atoms) কিছুই নাই।

হিন্দু ঋষিগণের পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় মতকে যখন ভ্রান্ত বলিতে পারি না, তখন তাঁহারা বাহ্য বলিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থ পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানের সাহায্যে যতদূর বুঝিতে পারা যায় ততদূর বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

এই জড় জগতে যাহা কিছু পাই সকলই একই প্রকার বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া মাত্র, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা প্রমান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ যাহা আজকাল ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, কত শত কাল পূর্ব্বে সাংখ্যকার তাহাই অভ্রান্ত জ্ঞানে শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যে একমাত্র আকাশভূত হইতেই বায়ু তেজ, অপ ও ক্ষিতিভূত উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রকার পরমাণু লইয়াই এই বাহ্য জগৎ দৃষ্ট হইযাছে। আকাশ মহাভূতের বিকারে বায়ু, বায়ুর বিকারে তেজ এবং তেজের বিকারে অপ ও অপের বিকাবে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে।

এই বিকার কথাটির অর্থ প্রথমে বুঝিতে হইবে। মৃত্তিকাব রাশি হইতে কিয়দংশ মৃত্তিকা লইয়া তাহাতে একটি বিশেষ আকাব দিয়া একটি ঘট নির্ম্মাণ করিলাম। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐ ঘটকে মৃত্তিকার বিকার বলিয়া থাকেন। সমুদ্রের জল রাশির মধ্যে কিযদংশে জল আবর্ত্তাকারে পরিণত হইলে ঐ বিশেষ আকার প্রাপ্ত আবর্ত্তকে সমুদ্রের বিকার বলা যায়। সেইরূপ ঋষিগণ যখন বলেন যে আকাশের বিকারে বায়ু উৎপন্ন হয়, তখন উহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আকাশের অণু সকল হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়, কিন্তু বায়ুর একটি পরমাণু কোন বিশেষ আকার পাওয়াতে আকাশ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হয়।

যে পরমাণু শব্দটি ব্যবহার করিলাম তাহা কি অর্থে ব্যবহার করিলাম তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। খানিকটা বায়ুকে ক্রমা-

শত ভাগ করিতে করিতে এমন যে সূক্ষ্ম অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে পুনরায় ভাগ করিতে গেলে তাহার বায়ুর গুণ আর থাকিবে না, তাহাকে বায়ুর পরমাণু বলা যায়। ইংরাজি Atom শব্দের অর্থ যাহাকে ভাগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু যতই সূক্ষ্ম অংশ হউক না ইহা কল্পনা করিতে পারি না। ইংরাজি Atom কথাটির আর আমাদের পরমাণু কথাটির অর্থের পার্থক্য জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বায়ুর একটি পরমাণুকে ভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাগ করিলেই উহাতে বায়ুর গুণ থাকিবে না, আকাশের অংশ রূপ পরিগণিত হইবে।

আকাশের কিয়দংশ কিরূপ বিশেষ আকার পাইয়া বায়ুর অণুরূপে পরিগণিত হয়, তাহা সর উইলিয়ম টমসনের থিওরি অফ্ অ্যাটমস্ (Theory of atoms) বুঝিলে একরকম ধারণা করিতে পারা যায়।

আজ কালকার কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র হইতে এই পাওয়া যায় যে যে জড় জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দেখা যায় তাহা অক্সিজেন হাইড্রোজেন আদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকলের পরমাণু সকল কোন একই দ্রব্যের বিকার মাত্র, কিম্বা উহারা জগতের আরম্ভ হইতেই ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আছে—এই চিন্তা অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মনে উদয় হয়। সেই বিভিন্নতার পশ্চাতে একটি অভিন্ন ভাব আছে, এইটি তাঁহাদের মনে যেন কোথা হইতে আসিয়া উদয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকল যে কোন এক এলিমেণ্ট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, পাশ্চাত্যগণ ইহা অনুমান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহাঁদের মধ্যে সর্ উইলিয়ম টমসন বলেন যে এলিমেণ্ট সকলের এক একটি পরমাণু কেবল একমাত্র সূক্ষ্ম পদার্থে ব্যাপ্ত দেশে উত্থিত এক একটি আবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমাণুকে এইরূপ ঘূর্ণিতগতিবিশিষ্ট (Vertex motion) আবর্ত্ত স্বরূপ মনে করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণাদি গুণ কিরূপ সম্ভব হয়, তাহা তিনি গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহা ও দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ আবর্ত্ত সমূহের মধ্যে কোন একটি আবর্ত্ত অপরগুলি হইতে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত থাকে। তামাক খাইতে খাইতে তামাকের ধূঁয়া গোল গোল করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ইহা দেখা যায় যে, কোন একটি আবর্ত্ত বাতাসে উড়িতে উড়িতে অন্যটির নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাকে স্পর্শ দুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যায় না। দুটি আবর্ত্ত এরূপ কাছাকাছি হইলেই আবার সরিয়া পড়িয়া উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন থাকে। ঐরূপ স্বতন্ত্র ভাব পরমাণুর একটি বিশেষ ধর্ম্ম। এবং ঘূর্ণিত গতি বিশিষ্ট আবর্ত্তের এইরূপ ভাব দেখিয়া ও ঘূর্ণিত গতি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্থির করিয়া সর্ উইলিয়ম টমসন্ ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পরমাণু সকল কোন এক রূপ বস্তু দ্বারা ব্যাপ্ত সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত মাত্র।

হিন্দুদার্শনিকগণ ও বলেন যে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকল দেখিতেছ, ইহারা একই সরিতের ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত বই আর কিছুই নহে। সেই জন্য সাংখ্যকার যখন বলেন যে বায়ু ভূত আকাশের বিকার মাত্র, তখন আমরা এইরূপ বুঝি যে আকাশ নামক দ্রব্যে ব্যাপ্ত একটি মহাসমুদ্রে উদ্ভূত আবর্ত্ত সকলই বায়ুর

পরমাণু। এই বায়ুর অণুর কম্পন জনিত আমাদের যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাহার নাম স্পর্শ।

যেমন আকাশ নামক বস্তুর পরমাণু সকল দ্বারা ব্যাপ্ত দেশে উত্থিত আবর্ত্তকে বায়ুর পরমাণু বলিয়া বুঝিলাম, সেইরূপ এই বায়ুর পরমাণু লইয়া উত্থিত আবর্ত্তকে তেজের পরমাণু বলে। আবার তেজের কতকগুলি পরমাণু ঘূর্ণিত গতি বিশিষ্ট হইয়া যে আবর্ত্ত হয়, তাহার নাম অপ্ এবং অপ্ দ্বারা ব্যপ্ত দেশের আবর্ত্তকে ক্ষিতি কহে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত। বাহিরের তেজের কম্পন দেহস্থ তেজে গঠিত দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত করে, তাহাতে দর্শন জ্ঞান জন্মে। বাহিরের আকাশের কম্পন জন্য দেহের আকাশ গঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কম্পন জন্মে তাহাতে শব্দ জ্ঞান জন্মায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ঐরূপ।

অনেকে বলিবেন যে বাতাসের তরঙ্গ আমাদের কর্ণে আঘাত করাতেই শব্দ জ্ঞান হয়, ইহাই ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে। তবে আকাশের অণুর কম্পন হইতে শব্দ উত্থিত হয় একথা বলি কেন? হিন্দু ইহার উত্তর এই দিবেন, যে তুমি যাহাকে বাতাস বলিতেছ, তাহাতে আকাশের ভাগ আছে, এই জন্য বাতাসে শব্দ গুণ আছে। জলের মধ্যে ডুব দিয়া জলের ভিতরকার শব্দ শুনা যায়, তখন ত বাতাসের তরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে আঘাত করে না, তবে বাতাসের তরঙ্গকে কেমন করিয়া শব্দ বলিতে পার। জলে ও আকাশ আছে সেই জন্য জলের ভিতর শব্দ শুনা যায়।

যেরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে আমাদের যে ইন্দ্রিয় গঠিত, সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পনে আমাদের সেই ইন্দ্রিয় কম্পিত হয়, এই কথাটি

একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। স্থূল পদার্থের গতিতে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় কম্পিত হয় এবং সূক্ষ্ম পদার্থের গতি ক্রিয়ায় আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত হয়। একটি তপ্ত লোহার গোলার গতি দ্বারা আমাদের স্থূল দেহ গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ লোহার অভ্যন্তরস্থ আণবিক গতিক্রিয়া অর্থাৎ তাপ আমাদের স্নায়ুর গতি উৎপাদন করিয়া উষ্ণতার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ সূক্ষ্মের ক্রিয়া সূক্ষ্মের উপর এবং স্থূলের ক্রিয়া স্থূলের উপর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা যদি মানা যায়, তবে ইহা বুঝিতে পারা যায়, যে যেরূপ অণুর কম্পনে এক জাতীয় জ্ঞান জন্মে সেইরূপ অণুর কম্পনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির জ্ঞান জন্মান সম্ভব নহে। সুতরাং যেরূপ অণুর কম্পনে শ্রবণজ্ঞান জন্মায় এবং যেরূপ অণুর কম্পনে দর্শন জন্মায়, তাহা ভিন্ন জাতীয় হওয়া সম্ভব। হিন্দুগণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে যে পঞ্চ প্রকার দ্রব্যের গুণ বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়।

এখন একটি কথা আছে তাহা এই যে, যাহার গুণ শব্দ অর্থাৎ যাহার অণুর কম্পনে শব্দ জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে আকাশ বলা হইল কেন? যাহার গুণ স্পর্শ তাহার নাম বায়ু দেওয়া হইল কেন? যাহার গুণ গন্ধ তাহাকে ক্ষিতি বলা যায় কেন। বায়ু অর্থে বাতাস ক্ষিতি অর্থে মাটি, এই ত সাধারণত বুঝা যায়।

ইহার কারণ এই, সাধারণতঃ আমরা যাহাকে বায়ু বলি, তাহাতে স্পর্শগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, যাহাকে জল বলি তাহাতে রসগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, যাহাকে ক্ষিতি বলি তাহাতে গন্ধ গুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধে এইরূপ।

ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতে, গন্ধ আদি পাঁচটি গুণ ক্রমান্বয়ে আছে,

এই কথাটি ঠিক্ হইলে ও সাংখ্যকার বলেন যে বায়ু ভূত আকাশ ভূত হইতে উদ্ভূত হওয়াতে উহাতে আকাশের ও গুণ আছে বায়ুর ও গুণ আছে, অর্থাৎ উহার শব্দ স্পর্শ দুটি গুণই আছে। তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ আছে এবং ক্ষিতির পাঁচটি গুণই আছে।

এখন দেখ যাহাকে আমরা সচরাচর বায়ু বলিয়া থাকি, তাহা যদিও ও পাঁচটি ভূতেরই মিশ্রণে গঠিত বটে কিন্তু উহার শব্দ ও স্পর্শ গুণই প্রধান। অর্থাৎ বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বায়ু অস্তিত্ব অণুভব করিয়া থাকি। উহার রূপ, রস ও গন্ধ গুণ আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য স্পর্শ গুণাত্মক ভূত যাহা আকাশের বিকার বলিয়া শব্দ গুণাত্মক ও হইয়া থাকে, তাহাকে মরুৎ বলা হইয়াছে। ঐরূপ অগ্নি শিখার রূপ আছে, স্পর্শ আছে * কিন্তু রস বা গন্ধ গুণ নাই এই জন্য রূপ গুণাত্মকে ভূতের নাম তেজ। জলে রস আছে, স্পর্শ আছে, শব্দ আছে, কিন্তু গন্ধ গুণ নাই, এই জন্য রস গুণাত্মক ভূতকে অপ্ কহে এবং মাটির সকল গুণই আছে, তাই উহা হইতে ক্ষিতি ভূতের নাম করণ। কেবল মাত্র শব্দ গুণ আছে, এরূপ দ্রব্য সাধারণের জানা নাই কিন্তু যোগীগণ ঐ বস্তুর সত্বা অনুভব করিতে পারিতেন। ঐ পদার্থ জানা শুনা কোন বস্তুর ন্যায় নহে, সেই জন্য উহার নাম আকাশ।

*—শব্দ গুণ আছে কিনা বুঝিতে পারা যায় না।

ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লালসায় হিন্দু যোগীগণ নিজের আত্মার সহিত বিশ্বের আত্মার যোগ করিবার জন্য যে যোগ মার্গ অবলম্বন করিতেন, ভূত শুদ্ধি তাহার প্রথম সোপান। তাই পঞ্চভূত সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আর আধখানা কোথায়?

এই পৃথিবীতে আসিয়া যেন কি হারাইয়াছি, সদাই যেন সেই হারান ধনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি কিন্তু কি যে হারাইয়াছি আর কাহাকেই বা খুঁজিতেছি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। মনের এই ব্যাকুলতা ঘুচাইবার জন্য—অন্তরের শান্তিলাভের জন্য সংসার সাগরে কতই ডুব দিতেছি কিন্তু অন্তরের সেই জ্বালা কিছুতেই থামে না। এক একবার কাতর ভাবে রোদন করি, কিন্তু যাহাকে ডাকিতেছি আমার কান্না তাহার কাছে পৌঁছে না। আমি কাহার জন্য বা কিসের জন্য এত ব্যাকুল তোমরা কেহ বুঝাইয়া দিতে পার?

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী একদিন বলিয়াছেন যে এ জগতে তিনি একা, জগতের কোন পদার্থে তিনি তাঁহার মন বাঁধেন নাই—তাই তাঁহার মন সদাই উড়িয়া যায়, তাই তিনি কখন সুখী হন নাই, তাঁর কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এক জায়গায় মন বাঁধিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যাহা খুঁজি তাহা পাইব, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না, আমিও জোর করে মনের স্বাধীনতা হরণ করতে বড় রাজী নহি। মন যখন পার্থিব কোন পদার্থেই বাঁধা থাকিতে চায় না, তবে আমার মন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় এই একটি আমার প্রধান ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে তিনি একা, আমি ভাবি আমি একা নই। আমি আধখানা। আমার একটা আদৎ দেহ আছে বটে, কিন্তু মনটা আমার আধখানা। এই জগতে আমার মনের অপরার্দ্ধ কোথাও না কোথাও আছে, আমার এই আধখানা মন অপর আধখানা মনের সহিত মিশিতে চায়, যতদিন না এই দুই আধখানায় মিশিয়া পূরা হইবে ততদিন অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুচিবে না। আমার অসম্পূর্ণ মন পূর্ণ হইবার জন্ত ব্যাকুল রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি উহাকে রূপ-রসাদি পার্থিব বিষয়ে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তবে সে বাঁধনে মন ত কখনই সন্তুষ্ট হইবে না, আমি আর আমার মনকে কোথাও বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। যাও মন তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যেখানে তোমার অভিমত পদার্থ আছে তুমি সেই খানে চলিয়া যাও, একবার খুঁজিয়া বলিয়া দাও দেখি, সেই অপরার্দ্ধ কোথায় এবং কি ভাবে থাকে—একবার তাহাকে চিনাইয়া দাও, আর আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই চাহিব না। আমার মন, মন চায়, অন্য পদার্থে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও বাঁধা থাকিতে চায় না। মনের স্রোত মনের সমুদ্রে মিশিতে চায়, আমার ভিতরকার মন বাহিরের মনের সহিত মিশিতে চায়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে তাহাদের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাই আমার ভিতরে এত গোলমাল, এত কল কল নাদ। আমি এত দিন না বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম এই বার হইতে মনের পক্ষ অবলম্বন করিব মনস্থ করিলাম।

আমার ভিতরকার মন আধখানা, বাহিরে উহার অপরার্দ্ধ রহিয়াছে, তাই তাহার সহিত মিশিবার জন্ত সদাই বাহিরে আসিতে চায়। কিন্তু একটি বড় গোল উপস্থিত হইয়াছে। যাহা অসম্পূর্ণ

তাহাই কুৎসিৎ, যাহা কুৎসিৎ তাহাকে আমার বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কোচ হয়। সেই জন্য যদি বা কখন মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মনকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাই, তখন উহাতে এমনি একটি আবরণ দিয়া বাহির করিতে যাই যে লোকে উহাকে কুৎসিৎ বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করে। এই লোকলজ্জার খাতিরে পড়িয়া, পরনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া, আমার আধখানা মনকে যথাবৎ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার বাহিরের মন, ভিতরকার মনের ঐ আবরণে ঠেকিয়া ভিতরকার মনের সহিত মিশিতে পারিল না, আমিও অন্তরের শান্তি পাইলাম না।

তোমাদের পৃথিবীতে সত্যের আদর নাই, তাই তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমাব বড বনে না। আমি যদি আমার ভিতরকার মনকে উলঙ্গ অবস্থায় বাহিরে প্রকাশ করিতে যাই তবেই আমি তোমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব, তোমরা আমাকে হয়ত মনুষ্য সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে—তোমরা সত্যের আদর জান না, তাই আমি সত্যাচারী হইতে পারি নাই। তোমরা সকলেই কপটাচারী হইয়া আমাকেও কপটাচারী করিয়াছ। সেইজন্যই আমার ভিতরকার মন আমার বাহিরের মনের সহিত মিশিতে পারিতেছে না—তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইতেছে না। হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মোচন করিয়া অন্তরের ভাব যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া সত্যের সহায় লইয়া পূর্ণ হইবে, এই অভিলাষটি বড়ই প্রবল হইয়াছে—কিন্তু আমার এ অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? সত্যের আদর জানে এমন লোক কি তোমাদের পৃথিবীতে কেহই নাই? অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এর মধ্যে যতদিন আবরণ রাখিবে ততদিন শান্তি মিলিবে না। যাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে এই আবরণটি ঘুচিয়া যায় তাঁহাকেই

আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝি। যিনি সত্যের উপাসক তাঁহাকেই আমি কৃষ্ণোপাসক বলিয়া বুঝি। গোপীগণের বস্ত্রহরণে যিনি মন্দরুচি দেখেন দেখুন, কিন্তু আমি উহার ভিতর একটি বড় সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। অন্তরকে আবরণ শূন্য না করিলে কৃষ্ণের সহিত মিশা যায় না।

যতদিন আমার ভিতরের এই আধখানা মন বাহিরের অপরার্দ্ধের সহিত না মিশিবে ততদিন আমি অসম্পূর্ণ, ততদিন আমি কুৎসিৎ, ততদিন আমি সকাম, আমার এই সকাম মনকে যিনি নিষ্কাম করিতে সক্ষম তিনিই আমার হৃদয়ের সখা—তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথায় তোমরা কি অর্থ বুঝ আমি জানি না, কিন্তু আমি এইমাত্র বুঝি যে যিনি নিষ্কামধর্ম্মের গুরু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ. যিনি সত্যের পক্ষপাতী, সত্যব্রতাবলম্বী ঘোর পাপী যাঁহার ভালবাসার পাত্র, যাঁহার কাছে সত্যই ধর্ম্ম, লোকনিন্দা লোকলজ্জায় যিনি কখন ব্যথিত নহেন, আমার মন হাজার কুৎসিৎ হইলেও যিনি আমায় উন্মুক্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহাকে আমি অকাতরে আমার উলঙ্গ মন সমর্পণ করিতে পারি এবং যিনি আমার সেই মন লইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারেন তিনিই আমার হৃদয়-বন্ধু। কোথায়—আমার সেই হৃদয়-বন্ধু কোথায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

শি। এই জগতের পদার্থ সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত, চেতন জীব এবং জড় পদার্থ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বলে জগৎ চক্র ঘুরিতেছে তাহাদিগকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; যে শক্তি সূত্রে একটি জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত বাঁধা থাকে তাহার নাম শক্তি, যে শক্তি নিবন্ধন চেতন জীব জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিষয়াসক্তি এবং জীবের সহিত জীবের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহার নাম ভালবাসা।

যে ভাব নিবন্ধন আমার সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি তাহাই চেতন-বা অর্থাৎ জীবভাব। আমার দেহ আছে, রক্ত আছে, অস্থি আছে, রূপ আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু ইহারা চেতন পদার্থ নহে। যে পদার্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন আমি সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি সেই টুকুই আমার চেতনত্বের কারণ, হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমার রক্তের সহিত আর একজনের রক্তের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহা জড় সম্বন্ধ, একজনের রূপ শব্দ প্রভৃতির সহিত আবার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ মূলক যে অনুরাগ তাহার নাম বিষয়ানুরাগ; এক জনের সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ মূলক আকর্ষণের নাম ভালবাসা বা প্রণয়। যিনি অপর একজনের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তিনি যথার্থ প্রণয়ী। সাংখ্য-

কায় বলেন, যে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; এই গুণ কথাটীর অর্থ বন্ধন-রজ্জু—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। এই তিনটি গুণের নাম সত্ব রজ ও তম গুণ। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ তাহা সাত্বিক সম্বন্ধ, চেতন জীবের সহিত জড় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা রাজসিক সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা তামসিক সম্বন্ধ।

শক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিৎগণ কেবল জড়জাতীর শক্তিতত্বই আলোচনা করিতেছেন এবং আর্য্য বিজ্ঞানে কেবল চেতন জাতীয় শক্তিতত্বই সমালোচনা করা আছে। ইহাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। সাত্বিক ও রাজসিক শক্তিকে চেতন জাতীয় শক্তি বলিতেছি।

জড় জগতে শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার লক্ষিত হয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। রাজসিক শক্তির ক্রিয়াও প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়, রাগ ও দ্বেষ। এই রাগের অপর নাম কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।" রজোগুণ সম্ভূত, বিষয়াসক্তির নাম কাম এবং সত্বগুণ সম্ভূত আসঙ্গ লিপ্সাকেই প্রকৃতভালবাসা বলা যায়।

এইবারে সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং নিষ্কাম-কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুলি শুন। চিত্তে রজোভাব অর্থাৎ বিষয় সুখ-ভোগেচ্ছা প্রবল হইলে যখন সেই সুখ প্রাপ্তি জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়, কিন্তু সাত্বিক ভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম-কর্ম্ম বলে।

চিত্তের সাত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব কিরূপ তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি শুন। চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য একজনের সুখ অন্বেষণেই ব্যস্ত, যাহাতে সেই অন্য ব্যক্তি সুখী হয়, সেই কার্য্য করিতেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার অন্তরে সাত্বিকভাব উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যথার্থ যাহাকে ভালবাসা বলা যায় সেই ভালবাসার ভাব যাঁহার চিত্তে বিরাজমান তাঁহার চিত্তের অবস্থাকে সাত্বিকভাব বলা যায়। আকর্ষণের চরম ফল দুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া ভালবাসার ও চরম উদ্দেশ্য দুটি মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ দুজনের সুখ দুঃখ মিশিয়া যাওয়া। সাত্বিকভাব প্রবল হইলে মনুষ্য এমন একজনকে খুঁজিতে থাকে যাহার সুখ দুঃখের সহিত তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে পারেন, যাহার সুখ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে গিয়াই, যাহার সুখ সাধনোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়াই তিনি সুখী হইতে পারেন। রাজসিকভাব প্রবল হইলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যে বিষয় ভোগেচ্ছা জন্মে তাহার নাম কাম; যদি কেহ কাম্য বস্তু লাভের প্রতিকূলতাচরণ করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য জড়ভাব প্রাপ্ত হয় (যেমন আলস্য নিদ্রা অবস্থা) তাহাই চিত্তের তামসিক অবস্থা।

এইবার তুমি কাম ও প্রেম এই দুইটি কথার অর্থ বোধ হয় অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ, এই দুই এর প্রভেদটি ঠিক বুঝিতে পারা বড় প্রয়োজনীয় কেন না মনুষ্য জীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিক ভাব যাহা কাম

তাহাকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া বুঝিয়া প্রকৃত প্রেমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

প্রকৃত প্রণয়ের সাহায্যে কাম দমন করিতে হয়, নচেৎ জোর জবরদস্তি করিয়া যাঁহারা কাম দমন করিতে চান তাঁহারা ভুল পথে চলিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের আধিক্য উপস্থিত না হইলে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব কমে না। যদি নিষ্কাম-কর্ম্ম, কি তা বুঝিতে চাও তবে প্রকৃত ভালবাসা অভ্যাস করিতে শিখ। ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা দ্বারা নিজের কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন্‌গুলি রজোগুণ সম্ভূত আর কোন গুলিই বা সত্ত্বগুণ সম্ভূত তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে চিত্তে যে ভাব উদয় হয়, স্মৃতিবৃত্তির সাহায্যে সেই ভাব চিত্তে সতত জাগরুক রাখিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা রাজসিক বৃত্তি সমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়। ঈশ্বরভক্ত যে সময় ঈশ্বরের উপাসনা করেন সাত্বিকভাবের প্রাধান্ত উপস্থিত করাই সেই উপাসনার উদ্দেশ্য।

ভালবাসা তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়া জগৎশুদ্ধ সকলকে ভালবাসিতে শিখ তবেই ক্রমে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমে একজনকে ভালবাসিতে শিখ তাহার পর পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য সমষ্টিকে তোমার ভালবাসা কুষ্ঠ করিতে শিখ।

যে ভাবে জগতকে ভালবাসিবে সেই ভাবটি সম্যক্ না বুঝিয়া যদি "আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু" দেখিতে যাও তবে প্রচারের "গ্রাম্য কথায়" সেই যে বালকের বিদ্যা পরিচয় দেওয়া আছে তোমার বিদ্যা ও সেই ধরণের হইয়া দাঁড়াইবে।

ভালবাসা রহস্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে জোর জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা জন্মে না। যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহারই সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখ মিশাইতে প্রবৃত্তি জন্মে। যে চিত্ত উন্নত তাহাই সুন্দর; যাহা যথার্থ সুন্দর নহে * মোহবশতঃ তাহাকেই সুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনহারা হইও না, তাহা হইলে তোমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না যাহাকে আজি ভ্রম বশতঃ সুন্দর বলিয়া বুঝিয়াছ, কিছুকাল মিলনের পর সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া দারুণ দুঃখে পতিত হইতে হইবে। মোহবশতঃ যে ভালবাসা তাহা চিরস্থায়ী হয় না।

জ্ঞানালোকে মোহ দূর হয় সুতরাং জ্ঞানালোকের সাহায্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভালবাসিতে শিখিবে। ভালবাসা রহস্য সম্বন্ধে আমার কোন উপদেষ্টা * এইরূপ বলেন যে "প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক"। কি ভাল, কি মন্দ, কি সুন্দর, কি সুন্দর নয় ইহা সম্যক্ বিচার করা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। কিন্তু মনুষ্যগণ মায়ার বশে থাকায় জ্ঞানের আলোক সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় না এবং সেই জন্যই এই পৃথিবীতে এত গোলমাল, যে সৌন্দর্য্যসূত্রে জীব সকল গাঁথা রহিয়াছে সেই সূতাগাছটিতে যেন জোট পড়িয়া রহিয়াছে, সূতাটির মুড় খুঁজে পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে।

'Tis distance lends enchantment to the view' ইংরাজী এই enchantment কথাটি আর আমাদের "মায়ার মোহ" কথাটি একার্থবোধক বলিয়া বুঝি। এই মায়ার মোহ বশে যাহাকে আজ সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিছুদিন মিলনের পর আর সেখানে সে সৌন্দর্য্য

* পূজনীয় আমার পিতৃদেবের বঙ্কিমবাবু।

দেখিতে পাই না, এইজন্যই পৃথিবীতে নূতনের আদর, পুরাতনের আদর নাই। কিন্তু যিনি যথার্থ প্রেমিক তাঁহার কাছে নূতন পুরাতন দুইই সমান। কেন না ভালবাসার আধারে কোন্ অংশটুকু প্রকৃত সুন্দর এবং কোন্ অংশ সুন্দর নয়, সেই সত্য পূর্ব্বে সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি ভালবাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুটি চিত্ত মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসার চরমফল কিন্তু মনের মতন সৌন্দর্য্য এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া মেলা ভার, সেইজন্য যিনি প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনি মনের মতন সৌন্দর্য্য গড়িয়া সেই ভবিষ্যৎ সুন্দরের চিত্তে চিত্ত অর্পণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর চিত্তের সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখ মিশাইবার অভিপ্রায়ে যিনি কোন এক আধার অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য গঠন কার্য্যে তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহার কর্ম্মকেই নিষ্কাম-কর্ম্ম বলি।

যিনি ভালবাসা অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে কি কি অভ্যাস করিতে হইবে তাহা বলি শুন।

প্রথম। চিত্তে সাত্বিক ভাবের আধিক্য যাহাতে জন্মে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমে চিত্তের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যে অন্য একটি চেতন জীবের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার জন্য অন্তরে একটা ব্যগ্রতা উপস্থিত হইবে।

দ্বিতীয়। বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে প্রকৃত সুন্দর ও উন্নত চিত্তেরভাব কিরূপ, ক্রমাগত চিন্তার দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতে হইবে।

তৃতীয়। নিজের চিত্তে চিত্রিত সুন্দরের সৌন্দর্য্যে অপর এক জনকে ভূষিত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে।

চতুর্থ। এইরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার সময় কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল ফলে তাহা সবিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

পঞ্চম। এই সুন্দর গঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যে উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ প্রত্যাশা করিও না। যদি ও এই এক-জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয়, এই সুন্দর গঠন কার্য্যে তোমার চিত্ত যে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইবে পরজন্মে সেই উন্নত চিত্ত লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেজন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকর হইয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ। যদি তোমার মনের মানুষ গড়িয়া লইতে সক্ষম হও তবে তাহার সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া নিজের অহংজ্ঞান ঘুচাইতে শিখিবে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার ভালবাসার শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

সপ্তম। তাহার পর যেমন একজনকে সুন্দর করিয়াছ, সেইরূপ এই সমস্ত পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার আধার বুঝিয়া মনুষ্য সমষ্টিকে সুন্দর ও উন্নত করিতে যত্নবান হইবে। যিনি এইরূপ কার্য্যে ব্রতী ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে আবির্ভূ্তা হয়।

ছা। কি উপায় অবলম্বনে চিত্তে সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য জন্মে সে বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি মনে করুন একজন রূপের সৌন্দর্য্যগ্রাহী, যেখানে তিনি সেই রূপের সৌন্দর্য্য দেখেন তাঁহার ভালবাসা সেইখানেই গিয়া পড়ে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে রূপতৃষ্ণা দূর হইয়া অন্তরে সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য জন্মিতে পারে?

শি। সুন্দরকে ভালবাসা আর সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা এ দুটি কথার বড় প্রভেদ সেটি স্মরণ রাখিও। যাঁহার রূপ তৃষ্ণা প্রবল তিনি রূপ উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু যিনি যথার্থ সুন্দর

রূপ ভালবাসেন তিনি সেই সৌন্দর্য্যগ্রাহী হইয়াও রূপ উপভোগের কামনা করেন না উপভোগে সুন্দরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃতি সৌন্দর্য্যগ্রাহী সুন্দরের সৌন্দর্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে তিনি সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।

"সোনার বিগ্রহ কবি পূজ একদিন
সেওরে পরশদোষে হয়রে মলিন।"

হেমচন্দ্র।

উপভোগে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় সুতরাং যিনি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্য ভাল বাসেন তিনি কখনও সেইরূপ উপভোগ করিতে রূপবান বা রূপবতীর রূপ নষ্ট করিতে চান না। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি যেন রূপ রস ভাল বাসিতে শিখেন। যিনি রূপ তৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি রূপবান বা রূপবতীকে রূপের আভায় উজ্জলতর করিতে যত্নবান হউন, যেখানে কেবল রূপের সৌন্দর্য্য আছে সেইখানে যাহাতে গুণের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া মুখকান্তি অধিকতর দীপ্তিশালী হইতে পারে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন এবং এইরূপ কর্ম্মেই তৃপ্তি লাভ করিতে শিখুন তবেই তাঁহার রূপ ভোগ তৃষ্ণা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

চেতন জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া পুরুষ, স্ত্রী উপভোগের জন্য তৃষ্ণাতুর হইয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা হইতে পৃথিবীতে দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি যত কিছু অসুখের কারণ জন্মিয়াছে। পুরুষ যবে স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক যবে পুরুষকে যথার্থ ভালবাসিবে সেই দিন এই পৃথিবী রম্যস্থান হইয়া উঠিবে। যে পুরুষ স্ত্রীকে উন্নত করিতে

পারিলেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করেন তিনিই যথার্থ স্ত্রীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোককে উন্নত করিবার অভিপ্রায় যাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় না অথচ যিনি স্ত্রীসঙ্গ কামনা করেন তিনি কামুক, তাঁহার ভালবাসা এবং ব্যাঘ্রের হরিণ শিশুকে ভালবাসা অনেকটা এক রকম।

মানুষ নিজে আপনার মুখ দেখিতে পায় না, সেই জন্য নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়, মানুষ তাহার নিজের মন সুন্দর কি কুৎসিৎ সেইটি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু সেটি না বুঝিয়া ও স্থির থাকিতে পারে না; যত দিন সেইটি বুঝিতে না পারে ততদিন একখানি দর্পণের প্রয়োজন হয়। স্ত্রী চিত্ত পুরুষের চিত্ত স্ত্রীর পক্ষে সেই দর্পণ।

দর্পণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সত্যের অনুরূপ হয় না, যে চিত্তে একেবারে কপটতা নাই তাহাই নির্ম্মল কিন্তু এরূপ নির্ম্মল দর্পণ সহজে খুঁজিয়া মেলে না। হীরক সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন যখন মাটির ভিতর থাকে তখন তাহারা সমল থাকে, পরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাহাকে বা আগুণে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ পুরুষরত্ন বা স্ত্রীরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উহাদিগকে ঘসিয়া, মাজিয়া প্রয়োজনমতে আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়।

সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার কুৎসিৎকে সুন্দর করিবার আগ্রহকে প্রেম প্রণয় ভালবাসা ভক্তি বা স্নেহ নাম দেওয়া যায়। সমলকে নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায় যদি না থাকে তবে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পর যে সঙ্গ লালসা তাহাকে ভালবাসা বলিতে চাই না।

ভালবাসাভাব তিন প্রকার,—ভক্তিভাব, প্রেমভাব, স্নেহভাব। যিনি আমাকে উন্নত করিতে পারিলেই আনন্দিত হন তাঁহার প্রতি আমার যে ভাব তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি নিবন্ধন ভক্ত ভক্তির পাত্রের আজ্ঞানুপালনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সৎপাত্র বুঝিয়া যাহাকে উন্নত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহার প্রতি আমার যে ভাব দাঁড়ায় তাহার নাম স্নেহ। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট সেইখানকার ভাবের নাম প্রেম।

ভক্তির পাত্রে ভক্তি, স্নেহের পাত্রে স্নেহ এবং প্রেমের পাত্রে প্রেম ন্যস্ত করিয়া আনন্দের উদ্দেশ্যে সতত অগ্রসর হইতে শিখ।

উপসংহার

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রবন্ধটি 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ভালবাসা সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছিলাম; এখন আবার চৌদ্দ বৎসর পরে ভালবাসা সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতে চাই। এখন বুঝি যে ভালবাসাই আত্মাশক্তি, এই ভালবাসাই কর্ম্মের প্রবোধিকা-শক্তি। জগতে যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে সবই এই এক ভালবাসা শক্তির রূপান্তর মাত্র। জগতে অচেতন পদার্থ কিছুই নাই, এক চিন্ময়ের সত্তা নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক অণু পর্য্যন্ত সজীব পদার্থ।

পৃথিবী সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে আমরা এখন জড় পদার্থ বুঝি, কিন্তু জ্ঞানী যোগীগণ দেখেন যে উহারা সকলেই এক একটি সজীব দেহ ; সকলেরই এক একজন চেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। আমি যেমন আমার দেহের সহিত স্ব স্বামীভাবে যুক্ত অর্থাৎ আমার এই দেহের সহিত 'মমত্ব' সম্বন্ধে যুক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক দেহেরই অধিষ্ঠাতা দেহী এক একজন আছেন। সুতরাং অচেতন পদার্থ জগতে নাই। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া, নদী সমুদ্রে মিলিতে যায় ভালবাসে বলিয়া, অক্সিজেনের অণু হাইড্রোজেনের অণু মিলিয়া জল হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া। তোমরা যদি বেশ মন দিয়া কান পেতে বিশ্বের সঙ্গীত শুন, তবে শুনিতে পাইবে বিশ্ব গাইতেছেন "আমার স্বভাব এই ভালবাসা বই আর জানি না"। স্বভাব অর্থে প্রকৃতি। ভালবাসাই জগজ্জননীর স্বরূপ। বিশ্বের এই ভালবাসা স্বভাব যিনি বুঝিয়াছেন যিনি এই আদ্যাশক্তির রহস্য বুঝিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভালবাসা কি তাহাই বুঝিয়াছেন, আর সকলেই কামী। বিশ্বের এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসা যিনি হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন তিনি বুঝেন যে এই আদ্যাশক্তিই পূর্ণা, ইনিই পরাপ্রীতি স্বরূপিণী ভক্তি, অন্য যা কিছু শক্তি সমস্তই ইঁহারই অংশ মাত্র, সেইজন্য তাহারা সমস্ত অপূর্ণা। এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসাকে যিনি নিজের ভালবাসা বলিয়া বুঝেন তাঁহার ভালবাসাই নিষ্কাম, আর সকলের ভালবাসাই সকাম। "তারা আমার নিরাকারা"। যাহার সীমা আছে তাহাই সাকার, যাহা কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহাই নিরাকার। এই আদ্যাশক্তি ভালবাসার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম ও অনন্ত। যাঁহার ভালবাসার সীমা নাই, যাঁহার ভালবাসা কোন সীমাবদ্ধ নহে, তিনিই

আত্মাশক্তিকে জানিয়াছেন, তিনিই ভক্ত ও তিনিই মুক্ত। যাঁহার ভালবাসা সীমার বদ্ধ তিনিই বদ্ধ জীব, এই বদ্ধজীবের ভালবাসাই কাম। যাঁহার ভালবাসার সীমা মুছিয়া গিয়াছে, যিনি অসীম ভালবাসাকে হৃদয়ে ধরিয়া আছেন তিনিই মুক্তপুরুষ, তিনিই আত্মাশক্তিকে হৃদয়ে ধরিয়া শিবত্ব পাইয়াছেন। এইবারে প্রেম ও কামের পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি, শিবের ভালবাসা অর্থাৎ শিবের হৃদয়ের শক্তিই ভালবাসা এবং বদ্ধজীবের সসীম ভালবাসাই কাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই কামকে কিরূপে জয় করিতে হইবে। জীবের হৃদয়ের শক্তি শিবের হৃদয়ের শক্তির সহিত মিলানই কামজয়ের একমাত্র পন্থা, ইহারই নাম সাধনা।

শিবহৃদয়বাসিনী জগজ্জননী মা তোমাকে নমস্কার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সতীতেজ।

হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী সুন্দরী সতীত্বের আদর্শ; এই আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্ম্মই বল আর কর্ম্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব। অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী সুন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে আঁকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

"লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন।" মহাভারতে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্ম্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্র করা আছে। পাপাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিত সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পাপনিরত দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংশ করিয়াছিল এই টুকু মহাভারতে ধর্ম্মালোচনার সার, মহা

পরাক্রান্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর ধর্ম্ম সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদর নাই সেইখানেই নানারূপ অধর্ম্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননায় অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে, যেদিন পাপিষ্ঠরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্যত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌলা সতীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন সেইদিন হইতেই মুসলমান রাজত্ব বাঙ্গালা হইতে, ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

যাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি খুঁজেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ যাহাতে দেশে পুনরাবির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন, আমাদের দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শিখ তবেই সতীতেজে তোমাদের রমণীগণ উজ্জ্বল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে,

তবেই ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পার্শ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

সাবিত্রী একটি আদর্শ। এইরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধনা। আদর্শ চিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্ম্মে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্ম্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর 'তৎত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবেন।

"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, এই, কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র বলিয়া বুঝ। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় সুন্দর বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখার নাম ভালবাসা শিক্ষা। কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাকায় যাহাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "তৎত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই সেই সাবিত্রী" সহধর্ম্মিণীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। যাহার সঙ্গে একত্রে থাকা যায়

তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে শিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে। যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসায় গোলযোগ নাই বুঝিও। তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থায় যেরূপ ভালবাসা মাখা কথা কহিতে, যেরূপ ভালবাসামাখা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ কথাবার্ত্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসার গুণেও তোমার কথাবার্ত্তার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিনী তোমাতে এরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকেই সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে।

এখন একটী কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি তাহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্ত্তা কহাটা কপটাচার কি না? যেখানে সত্য সেই খানে ধর্ম্ম, যেখানে মিথ্যা সেই খানে অধর্ম্ম। সুতরাং যদি মন্দকে ভাল ভাবা মিথ্যা হয়, তবে সেরূপ কাজে অধর্ম্ম আছে। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভালবাসা কখনই কর্ত্তব্য নহে মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয়। মানুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা মলা মাত্র, সেই মলা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে

তাহার মলা ধৌত করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে ভিতরকার মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা ঝিনুকেরও আদর বুঝেন। মানুষের বাহিরে মলা দেখিয়াই মানুষকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রেই অনঙ্গ—বিজয়ী ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিয়া 'তত্ত্বমসি' মহামন্ত্র সাধনা করিতে শিখ. তাহা হইলেই ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবত্ত্বা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেইখানে স্বামী সত্যবান্ হইয়ে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান সেইখানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি স্ত্রীকে সতীতেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বলে শিষ্যা স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং 'সোঽহং' অর্থাৎ "সেই আদর্শ পুরুষই আমি" এই ভাবিয়া নিজের অন্তঃকরণকে সেই আদর্শ পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের ভাব সমূহ যথাবৎ প্রকাশ করিতে আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্বতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; স্বামী

সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সন্তোষ এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। যেখানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্ম্মভাব সকল সেই ক্ষেত্রে আপনাপনি ফুটিতে থাকে। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পার্ব্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্কাম ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। 'সত্য-বাক্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে, যাহা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্ব্বে সত্য কথাটির যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই 'সত্য' কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহা না বলিয়া যদি অন্যরূপ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেন না সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা মত কার্য্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না, কেন না কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও একদিন না একদিন ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে, সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে, তবেই ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কথা কহিতে দোষ কি? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইবে, তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই—

সত্য কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়, চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই, যে অসত্য ব্যবহার মনে আসিলেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, যাঁহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইযাছে তিনি ছোট খাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মানুষ তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্য্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতি নিবৃত্ত করে। সুতরাং 'সত্য' এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখা কর্ত্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় সেই আলোকটির নাম সৎ। এই আলোক যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টার

নাম সত্যাচার। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী। এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে।

যিনি সামান্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। তিনি মানুষের ভিতরকার স্থির সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না, বাহ্যিক অসুন্দর বিষয়ে আকৃষ্ট হয় হয়, পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রী'ও স্বামীকে চিনিতে পারে না তম গুণ না থাকিলে কেহই সতী বা সত্যবান হইতে সক্ষম হন না। হরপার্ব্বতীর মিলনের পূর্ব্বে মদন ভষ্মীকৃত হইয়াছিল, পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্যবর চাই না, তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তপঃ প্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবশীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সতীত্ব ও সত্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই বলা হইল না। সতীত্ব ও সত্য এই দুটি কথার আদর যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই শ্রীবৃদ্ধি। এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন নাই। এস ভাই সব আমরা লোক মাতা সতী স্ত্রীগণকে নমস্কার করিতে করিতে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' সেই পরম পুরুষের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে শিখি।'

উপসংহার।

উপরের লিখিত প্রবন্ধটি প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ লেখাটি আমার বটে কিন্তু প্রবন্ধটির অধিকাংশ

কথা সতীতেজে দীপ্ত কোন রমণীর। পতিব্রতা সেই সতী সতীতেজ সম্বন্ধে ইহাও শিখাইয়া গিয়াছেন যে সতী স্ত্রী তাঁহার হৃদয় মধ্যে নীলাবর্ণের একটি আগুন দেখিতে পান। সতীর ক্রোধ হইলে এই অগ্নি ঘোর কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সতী যখন ভালবাসা বিতরণ করেন তখন এই অগ্নি শ্যামসুন্দর রূপ ধারণ করেন এবং যখন সতী জ্ঞান দান করেন তখন ইহা সুন্দর কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন। জ্ঞানদায়িনী কালীর দুই হাতে বাঁশী এক হাতে মুণ্ড এক হাতে অসি। আর বেশী কোন কথা এখন লিখিতে পারিলাম না।

নমো সতীশ্বরায়।

সম্পূর্ণ।